তাওহীদের ডাক

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১০

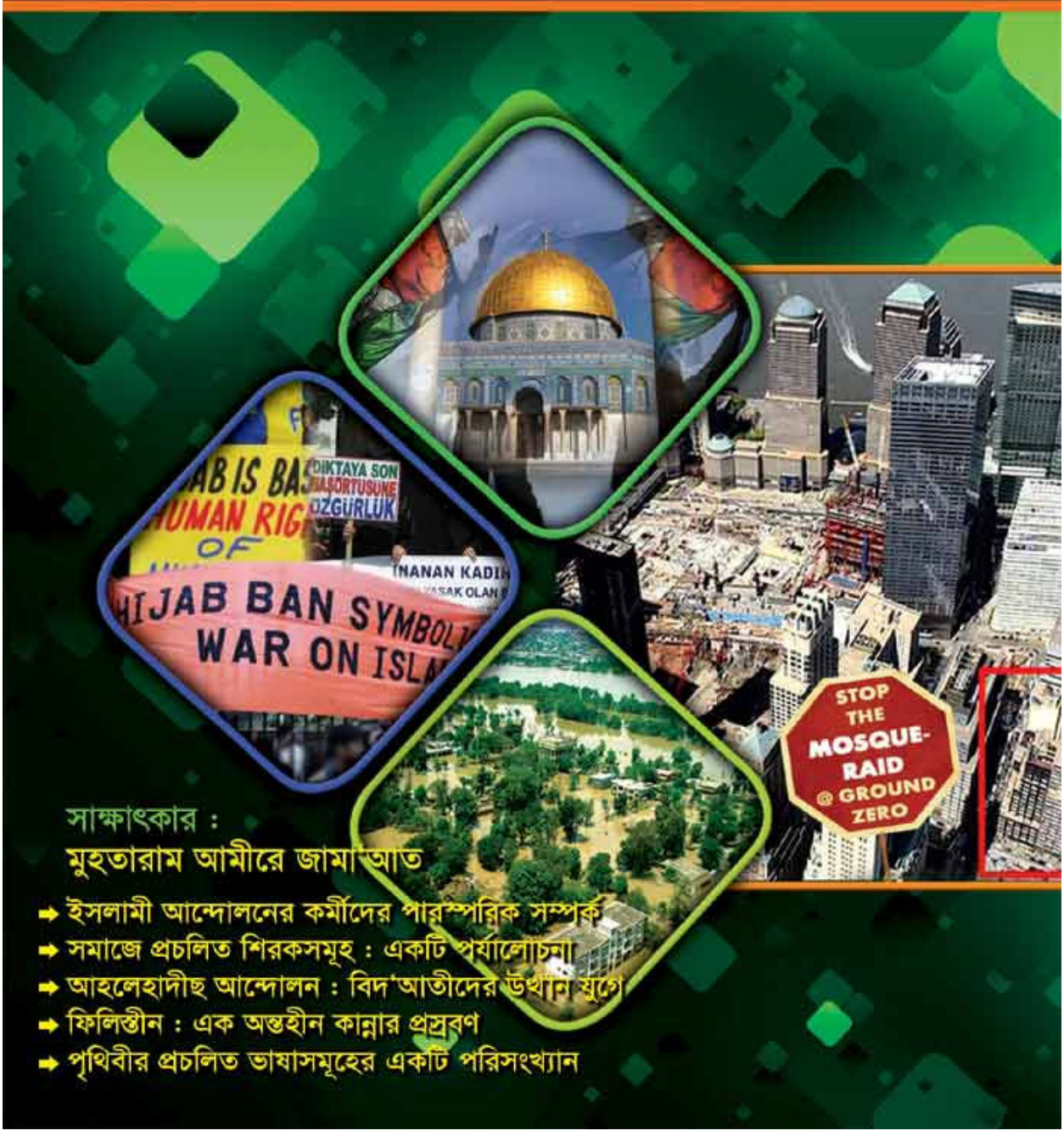

সাক্ষাৎকার :
মুহতারাম আমীরে জামা'আত

- ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্ক
- সমাজে প্রচলিত শিরকসমূহ : একটি পর্যালোচনা
- আহলেহাদীছ আন্দোলন : বিদ'আতীদের উত্থান যুগে
- ফিলিস্তীন : এক অন্তহীন কান্নার প্রস্রবণ
- পৃথিবীর প্রচলিত ভাষাসমূহের একটি পরিসংখ্যান

তাওহীদের ডাক

৫ম সংখ্যা
সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১০

উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম
সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
মুযাফফর বিন মুহসিন
নির্বাহী সম্পাদক
আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

যোগাযোগ
তাওহীদের ডাক
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন : ০৭২১-৮৬১৬৮৪
মোবা : ০১৭৩৭৪৩৮২৩৪, ০১৭৪৪৫৭৬৫৮৯
ই-মেইল : tawheederdak@gmail.com
ওয়েব : www.at-tahreek.com/tawheederdak

মূল্য : ১৫ টাকা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার বিভাগ, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী- ৬২০৩ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও সোনালী প্রিন্টিং এ্যান্ড প্যাকেজিং, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়** ২
- **কুরআন ও হাদীছের পথ-নির্দেশিকা** ৩
- **তানযীম**
  ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্ক ॥ ৫
  ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন
- **তারবিয়াত**
  রামাযান : আত্মশুদ্ধির এলাহী প্রশিক্ষণের মাস ॥ ৯
  আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
- **তাজদীদে মিল্লাত**
  সমাজে প্রচলিত শিরকসমূহ : একটি পর্যালোচনা ॥ ১২
  নূরজাহান বিনতে আব্দুল মজীদ
- **আহলেহাদীছ আন্দোলন**
  আহলেহাদীছ আন্দোলন : বিদ'আতীদের উত্থান যুগে ॥ ১৬
  ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
- **বিশেষ নিবন্ধ**
  ডা: জাকির নায়েক : এক নবদিগন্তের অভিযাত্রী ॥ ১৮
  আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব
- **মনীষীদের লেখনী থেকে**
  শায়খ আলবানী (রহঃ)-এর অছিয়ত ও নছীহত ॥ ২৫
  নূরুল ইসলাম
- **সাক্ষাৎকার** ২৬
  মুহতারাম আমীরে জামা'আত
- **সাময়িক প্রসঙ্গ**
  ফিলিস্তীন : এক অন্তহীন কান্নার প্রস্রবণ ॥ ৩০
  আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক
- **ধর্ম ও সমাজ**
  পৃথিবীর প্রচলিত ভাষাসমূহের একটি পরিসংখ্যান ॥ ৩৬
  হোসাইন আল-মাহমূদ
- **তারুণ্যের ভাবনা**
  অপসংস্কৃতির বিষাক্ত ছোবল : তরুণ সমাজের করণীয় ॥ ৩৯
  আফতাবুয্যামান শরীফ
- **পরশ পাথর**
  মাইকেল জ্যাকসনের ইসলাম গ্রহণ (?) : একটি বিশ্লেষণ ॥ ৪১
  মুখতারুল ইসলাম
- **বিজ্ঞান ও বিস্ময়**
  বিজ্ঞানময় আল-কুরআন : কতিপয় দিক ॥ ৪৫
  আ.স.ম. ওয়ালীউল্লাহ
- **শিক্ষাঙ্গন**
  ইংরেজী অভিধানের কথা ॥ আব্দুল হাসিব ৪৬
- **আলোকপাত** ৪৭
- **জীবনের বাঁকে বাঁকে** ৪৮
- **ভিনদেশের চিঠি** ৫০
- **কবিতা** ৫১
- **সংগঠন সংবাদ** ৫২
- **সাম্প্রতিক মুসলিম বিশ্ব** ৫৩
- **সাধারণ জ্ঞান** ৫৪
- **আইকিউ** ৫৬

সম্পাদকীয়

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম
নাহমাদুহু ওয়া নুছল্লী আলা রাসূলিহিল কারীম

দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০১০

নির্দিষ্ট লক্ষ্য, যোগ্য নেতৃত্ব ও নিবেদিতপ্রাণ কর্মী বাহিনী- এই ত্রিবিধ বস্তুর সমন্বয়ে একটি সংগঠন অস্তিত্ব লাভ করে। এগুলির মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কর্মী। নৌকার জন্য যেমন দাড়ের প্রয়োজন সংগঠনের জন্য তেমনি কর্মী বাহিনী প্রয়োজন। সংগঠনের এই গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ কর্মীদের নিয়ে অন্যান্য বারের ন্যায় এবারও অনুষ্ঠিত হচ্ছে আমাদের নিয়মিত **'দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলন'**। কর্মীদের পারস্পরিক পরিচিতি, সংগঠন পরিচালনায় দিক নির্দেশনা লাভ, সংগঠনের বিভিন্ন বিষয়ে সম্যক জ্ঞানার্জন, অস্পষ্ট ও অজানা বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা লাভ, সাংগঠনিক মযবুতি বৃদ্ধির উপায় প্রভৃতি বিষয়ে অবহিত করণে কর্মী সম্মেলন খুবই গুরুত্ব বহন করে। তাছাড়া কর্মীদের সামনে সংগঠনের কার্যাবলী তুলে ধরে তাদের কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি ও তাদের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরীতে কর্মী সম্মেলন বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। এর মাধ্যমে কর্মীদের মাঝে সৃষ্টি হয় নবজাগরণ, কর্মোদ্দীপনা ও শত বাধা পেরিয়ে সংগঠনকে সামনে এগিয়ে নেওয়ার প্রবল সদিচ্ছা। সাথে সাথে সংগঠনের মূল লক্ষ্য, চেতনা ও কর্মপদ্ধতি জাতির সামনে তুলে ধরতে কর্মী সম্মেলন অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সর্বোপরি ইসলামের শাশ্বত ও অকৃত্রিম আদর্শের প্রতি কর্মীদের অনুরাগ বৃদ্ধি ও সংগঠনের জন্য নিবেদিতপ্রাণ কর্মী হিসাবে গড়ে ওঠার জন্য আমাদের সম্মেলনগুলি বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

দেশের তরুণ ছাত্র ও যুবসমাজের নিকটে নির্ভেজাল তাওহীদের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার মহান লক্ষ্যে ১৯৭৮ সালের ৫ ফেব্রুয়ারীতে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' প্রতিষ্ঠার পর ১৯৮০ সালের ৫ ও ৬ এপ্রিল 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে ঢাকা যেলা ক্রীড়া সমিতি মিলনায়তনে প্রথম জাতীয় সম্মেলন এবং ইসলামিক ফাউণ্ডেশন মিলনায়তনে সুধী সমাবেশ ও 'ইসলামী সেমিনার' অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ১৯৯১ হতে ৯৪ সাল পর্যন্ত 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে প্রতিবছর রাজশাহীতে জাতীয় সম্মেলন ও তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর ১৯৯৪ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর মুরব্বী সংগঠন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠা লাভের পর তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠানের দায়িত্ব গ্রহণ করে 'আন্দোলন'। ১৯৯৬ সালের ২৪ ও ২৫ শে অক্টোবর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে প্রথম দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলন রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ১৯৯৮ সালে রাজশাহীতে এবং ২০০২, ২০০৪ ও ২০০৬ সালের দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। গত ২০০৮ সালের কর্মী সম্মেলন নানা প্রতিকূলতায় অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। আমরা আশা করি, বিগত সম্মেলনগুলির ন্যায় এবারের সম্মেলনও কর্মীদের মধ্যে পরকালীন জবাবদিহিতার চেতনা জাগ্রত করবে এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে সংগঠনকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে কাজ করার প্রেরণা যোগাবে। ইসলামের নির্ভেজাল সত্যকে দেশ ও জাতির সামনে তুলে ধরা এবং সমাজের বুকে তা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে আল্লাহ আমাদেরকে অধিকতর তাওফীক দান করুন-আমীন!!

আল্লাহ্র পথে দাওয়াত

আল-কুরআনুল কারীম :

১- قُلْ هَذِهِ سَبِيْلِيْ أَدْعُوْا إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيْرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ-

'বলুন (হে মুহাম্মাদ!) ইহাই আমার পথ। আমি এবং আমার অনুসারীগণ ডাকি আল্লাহ্র দিকে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে এবং আল্লাহ পবিত্র। আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই' *(ইউসুফ ১০৮)*।

২- قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللّهَ وَلاَ أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوْا وَإِلَيْهِ مَآبِ-

'বলুন (হে মুহাম্মাদ!) আমি তো আল্লাহ্র ইবাদত করতে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করতে আদিষ্ট হয়েছি। আমি তাঁরই দিকে আহ্বান করি এং তাঁরই নিকট আমার প্রত্যাবর্তন' *(রা'দ ৩৬)*।

৩- أُدْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ-

'আপনি আপনার পালনকর্তার পথের দিকে আহ্বান করুন হিকমতের সাথে ও উত্তম উপদেশ শুনিয়ে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন উত্তম পন্থায়' *(নাহল ১২৫)*।

৪- إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ-

'নিশ্চয়ই আপনাকে সত্য (দাওয়াত) সহকারে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। আর এমন কোন জাতি নেই যার নিকট সতর্ককারী গমন করেনি' *(নাহল ৩৬)*।

৫- وَلاَ يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلاَ تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ-

'তোমার প্রতি আল্লাহ্র আয়াতসমূহ নাযিল হওয়ার পর তারা যেন তোমাকে কিছুতেই সেগুলো হতে বিমুখ না করে। তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান কর এবং কিছুতেই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না' *(কাছাছ ৮৭)*।

৬- يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَّمُبَشِّراً وَّنَذِيْراً وَّداعياً إِلَى اللّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُّنِيْراً-

'হে নবী! নিশ্চয়ই আমি আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারীরূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপ রূপে' *(আহযাব ৪৫-৪৬)*।

৭- وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ-

'তার কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করে, সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং বলে, আমি একজন মুসলিম'? *(হা-মীম সাজদাহ ৩৩)*।

৮- فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ مِنْ كِتَابٍ-

'সুতরাং আপনি এর প্রতিই দাওয়াত দিন এবং সুদৃঢ় থাকুন তার উপর যেভাবে আপনি আদিষ্ট হয়েছেন; আপনি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না এবং বলুন, আল্লাহ যে কিতাব নাযিল করেছেন, আমি তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি' *(শূরা ১৫)*।

৯- كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّهِ-

'তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানুষের জন্য তোমাদের আবির্ভাব। তোমরা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে এবং আল্লাহ্র উপর ঈমান আনবে' *(আলে ইমরান ১১০)*।

১০- وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ-

'তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল সর্বদাই থাকা প্রয়োজন যারা আহ্বান জানাবে সৎকর্মের প্রতি, ন্যায়ের আদেশ করবে এবং অন্যায় থেকে নিষেধ করবে। আর তারাই হবে সফলকাম' *(আলে ইমরান ১০৪)*।

১১-وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلًا أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ-

'আমি প্রতিটি কওমের মধ্যে রাসূল প্রেরণ করেছি মানুষের জন্য এই দাওয়াত নিয়ে যে, তারা যেন আল্লাহ্র ইবাদত করে এবং ত্বাগূতকে বর্জন করে' *(নাহল ৩৬)*।

হাদীছে নববী থেকে :

১২- عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ مَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمًا ، فَقَالَ : يَا قَوْمِ ، إِنِّي رَأَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنَيَّ ، وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ ، فَالنَّجَاءَ ، فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ ، فَأَدْلَجُوا ، فَانْطَلَقُوا عَلَى مَهْلِهِمْ ، فَنَجَوْا ، وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ ، فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ ، فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ ، فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ ، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي ، فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ ، وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي ، وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ"-

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমার এবং যে বিষয় দিয়ে আল্লাহ আমাকে প্রেরণ করেছেন তার উদাহরণ- এক ব্যক্তি তার কওমের নিকট এসে বলল, হে আমার কওম! আমি আমার এই দুই চোখে শত্রু সৈন্য দেখে এসেছি এবং আমি হচ্ছি তোমাদের জন্য উলঙ্গ সতর্ককারীর মত। তোমরা দ্রুত মুক্তির পথ অন্বেষণ কর! এটা শুনে তার কওমের একদল তার কথা মানল এবং রাতারাতিই চলে গেল। তাতে তারা ধীরে সুস্থে যেতে পারল এবং মুক্তি পেল। আর অপর দল তাকে মিথ্যুক মনে করে ভোর পর্যন্ত নিজেদের স্থানেই রয়ে গেল। ভোরে শত্রু তাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করল এবং তাদেরকে ধ্বংস ও সমূলে বিনাশ করে দিল। এটা হল সে ব্যক্তির উদাহরণ- যে আমার আনুগত্য স্বীকার করেছে এবং আমি যা এনেছি তার অনুসরণ করেছে এবং সে ব্যক্তির উদাহরণ যে আমার অবাধ্য হয়েছে এবং আমি যে সত্য তার নিকট এনেছি তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে' *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৮)*।

১৩- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ بَلِّغُوا عَنِّى وَلَوْ آيَةً ، ..... وَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ "-

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'একটিমাত্র আয়াত হলেও তা আমার পক্ষ থেকে মানুষের নিকট পৌঁছে দাও....যে ব্যক্তি আমার উপর মিথ্যা আরোপ করল সে যেন তার বাসস্থান জাহান্নামে প্রস্তুত করে নেয়' *(বুখারী; মিশকাত হা/১৯৮)*।

١٤– قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: " إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلاَّ كَانَ حَقًا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ " –

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমার পূর্বে কোন নবীকেই এই দায়িত্ব ব্যতীত প্রেরণ করা হয়নি যে, তিনি তার কওমকে যা কিছু কল্যাণকর তা সম্পর্কে অবগত করবেন এবং যা কিছু অকল্যাণকর তা সম্পর্কে সতর্ক করবেন' *(ছহীহুল জামে' হা/২৪০৩)*।

١٥– وعن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر.... " فَوَاللَّهِ لأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ " . متفق عليه –

রাসূল (ছাঃ) খায়বার যুদ্ধের দিন বলেন, 'আল্লাহ্র কসম! তোমার মাধ্যমে আল্লাহ যদি একজন ব্যক্তিকেও হেদায়াত দান করেন, তবে সেটা হবে তোমার জন্য লাল উটের চেয়েও উত্তম' *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৬০৮০)*।

١٦– عن أبي مسعود الأنصاري... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ " . رواه مسلم –

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কেউ যদি কোন নেক কাজের পথনির্দেশ দেয়, সে ঐ নেক কাজ সম্পাদনকারীর সমতুল্য ছওয়াব পায়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৯)*।

١٧– وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا " . رواه مسلم–

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে হেদায়াতের দিকে আহ্বান করে, এ হেদায়াতের যত অনুসরণকারী হবে, তাদের প্রতিদানের সমতুল্য প্রতিদান সে পাবে। অথচ তা তাদের প্রতিদানকে কমিয়ে দিবে না। আর যে ব্যক্তি পথভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান করে, তার যত অনুসরণকারী হবে, তাদের পাপ সমতুল্য পাপ তার উপর চাপানো হবে। অথচ তা তাদের পাপ লাঘব করবে না'। *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৮)*।

١٨– عن عبد الله بن مسعود– رضي الله عنه– عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا ثُمَّ أَدَّاهَا إِلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ –

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ সে ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন যে আমার কথা শুনেছে অতঃপর তা যথাযথভাবে স্মরণ রেখেছে ও রক্ষা করেছে অতঃপর তা যথাযথভাবে এমন ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দিয়েছে যে তা শুনেনি। অনেক জ্ঞানের বাহক রয়েছেন যিনি তার চেয়ে অধিক জ্ঞানীর নিকট জ্ঞানের কথা পৌঁছিয়ে দেন' *(ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২২৮, সনদ ছহীহ)*।

١٩– عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " مَنْ رَأَى منكم مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بيده ، فإنْ لَمْ يَستَطِعْ فبلسَانه ، فإنْ لَمْ يَستَطِعْ فَبقلْبِه ، وذلك أَضْعَفُ الإيمان " . رواه مسلم-

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ যখন কোন অন্যায় কাজ হতে দেখে, সে যেন তা স্বহস্তে পরিবর্তন করে দেয়, যদি সে ক্ষমতা না থাকে তবে মুখ দ্বারা তার প্রতিবাদ করবে, আর যদি সে ক্ষমতাও না থাকে তবে নিজের অন্তরে তাকে ঘৃণা করবে। আর এটাই হল ঈমানের দুর্বলতম স্তর' *(মুসলিম, মিশকাত হা/ ৫১৩৭)*।

٢٠– عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ " . رواه الترمذي-

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! তোমরা অবশ্যই ভালো কাজের আদেশ দিবে এবং খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করবে। নতুবা অনতিবিলম্বে আল্লাহ তা'আলা নিজের পক্ষ থেকে তোমাদের উপর আযাব প্রেরণ করবেন। অতঃপর তোমরা তাঁর নিকট দো'আ করবে কিন্তু তোমাদের দো'আ কবুল করা হবে না' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১৪০, সনদ হাসান)*।

বিদ্বানদের কথা :

১. আল্লামা ইবনুল কাইয়েম বলেন, 'আল্লাহ তাঁর রাসূলকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তিনি যেন মানুষকে জানিয়ে দেন যে, আল্লাহ্র দিকে আহ্বানই তাঁর চলার পথ। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে আহ্বান করে সে রাসূল (ছাঃ) অনুসৃত পথেই রয়েছে। সে জাগ্রতজ্ঞানের অধিকারী ও তার অনুসারী। আর যে ব্যক্তি এতদ্ভিন্ন অন্য পথে আহ্বান করে সে রাসূলের অনুসৃত পথে নেই, জাগ্রত জ্ঞানের উপরও নেই এবং জাগ্রতজ্ঞানের অনুসারীও নয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ্র পথে দাওয়াত প্রদান আল্লাহ প্রেরিত পুরুষ ও তাদের অনুসারীদের কর্তব্য। তারা তাদের কওমের নিকট রাসূলদের খলীফা এবং সাধারণ মানুষ তাদের অনুসরণকারী। আল্লাহ তাঁর রাসূলকে নির্দেশ দিয়েছেন স্বীয় প্রভুর পক্ষ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে তা প্রচার করার জন্য এবং তার রক্ষক ও হেফাযতকারী হিসাবে দায়িত্ব পালনের জন্য। মুবাল্লিগগণও একইভাবে দ্বীনের প্রচারের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। রাসূল (ছাঃ) একটি আয়াত জানলেও তা প্রচারের নির্দেশ দিয়েছেন। উম্মাতের কাছে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার এই কর্তব্যটি শত্রুর ঘাড়ে বর্শার আঘাত পৌঁছে দেওয়ার চেয়েও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। কেননা বর্শা হানার কাজটি বহু মানুষ করে থাকে কিন্তু দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছানোর দায়িত্বটি কেবল আম্বিয়ায়ে কেরামের উত্তরাধীকারীরাই পালন করেন' *(আত-তাফসীর আল-কাইয়েম, পৃঃ ৪৩০-৪৩১)*।

২. আল্লামা ইবনে বায বলেন, 'ওলামা, মুবাল্লিগ ও শাসকবর্গের উপর অবশ্য কর্তব্য হল মানুষকে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করা, যাতে পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে যায়। এই নির্দেশই বিবৃত হয়েছে পবিত্র কুরআনে- 'হে রাসূল! আপনি আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে যা কিছু নাযিল হয়েছে তা (মানুষের কাছে) পৌঁছে দিন *(মায়েদা ৬৭)*। অতএব জ্ঞানী ব্যক্তিদের জন্য অপরিহার্য হল মানুষের নিকট আল্লাহ্র আহ্বানকে পৌঁছে দেওয়া এবং এ পথে ধৈর্যের সাথে অবস্থান করা। আর তাদের দাওয়াত যেন হয় আল্লাহ্র কিতাব, রাসূল (ছাঃ)-এর ছহীহ সুন্নাত এবং রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের অনুসৃত নীতি তথা সালাফে ছালেহীনের মানহাজের উপর ভিত্তিশীল' *(মাজমূ'উ ফাতাওয়া ১/২৪৮ ও ৩৩৩)*।

সারবস্তু

১. দাওয়াত প্রদান আল্লাহ নির্দেশিত একটি ফরয আমল।
২. দাওয়াতের মাধ্যমে মানুষকে কল্যাণ ও সঠিক পথ প্রদর্শন করা সম্ভব।
৩. দাওয়াতের মাধ্যমে ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ সম্ভব।
৪. ব্যক্তি ও সমাজ সংশোধনের মাধ্যম হল দাওয়াত।
৫. দ্বীন ইসলামের বিশ্বজোড়া অবস্থান সৃষ্টি দাওয়াতের অন্যতম লক্ষ।
৬. পৃথিবীর সর্বাধিক উত্তম কথা সেই ব্যক্তির যে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করে।
৭. সমাজের সর্বনিম্নস্তর থেকে সর্বোচ্চস্তর পর্যন্ত সমস্ত মানুষই দাওয়াতের মুখাপেক্ষী।
৮. আল্লাহ্র বাণী ও রাসূলের সুন্নাত থেকে মাত্র একটি বিষয় জানা থাকলেও তা প্রচার করতে হবে।
৯. দাওয়াতদাতার ছওয়াব হল তার দাওয়াতে সঠিক পথে আগমনকারী সমস্ত লোকের ছওয়াবের সমপরিমাণ।
১০. সর্বোপরি ঈমান আনার পর আমলে ছালেহ হল মুমিনের প্রথম কর্তব্য এবং দ্বিতীয় কর্তব্য হল দ্বীনের দাওয়াত প্রদান।

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্ক

ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

ভূমিকা :

নির্দিষ্ট নেতৃত্বের অধীনে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে সংঘবদ্ধ একদল মানুষকে জামা'আত বা সংগঠন বলা হয়। দাওয়াতী জীবনে যার গুরুত্ব অপরিসীম। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তা'আলার দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা হচ্ছে- وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ– 'তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান জানাবে, সৎকাজের আদেশ দিবে এবং অন্যায় কাজে নিষেধ করবে, আর তারাই হ'ল সফলকাম' *(আলে ইমরান ১০৪)*। আল্লাহ আরো বলেন, كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ 'তোমরাই সর্বোত্তম উম্মাত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উত্থান ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দিবে এবং আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনবে' *(আলে ইমরান ১১০)*। আলোচ্য আয়াত দু'টিতে জামা'আতী যিন্দেগীর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পরিস্ফুট হয়ে ওঠেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের নির্দেশ প্রদান করেছেন *(আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৩৬৯৪ 'ইমারত' অধ্যায়; মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৭৪)*। ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন, لاَ إِسْلاَمَ إِلاَّ بِجَمَاعَةٍ وَلاَ جَمَاعَةَ إِلاَّ بِإِمَارَةٍ وَلاَ إِمَارَةَ إِلاَّ بِطَاعَةٍ 'ইসলাম হয় না জামা'আত ছাড়া, জামা'আত হয় না আমীর ছাড়া, আর ইমারত হয় না আনুগত্য ছাড়' *(দারেমী ও ইবনু আবদিল বার্র, জামেউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহি ১/৬২ পৃঃ, গৃহীত : জামা'আতী যিন্দেগী, পৃঃ ৮)*। সুতরাং একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, দাওয়াতী কাজে সাংগঠনিক জীবনের কোন বিকল্প নেই। আর কোন সংগঠনকে তার কাংখিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য যেমন যোগ্য নেতৃত্ব প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন ত্যাগের সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী নিবেদিতপ্রাণ কর্মী বাহিনী। যারা নিজেদের মধ্যে হবে পরস্পর রহমদিল এবং শত্রুর মোকাবেলায় হবে রুদ্র-কঠোর। তাদের মধ্যে থাকবে সৌহার্দমূলক সম্পর্কের সুদৃঢ় ভিত্তি। বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত এ বিষয়ে নাতিদীর্ঘ আলোচনা পেশ করা হ'ল।-

১. ভ্রাতৃসুলভ সম্পর্ক :

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের মধ্যে ভ্রাতৃসুলভ সম্পর্ক বিরাজ করবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَ لاَ يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِىْ حَاجَةِ اَخِيْهِ كَانَ اللهُ فِىْ حَاجَتِهِ وَ مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِّنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ– 'এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে না তার উপর যুলুম করতে পারে এবং না তাকে শত্রুর হাতে সোপর্দ করতে পারে। যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণে সচেষ্ট হয়, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করে দেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের কোন কষ্ট বা অসুবিধা দূর করে দেয়, এর বিনিময়ে আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তার কষ্ট ও বিপদ থেকে অংশবিশেষ দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন রাখে, আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন রাখবেন' *(বুখারী, মুসলিম, আলবানী মিশকাত হা/৪৯৫৮; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৪৭৪১)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে তার উপর যুলুম করবে না, তাকে লজ্জিত করবে না, হীন মনে করবে না। 'তাক্বওয়া' এখানে, এ কথা বলে তিনি স্বীয় বক্ষের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন। (তিনি বলেন) কোন ব্যক্তির খারাপ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে হেয় প্রতিপন্ন করবে। একজন মুসলমানের জান, মাল ও ইযযত অপর মুসলমানের জন্য হারাম' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৫৯; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৪৭৪২)*।

২. পারস্পরিক ভালবাসার সম্পর্ক :

কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্ক হবে সৌহার্দপূর্ণ ও ভালবাসানির্ভর। আর তা হবে আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার জন্য। কেননা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনায় কাউকে ভালবাসার মধ্যেই ঈমানের পরিপূর্ণতা নিহিত আছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَ اَبْغَضَ لِلّٰهِ وَ اَعْطٰى لِلّٰهِ وَ مَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ– 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্য কাউকে ভালবাসল, আল্লাহ্র জন্য কারো সাথে শত্রুতা পোষণ করল, আল্লাহ্র জন্য দান-খয়রাত করল এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই দান-খয়রাত থেকে বিরত থাকল, সে অবশ্যই ঈমানকে পরিপূর্ণ করল' *(আবূদাঊদ, তিরমিযী, বঙ্গানুবাদ মিশকাত ১/৩৩ হা/২৮)*।

অন্য হাদীছে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাউকে ভালবাসাকে 'হালাওয়াতুল ঈমান' বা ঈমানের স্বাদ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثٌ مَّنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلاَوَةَ الْاِيْمَانِ مَنْ كَانَ اللهُ وَ رَسُوْلُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنْ اَحَبَّ عَبْدًا لاَ يُحِبُّهُ اِلاَّ لِلّٰهِ وَمَنْ يَّكْرَهُ اَنْ يَّعُوْدَ فِى الْكُفْرِ بَعْدَ اَنْ اَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُّلْقَى فِى النَّارِ–

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'যার মধ্যে তিনটি জিনিসের সন্নিবেশ ঘটবে, সে যেন ঈমানের স্বাদ পেল। (১) যার নিকট আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) সবকিছুর চাইতে অধিক প্রিয়তম হবে। (২) যে ব্যক্তি কাউকে শুধুমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই ভালবাসে। (৩) আল্লাহ কুফর হতে নাজাত দেওয়ার পর পুনরায় কুফরীতে ফিরে যাওয়াকে যে ব্যক্তি এমনভাবে অপসন্দ করে, যেভাবে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে সে অপসন্দ করে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭, 'ঈমান' অধ্যায়)*।

তাছাড়া কর্মীদের পারস্পরিক ভালবাসা তাদের উপর আল্লাহ্র ভালবাসাকে ওয়াজিব করে দেয়। এ প্রসঙ্গে হাদীছে কুদসীতে এসেছে-

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَجَبَتْ مَحَبَّتِىْ لِلْمُتَحَابِّيْنَ فِىَّ وَالْمُتَجَالِسِيْنَ فِىَّ وَالْمُتَزَاوِرِيْنَ فِىَّ وَالْمُتَبَاذِلِيْنَ فِىَّ–

মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ বলেন, 'যারা আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে পরস্পরকে ভালবাসে, আমার উদ্দেশ্যে পরস্পরে সমাবেশে মিলিত হয় এবং আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে আমার ভালবাসা তাদের জন্য ওয়াজিব হয়ে যায়' *(মুওয়াত্তা মালেক, সনদ ছহীহ, আলবানী মিশকাত হা/৫০১১ 'শিষ্টাচার' অধ্যায় 'আল্লাহ্র সাথে এবং আল্লাহ্র জন্য ভালবাসা' অনুচ্ছেদ)*।

আল্লাহকে রাজী-খুশী করার নিমিত্তে কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক মুহাব্বত সুদৃঢ় হলে ক্বিয়ামতের দিন তা বিশেষ মর্যাদার কারণ হবে। সেদিন আল্লাহ তাদেরকে তাঁর ছায়ায় আশ্রয় দান করবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اِنَّ اللهَ يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَيْنَ الْمُتَحَابُّوْنَ بِجَلاَلِى اَلْيَوْمَ اُظِلُّهُمْ فِىْ ظِلِّىْ يَوْمَ لاَ ظِلَّ اِلاَّ ظِلِّىْ– 'ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা

বলবেন, আমার সুমহান ইয্যতের খাতিরে যারা পরস্পরে ভালবাসা স্থাপন করেছে তারা কোথায়? আজ আমি তাদেরকে আমার বিশেষ ছায়ায় স্থান দিব। আর আজ আমার ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া নেই' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫০০৬; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৪৭৮৭ 'শিষ্টাচার' অধ্যায় 'আল্লাহ্র সাথে এবং আল্লাহ্র জন্য ভালবাসা' অনুচ্ছেদ)*।

অতএব নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা সৃষ্টির মাধ্যমে মহান আল্লাহ্র ভালবাসা হাছিলের চেষ্টা করা সকল কর্মীর উপরই অপরিহার্য। অন্যথা সে হবে হতভাগা। দুনিয়ার ন্যায় আসমানেও সে ঘৃণিত হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন জিবরীল (আঃ)-কে ডেকে বলেন, আমি অমুক বান্দাকে ভালবাসি, সুতরাং তুমিও তাকে ভালবাস। অতঃপর জিবরীল তাকে ভালবাসতে থাকেন এবং আকাশে ঘোষণা করে দেন যে, আল্লাহ তা'আলা অমুক বান্দাকে ভালবাসেন, অতএব তোমরাও তাকে ভালবাস। তখন আসমানের অধিবাসীরা তাকে ভালবাসতে থাকে। অতঃপর ঐ ব্যক্তির জন্য দুনিয়াতেও জনপ্রিয়তা দান করা হয়। অপরদিকে আল্লাহ তা'আলা যখন কোন বান্দাকে ঘৃণা করেন, তখন তিনি জিবরীল (আঃ)-কে ডেকে বলেন, আমি অমুক বান্দাকে ঘৃণা করি, তুমিও তাকে ঘৃণা কর। তখন জিবরীল তাকে ঘৃণা করেন এবং আকাশে ঘোষণা করে দেন যে, আল্লাহ তা'আলা অমুক ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন, সুতরাং তোমরাও তাকে ঘৃণা কর। তখন আসমানের অধিবাসীরা তাকে ঘৃণা করতে থাকে। অতঃপর তার জন্য দুনিয়াতেও জনমনে ঘৃণা সৃষ্টি করে দেওয়া হয় *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫০০৫; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৪৭৮৬, ৯/১৪৪ পৃঃ)*।

৩. পরস্পরে দয়ার্দ্র হৃদয়ের অধিকারী হওয়া :

ইসলামী আন্দোলনের সকল স্তরের কর্মীদের এটি অবশ্যম্ভাবী গুণ হওয়া উচিত যে, তারা একে অপরের প্রতি সহমর্মী, সহানুভূতিশীল ও রহমদিল হবে। কোন অবস্থাতেই রুদ্র-কঠোর ও কর্কশভাষী হওয়া সমীচীন হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর সাথীবৃন্দের এটিই ছিল অনুপম বৈশিষ্ট্য, যা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্ক তুলে ধরে মহান আল্লাহ বলেন, مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ– 'মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল' *(ফাতহ ২৯)*। মুমিনদের পরিচয় দিতে গিয়ে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ يُجَاهِدُوْنَ فِى سَبِيْلِ اللهِ وَ لاَ يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ– 'তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে এবং কাফেরদের প্রতি হবে কঠোর। তারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করবে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না' *(মায়েদা ৫৪)*।

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্ক হবে দেয়াল সদৃশ। এক ইটের মধ্যে অপর ইট ঢুকিয়ে যেভাবে দেয়ালকে মজবুত করা হয়, তদ্রূপ সুদৃঢ় সম্পর্ক থাকবে কর্মীদের মধ্যে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ– 'এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য গৃহ স্বরূপ, যার এক অংশ অপর অংশকে সুদৃঢ় রাখে। অতঃপর তিনি তাঁর এক হাতের আঙ্গুল অন্য হাতের আঙ্গুলের মধ্যে প্রবেশ করালেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৫৫; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৪৭৩৮)*। অন্য হাদীছে এসেছে-

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْ لُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ فِىْ تَرَاحُمِهِمْ وَ تَوَادِّهِمْ وَ تَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ اِذَ اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَّى–

নো'মান ইবনে বাশীর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'তুমি মুমিনদেরকে পারস্পরিক সহানুভূতি, বন্ধুত্ব ও দয়া-অনুগ্রহের ক্ষেত্রে একটি দেহের মত দেখবে। যখন দেহের কোন অংশ অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন সমস্ত শরীর তজ্জন্য বিনিদ্র ও জ্বরে আক্রান্ত হয়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৫৩; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৪৭৩৬)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরও বলেন, 'সকল মুমিন এক ব্যক্তির ন্যায়। যদি তার চক্ষু অসুস্থ হয় তখন তার সর্বাঙ্গ অসুস্থ হয়ে পড়ে। আর যদি তার মাথায় ব্যথা হয়, তখন সমস্ত দেহই ব্যথিত হয়ে পড়ে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৫৪; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৪৭৩৭)*।

৪. একে অপরের জন্য দর্পণ স্বরূপ :

মানুষ মাত্রেরই কমবেশী ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকবে, এটিই স্বাভাবিক গতিধারা। তাই বলে সামান্য ত্রুটিকে বড় করে দেখে পরিবেশ ঘোলাটে করা ঠিক নয়। ইসলাম বরং মানুষের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখার প্রতিই তাকীদ প্রদান করেছে। দুর্ভাগ্য হচ্ছে, আমরা সে তাকীদের প্রতি সামান্যতম ভ্রুক্ষেপ না করে ঘোলাপানিতে মাছ শিকারে অধিক তৎপর হয়ে উঠি। ফলে একুল-ওকুল দু'কুলই হারাই। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের চরিত্র হবে এর বিপরীত। তারা পরস্পর ছিদ্রান্বেষণকারী নয়; বরং একে অপরের জন্য হবে দর্পণ স্বরূপ। তারা যার ত্রুটি, সরাসরি তাকে বিনয়ের সাথে জানিয়ে ইছলাহের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِى الدُّنْيَا اِلاَّ سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ– 'পার্থিব জগতে (আল্লাহ্র) যে বান্দা অপর বান্দার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন' *(মুসলিম হা/৪৬৯২)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ تَتَّبِعُوْا عَوْرَاتِهِمْ فَاِنَّهُ مَنْ يَّتَّبِعُ عَوْرَةَ اَخِيْهِ الْمُسْلِمِ يَتَّبِعُ اللهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَّتَّبِعُ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَ لَوْ فِىْ جَوْفِ رَحْلِهِ– 'তোমরা কোন মুসলমানের গোপন দোষ অন্বেষণ কর না। কারণ যে ব্যক্তি তার কোন মুসলিম ভাইয়ের দোষান্বেষণ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার দোষ অন্বেষণ করবেন। আর আল্লাহ যার দোষ খুঁজবেন তাকে অপমান করবেন, যদিও সে তার গৃহাভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকে' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫০৪৪; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৪৮২৩; সনদ হাসান, তাহক্বীক্ব তিরমিযী হা/২০৩২)*।

অতএব কোন অবস্থাতেই কর্মীদেরকে ছিদ্রান্বেষণকারী হওয়া যাবে না। বরং কারো মধ্যে কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে গঠনমূলক পরামর্শের মাধ্যমে তাকে সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।

৫. সৎকাজে প্রতিযোগিতামূলক সম্পর্ক :

আল্লাহ বলেন, فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ 'তোমরা সৎকাজে প্রতিযোগিতামূলকভাবে এগিয়ে যাও' *(বাক্বারাহ ১৪৮)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَسَارِعُوْا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ 'তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে ছুটে যাও, যার সীমানা আসমান ও যমীন পরিব্যাপ্ত, যা তৈরী করা হয়েছে মুত্তাক্বীদের জন্য' *(আলে ইমরান ১৩৩)*। আলোচ্য আয়াতে ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে প্রতিযোগিতামূলকভাবে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এখানে ক্ষমা অর্থ সৎকর্ম, যা আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা লাভ করার কারণ হয় *(বঙ্গানুবাদ মাআরেফুল কুরআন, সঊদী আরব: বাদশাহ ফাহদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩হিঃ: পৃঃ ২০৪)*। অন্য আয়াতে জান্নাতীদের বিভিন্ন নে'মতের বিবরণ দানের পর আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَفِىْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ 'এ বিষয়ে প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত' *(তাতফীফ ২৬)*। অর্থাৎ উক্ত নে'মত প্রাপ্তির প্রত্যাশায় নেকীর প্রতিযোগিতা করা উচিত।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, بَادِرُوْا بِالْاَعْمَالِ فَسَتَكُوْنُ فِتَنٌ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَّ يُمْسِىْ كَافِرًا وَّ يُمْسِىْ مُؤْمِنًا وَّ يُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيْعُ دِيْنَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا– 'তোমরা অনতিবিলম্বে সৎকাজের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে যাও। কেননা শীঘ্রই অন্ধকার রাতের অংশের মত বিপদ-বিশৃংখলার বিস্তার ঘটবে। তখন মানুষ সকাল বেলা মুমিন থাকবে,

সন্ধ্যায় কাফের হয়ে যাবে, আবার সন্ধ্যায় মুমিন থাকবে সকালে কাফের হয়ে যাবে। সে তার দ্বীনকে পার্থিব স্বার্থের বদলে বিক্রয় করবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩৮৩ 'ফিতান' অধ্যায়; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৫১৫০)*।

৬. সর্বোচ্চ ত্যাগের সম্পর্ক :

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীগণ পরস্পরের মধ্যে সর্বোচ্চ ত্যাগের অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন। যে দৃষ্টান্ত ছিল ছাহাবীদের মধ্যে, আনছার ও মুহাজিরদের মধ্যে। নিজেদের সহায়-সম্পদ ও বাস্তুভিটা সহ সর্বস্ব খুইয়ে মহান আল্লাহ্র বিধান মানার নিমিত্তে এবং পরকালীন অনন্ত জীবনের চিরস্থায়ী মুক্তির স্বার্থে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করে আসা মুসলমানদের প্রতি মদীনার আনছার ছাহাবীদের হৃদয় নিংড়ানো মুহাব্বত ও সার্বিক সহযোগিতা বিশ্ব ইতিহাসে দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ أُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ اَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِّنَ اللهِ وَ رِضْوَانًا وَّ يَنْصُرُوْنَ اللهَ وَ رَسُوْلَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُوْنَ– وَالَّذِيْنَ تَبَوَّئُو الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَ لاَ يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوْتُوْا وَ يُؤْثِرُوْنَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُّــوْقَ شُــحَّ نَفْسِه فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ–

'এই ধন-সম্পদ দেশত্যাগী নিঃস্বদের জন্য, যারা আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি লাভের অন্বেষণে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাহায্যার্থে নিজেদের বাস্তুভিটা ও ধন-সম্পদ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে। তারাই সত্যবাদী। যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে মদীনায় বসবাস করেছিল এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তারা মুহাজিরদের ভালবাসে, মুহাজিরদের যা দেওয়া হয়েছে, তজ্জন্য তার অন্তরে ঈর্ষাপোষণ করে না এবং নিজেরা অভাবগ্রস্থ হলেও তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত তারাই সফলকাম' *(হাশর ৮-৯)*।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এক ব্যক্তি এসে বলল, আমি ভীষণ ক্ষুধার্ত। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর এক স্ত্রীর কাছে লোক পাঠালেন। তাঁর স্ত্রী বললেন, শপথ সেই সত্তার, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন! আমার নিকট পানি ছাড়া আর কিছুই নেই। আরেক স্ত্রীর কাছে পাঠালে তিনিও একই জওয়াব দিলেন। এমনকি একে একে প্রত্যেক স্ত্রীই এরকম জওয়াব দিলেন যে, শপথ সেই সত্তার, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন! আমার নিকট পানি ব্যতীত আর কিছুই নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবীদের বললেন, আজ রাতে কে এই লোকের মেহমানদারী করবে? জনৈক আনছারী বলল, আমি করব হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)। তিনি তাকে সাথে নিয়ে নিজের ঘরে গেলেন এবং স্ত্রীকে বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মেহমানের যথাযথ খাতির-যত্ন কর। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আনছারী তার স্ত্রীকে বলল, তোমার কাছে কিছু (খাবার) আছে কি? সে বলল, বাচ্চাদের খাবার ছাড়া আর কিছু নেই। আনছারী বললেন, বাচ্চাদের কিছু একটা দিয়ে ভুলিয়ে রাখ এবং ওরা সন্ধ্যার খানা চাইলে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ো। আর আমাদের মেহমান যখন এসে যাবে তখন বাতি নিভিয়ে দিয়ো। আর তাকে এটাই বুঝাবে যে, আমরাও খানা খাচ্ছি। তারা সবাই বসে গেলেন। এদিকে মেহমান খাবার খেলেন এবং তারা উভয়ে সারারাত উপোস কাটিয়ে দিলেন। পরদিন প্রত্যুষে তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে গেলে তিনি বললেন, এ রাতে মেহমানের সাথে তোমরা যে আচরণ করেছ, তাতে আল্লাহ সন্তোষ প্রকাশ করেছেন' *(বুখারী, মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৫৬৪)*।

সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈকা মহিলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে একটি হাতে বোনা চাদর নিয়ে এসে বলল, আমি নিজ হাতে এই চাদর বুনেছি আপনাকে পরানোর জন্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) চাদরটি গ্রহণ করলেন। তিনি সেটিকে তহবন্দ হিসাবে পরিধান করে আমাদের নিকট আসলেন। তখন এক ব্যক্তি বলল, এটি আমাকে দিয়ে দিন, কতইনা সুন্দর এই চাদরটি। তিনি বললেন, আচ্ছা। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কিছু সময় মজলিসে বসা ছিলেন, তারপর ফিরে গিয়ে চাদরটি ভাঁজ করে ঐ লোকটির জন্য পাঠিয়ে দিলেন। লোকেরা তাকে বলল, তুমি কাজটি ভাল করনি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর প্রয়োজনের তাকিদে চাদরটি পরেছিলেন, আর তুমি তা চেয়ে বসলে? অথচ তুমি জান যে, তিনি কোন প্রার্থীকে বঞ্চিত করেন না। সে বলল, আল্লাহ্র শপথ! আমি এটি পরিধান করার জন্য চাইনি, বরং মৃত্যুর পর আমার কাফন দেয়ার জন্য চেয়েছি। সাহাল বলেন, সেটি তার কাফন হিসাবেই ব্যবহৃত হয়েছিল' *(বুখারী, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৫৬৭)*।

ইয়ারমুকের যুদ্ধে হুযায়ফা (রাঃ) সামান্য পানি হাতে স্বীয় আহত রক্তাক্ত চাচাত ভাইকে বললেন, তুমি কি পানি পান করবে? মৃত্যুযন্ত্রণায় বাকরুদ্ধ চাচাত ভাই হ্যাঁ সূচক ইঙ্গিত করল। অতঃপর পানি হাতে নিতেই অনতিদূরে আরেক আহত সৈনিকের পানি পানি চিৎকার শুনতে পেয়ে নিজে পানি পান না করে হুযায়ফাকে ইশারায় সেদিকে পাঠিয়ে দিলেন। হুযায়ফা এবার তার নিকটে গিয়ে পানি হাতে তুলে দিতেই পাশে আরেকজন তৃষ্ণার্ত সৈনিকের পানির আর্তনাদ শুনতে পেলেন। অতঃপর নিজে পানি পান না করে হুযায়ফাকে বললেন, তার দিকে দ্রুত ছুটে যাও এবং সে পানি পান করার পর কিছু অবশিষ্ট থাকলে আমাকে দিয়ো। হুযায়ফা আহত সৈনিকটির কাছে গিয়ে দেখলেন তিনি শাহাদত বরণ করেছেন। অতঃপর দ্বিতীয় জনের কাছে ফিরে এসে দেখলেন তিনিও শাহাদত বরণ করেছেন। অতঃপর স্বীয় চাচাত ভাইয়ের নিকটে এসে দেখেন যে, তিনিও শাহাদতের অমীয় সুধা পান করেছেন। পানির পাত্রটি তখন হুযায়ফার হাতে। এতটুকু পানি। অথচ তা পান করার মত আর কেউ বেঁচে নেই। যাদের পানির প্রয়োজন ছিল তারা আরেকজনের পানির পিপাসা মেটাবার জন্য এতই পাগলপরা ছিলেন যে, অবশেষে কেউ সে পানি পান করতে পারেননি *(আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়াহ (কায়রো: ১৯৮৮), ৭/৮-১১ দ্র:)*।

কি অপূর্ব ভ্রাতৃত্ব! কি অসামান্য ত্যাগ! নিজের প্রয়োজনের চেয়ে অপর মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজনকে তারা কেমন অগ্রাধিকার দিতেন, এ ঘটনাই তার জাজ্জ্বল্য প্রমাণ। যা বিশ্বইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে ক্বিয়ামত পর্যন্ত। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা কি পারবেন ত্যাগের এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে?

৭. পারস্পরিক কল্যাণকামী হওয়া :

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীগণ পরস্পরে কল্যাণকামী হবেন। কখনো ঈর্ষাপরায়ণ হবেন না। এক ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণে অপর ভাই এগিয়ে আসবেন। পারস্পরিক পরামর্শ ও সহযোগিতার ভিত্তিতে দাওয়াতী ময়দানে নিরলসভাবে কাজ করে যাবেন। দাওয়াত ও ইছলাহের ভিত্তিতে ব্যক্তি সংশোধন অতঃপর সর্বাত্মক সমাজ সংস্কারে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন এবং এর মাধ্যমে সকল মুসলমানের জন্য সর্বাধিক কল্যাণকামী হিসাবে নিজেকে গড়ে তুলবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اَلدِّيْنُ اَلنَّصِيْحَةُ قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلّــهِ وَ لِكِتَابِه وَ لِرَسُوْلِه وَ لِاَئِمَّةِ الْمُــسْلِمِيْنَ وَ عَــامَّتِهِمْ– 'দ্বীন হচ্ছে উপদেশ বা কল্যাণ কামনা'। (রাবী বলেন) আমরা বললাম, কার জন্য? তিনি বললেন, আল্লাহ্র জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলমানদের ইমাম বা নেতা এবং সমস্ত মুসলমানের জন্য' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৬৬ 'শিষ্টাচার' অধ্যায় 'সৃষ্টির প্রতি দয়া' অনুচ্ছেদ; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৪৭৪৯)*।

পারস্পরিক কল্যাণ কামনা ও হকের উপদেশ দেয়া ইসলামের মূল ভিত্তির সাথে তুলনীয়। এখানে আল্লাহ্র জন্য কল্যাণ কামনা বা নছীহত অর্থ হল : তাঁর যাবতীয় আদেশ-নিষেধকে মেনে নেয়া। কিতাবের জন্য নছীহত অর্থ হল : কিতাব থেকে জ্ঞানার্জন ও সেই অনুযায়ী কাজ করা। রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য নছীহত অর্থ হল : তাঁর

আনুগত্য, দীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা চালানো। মুসলিম নেতাদের নছীহত অর্থ হল : তাদেরকে সঠিক পরামর্শ দেওয়া ও ভুলগুলো ধরিয়ে দেওয়া এবং সার্বিক পর্যায়ে ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানানো *(রিয়াদুস সালেহীন, অনুবাদ: মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মাদ আলী ও অন্যান, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, এপ্রিল ২০০২, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৫৪ হা/১৮১ -এর টীকা দ্রষ্টব্য)*।

জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)–এর কাছে ছালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা এবং সমস্ত মুসলমানের কল্যাণ কামনা করা ও সঠিক উপদেশ দেয়ার বায়'আত গ্রহণ করেছি' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৬৭; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৪৭৫০)*।

৮. পরস্পর ক্ষমাপরায়ণ হওয়া :

প্রতিশোধপরায়ণ না হয়ে বরং পরস্পরে ক্ষমাপরায়ণ হওয়াই ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণ হওয়া উচিত। সামান্য বিষয় নিয়ে নিজেদের ভুল বুঝাবুঝি হতে পারে, আবার ছোট্ট বিষয়টিও শয়তানের ধোঁকার কারণে বিরাট আকার ধারণ করতে পারে। দাওয়াতী ময়দানে এ রকম ছোটখাট বিষয়কে মূল ধরলে দাওয়াতী কাজ বাধাগ্রস্থ হবে- এতে কোন সন্দেহ নেই। এমতাবস্থায় উচিত হবে বিষয়টিকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা। যার পক্ষ থেকে ক্ষমা বিঘোষিত হবে তিনি নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে মহাপুরস্কার প্রাপ্ত হবেন। আর এজন্যই পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে ক্ষমাপরায়ণ হওয়ার জন্য জোর তাকীদ প্রদান করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ– 'ক্ষমাশীলতা অবলম্বন কর, সৎ কাজের আদেশ দাও এবং মূর্খ লোকদের এড়িয়ে চলো' *(আ'রাফ ১৯৯)*। وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّوْنَ أَن يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ 'তারা যেন ওদের ক্ষমা করে এবং তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাওনা যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন? আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল ও দয়ালু' *(নূর ২২)*। اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ 'যারা স্বচ্ছলতায় ও অভাবের সময় ব্যয় করে, নিজেদের ক্রোধকে সংবরণ করে এবং লোকদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে। বস্তুত আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন' *(আলে ইমরান ১৩৪)*।

উক্ত আয়াত সমূহ হতে এটি সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যায় যে, যারা পরস্পরের প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হবে, আল্লাহও তাদেরকে ক্ষমা করবেন।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করা ব্যতীত কখনো কাউকে মারেননি, না কোন স্ত্রীলোককে, না কোন খাদেমকে। তাঁকে কষ্ট দেয়া সত্ত্বেও তিনি কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। অবশ্য আল্লাহ নির্ধারিত কোন হারামকে লংঘন করা হলে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে তিনি প্রতিশোধ গ্রহণ করেছেন' *(মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৬৪৪)*।

আনাস (রাঃ) বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর সাথে হাটছিলাম। তাঁর গায়ে ছিল মোটা পাড়বিশিষ্ট একটি নাজরানী চাদর। এক বেদুইন তাঁর নিকট এসে তাঁর চাদরটি ধরে ভীষণ জোরে টান দিল। আমি লক্ষ্য করলাম, সজোরে চাদর টানার কারণে রাসূল (ছাঃ)-এর ঘাড়ের পার্শ্বদেশে দাগ পড়ে গেছে। বেদুইন বলল, হে মুহাম্মাদ! আপনার নিকট আল্লাহ্র দেয়া যে মাল-সম্পদ রয়েছে, তা থেকে আমাকে কিছু দেয়ার ব্যবস্থা করুন। তিনি লোকটির প্রতি তাকিয়ে হেসে দিলেন এবং তাকে কিছু দেওয়ার নির্দেশ দিলেন' *(বুখারী, মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৬৪৫)*।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দিকে তাকিয়ে আছি, তিনি আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের মধ্যকার একজন সম্পর্কে বর্ণনা করছিলেন। তাঁকে তাঁর জাতি আঘাতে আঘাতে রক্তাক্ত করে দিয়েছিল। তিনি নিজের চেহারা থেকে রক্ত মুছছিলেন আর বলছিলেন, হে আল্লাহ! আমার কওমকে ক্ষমা করুন। কারণ এরা তো অবুঝ' *(বুখারী, মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৬৪৬)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রকৃত বীরের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرْعَةِ اِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِىْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ– 'কুস্তিতে প্রতিপক্ষকে হারিয়ে জয়লাভ করাতে বীরত্ব নেই; রবং ক্রোধের মুহূর্তে নিজেকে সংবরণ করতে পারাই প্রকৃত বীরত্বের পরিচায়ক' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫১০৫; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৪৮৭৮ 'শিষ্টাচার' অধ্যায় 'ক্রোধ ও অহংকার' অনুচ্ছেদ)*।

৯. পারস্পরিক সন্দেহমুক্ত সম্পর্ক হওয়া :

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের মাঝে সন্দেহমুক্ত সম্পর্ক গড়ে ওঠা আবশ্যক। ধারণা থেকে তারা থাকবে সম্পূর্ণ মুক্ত। তবেই পারস্পরিক দ্বীনী মুহাব্বত সুদৃঢ় হবে। কেননা ধারণানির্ভর কথাবার্তা ও ক্রিয়া-কলাপই পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে এবং পর্যায়ক্রমে সম্পর্কের মারাত্মক অবনতি ঘটায়। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে ধারণা করাকে চূড়ান্তভাবে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ– 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা অধিক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয়ই কতেক ধারণা পাপ' *(হুজুরাত ১২)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেনে, اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ– 'তোমরা ধারণা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয়ই ধারণা মহাপাপ' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫০২৮; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৪৮০৮ 'শিষ্টাচার' অধ্যায় 'সম্পর্ক ত্যাগ, বিচ্ছিন্নতা ও দোষান্বেষণের নিষেধাজ্ঞা' অনুচ্ছেদ)*।

১০. নেতৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া :

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা নেতৃত্বের প্রতি হবে পরম শ্রদ্ধাশীল। তারা কখনো নেতৃত্ব নিয়েও ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হবে না। কেননা ইসলামে নেতৃত্ব চেয়ে নেওয়ার কোন বিধান নেই। তাক্বওয়া ও যোগ্যতার বিবেচনায় নেতা মনোনীত হয়ে থাকেন মাত্র। এ ক্ষেত্রে উর্ধ্বতন নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত মাথা পেতে মেনে নেওয়া সকলের জন্য আবশ্যক। উবাদা ইবনে ছামেত (রাঃ) বলেন, بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ الْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَ عَلَى اَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَ عَلَى اَنْ لاَ نُنَازِعَ الْاَمْرَ اَهْلَهُ وَ عَلَى اَنْ نَقُوْلَ بِالْحَقِّ اَيْنَمَا كُنَّا لاَ نَخَافُ فِى اللهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ– 'আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এই মর্মে বায়'আত করেছিলাম যে, আমরা আমীরের আদেশ শুনব ও মেনে চলব কষ্টে হৌক স্বাচ্ছন্দ্যে হৌক, আনন্দে হৌক অপসন্দে হৌক বা আমাদের উপরে কাউকে প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রে হৌক এবং বায়'আত করেছিলাম এই মর্মে যে, নেতৃত্ব নিয়ে আমরা কখনো ঝগড়া করব না। যেখানেই থাকি সর্বদা সত্য কথা বলব এবং আল্লাহ্র হুকুম মেনে চলার ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দাবাদকে ভয় করব না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত 'ইমারত' অধ্যায় হা/৩৬৬৬)*।

উপসংহার :

সম্পর্ক সুন্দর ও নিঃস্বার্থ হলে কাজ সুন্দর ও স্বচ্ছ হয়। আর সম্পর্কে ফাটল ধরলে কাজের গতি মন্থর হয়ে পড়ে। সাংগঠনিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক। আর এ সম্পর্কের সাথে স্বার্থ জড়িত হলে মূল উদ্দেশ্য হবে ব্যাহত। অতএব ইসলামী আন্দোলনের সকল স্তরের কর্মীকেই উপরোক্ত গুণাবলী হাছিলে সর্বাত্মকভাবে সচেষ্ট হতে হবে। তবেই কাংখিত লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের প্রচেষ্টাকে কবুল করুন- আমীন!!

রামাযান : আত্মশুদ্ধির এলাহী প্রশিক্ষণের মাস

আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

দীর্ঘ একটি মাস যাবৎ বিশ্ব চরাচরের মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অশেষ অনুগ্রহে তাঁরই নির্দেশিত পন্থা মোতাবেক ছিয়ামব্রত পালন করার পর আমরা পুনরায় নিয়মিত জীবনধারায় ফিরে এসেছি। একটি মাসের কঠোর সংযমের প্রশিক্ষণ আমাদের জন্য পরবর্তী এগারো মাস কি ধরনের ভূমিকা রাখবে, তা নির্ভর করছে এ মাসের প্রশিক্ষণকে কতটা গুরুত্বের সাথে এবং কতটা নিবিড়ভাবে গ্রহণ করেছি তার উপর। প্রকৃতপক্ষে মুসলিম সমাজে রামাযান মাসের প্রভাব যেন মু'জিযার মত। মোস্তফা ছাদেক আর-রাফেঈ তাঁর 'অহীউল কলাম' গ্রন্থে সুন্দরভাবে তা উল্লেখ করে বলেন, 'রামাযানের শুদ্ধিতা ও সংস্কারমূলক প্রভাব আর সব মু'জিযার মত একটি বিস্ময়কর মু'জিযা। নবচন্দ্র উদয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা এবং তা দেখার মাধ্যমে ছিয়ামের সূচনা করার পশ্চাতে একটা গভীর অর্থ নিহিত রয়েছে। তা হল চন্দ্রের উদয় সাব্যস্ত হওয়া ও তা ঘোষণা করার মাধ্যমে মানুষ যেন স্বীয় সদিচ্ছা বাস্তবায়নের ঘোষণা উচ্চারণ করে। যেন এক আসমানী আলোকধারা আপন মহিমায় সমগ্র মানবজগতের জন্য দয়া, মানবতা আর পুণ্য সাধনের আভাস নিয়ে উদ্ভাসিত হয়েছে'। এ যেন দিকে দিকে ইসলামের বিজয়কেতনের অপূর্ব আলোড়ন উচ্ছাস। রামাযান মাসের পবিত্র প্রভাব কিভাবে মানুষকে আত্মিক পরিশুদ্ধি এবং কল্যাণ ও পুণ্যের কাজে অগ্রগামী করে তা সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নে উল্লেখিত হল।

রামাযানের প্রশিক্ষণ :

১. **তাক্বওয়া :** ছিয়ামের মৌলিক উদ্দেশ্যই হল তাক্বওয়া তথা আল্লাহভীতি অর্জন। পবিত্র কুরআনে ছিয়াম পালনের নির্দেশে নাযিলকৃত আয়াতে তা স্পষ্টই উল্লেখিত হয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হয়েছে তোমাদের পূর্ববর্তীদের মত যাতে তোমরা তাক্বওয়া অর্জন করতে পার' *(বাক্বারাহ ২/১৮৩)*। ইবাদতের মূল রূহ হল আল্লাহকে ভয় করা তথা আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিল করা। আর ছিয়াম হল তার হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ। প্রকাশ্যে-গোপনে, বাহ্যিক-অভ্যন্তরীণ যে কোন কাজে সার্বক্ষণিক আল্লাহকে ভয় করার যে শিক্ষা রামাযানের দীর্ঘ প্রশিক্ষণে অর্জিত হয়, তা সত্যিকারের প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য এক অতুলনীয় পাওয়া। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করার মত ভয় করতে পারল তার পক্ষে সর্বোচ্চ স্তরের মানুষে পরিণত হওয়া অতি সহজ। আর এমন ব্যক্তিই আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। আল্লাহ স্বয়ং পবিত্র কুরআনে বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আলাহ্র নিকট সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি সেই যে আল্লাহকে অধিক ভয় করে' *(হুজুরাত ৪৯/১৩)*। তিনি আরো বলেন, 'তোমরা (আখিরাতের জন্য) সম্বল অর্জন করে নাও, নিশ্চয়ই সর্বাধিক উত্তম সম্বল হল তাকওয়া' *(বাক্বারাহ ২/১৯৭)*। রামাযানের এই তাক্বওয়ার প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর সে প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ্র নৈকট্য অনুভব করতে থাকে বলে যেকোন নিষিদ্ধ, অনৈতিক কাজে বাধাগ্রস্ত হয়।

২. **ইখলাছ :** রামাযান মাস প্রকৃতই ইখলাছ অর্জনের সর্বশ্রেষ্ঠ সময়। পানাহার বা জৈবিক চাহিদা পূরণের মত হালাল বিষয়কেও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হারাম করে দিয়ে যে কঠোর সংযমের পরীক্ষায় মানুষ অবতীর্ণ হয়, তা তাকে খুলূছিয়াতের উচ্চমার্গে উত্তরণ ঘটায়। কেননা অতি সংগোপনেও যে ব্যক্তি নিজের জন্য হালাল বিষয়কে হারাম করে নিতে পারে কেবলমাত্র আল্লাহ্রই ভয়ে; সে ব্যক্তি দুনিয়ার সকল দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কেবল তার স্রষ্টার জন্যই নিজেকে নিবেদন করার সামর্থ্য অর্জন করে। আর এ সামর্থ্য যে প্রকৃতার্থে অর্জন করেছে, সে নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ্র মুখলিছ বান্দার কাতারে শামিল হয়ে যায়। হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, 'ছিয়াম আমার জন্যই, আর আমি নিজেই এর প্রতিদান দিব। কেননা বান্দা কেবল আমারই জন্য প্রবৃত্তির চাহিদা ও পানাহার থেকে দূরে থাকে' *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৫৯)*।

৩. **তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা :** তওবা কবুলের জন্য রামাযান মাস অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি মাস। সেজন্য এই মাসে প্রতি মুহূর্তে তওবা ও ইস্তিগফারের জন্য বার বার তাকীদ করা হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ঐ ব্যক্তির নাক ধুলায় ধূসরিত হোক যে ব্যক্তি রামাযান মাসকে পেল অতঃপর তা অতিক্রান্ত হল অথচ সে নিজের পাপ ক্ষমা করিয়ে নিতে পারল না' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৯২৭)*। রাসূল (ছাঃ) রামাযানে বিশেষত শেষ দশকে তওবা ও ইস্তিগফারের জন্য এ দো'আটি শিক্ষা দিয়েছেন, اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ 'হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা পছন্দ কর, অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা কর' *(আহমাদ, ইবনু মাজাহ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২০৯১)*। তওবা ও ক্ষমাপ্রার্থনার এই মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ তাকে পাপ কাজে পুনরায় ফিরে যেতে বাধা প্রদান করে। পরবর্তীতে অজ্ঞাতসারে কোন পাপ করে ফেললেও তাৎক্ষণিকভাবে তওবা করে নিজেকে পবিত্র করে ফেলার অভ্যাস তার মধ্যে তৈরী হয়।

৪. **ঈমান ও ইহতিসাব :** ইবাদতের প্রধানতম শর্ত হল তাতে ঈমান ও ইহতিসাব থাকা। রামাযান এই দু'টি গুণ অর্জনের বিশেষ প্রশিক্ষণ দান করে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ঈমান এবং ইহতিসাবের সাথে রামাযানের ছিয়াম পালন করল, তার পূর্ববর্তী সকল (ছগীরা) গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে' *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৫৮)*। অর্থাৎ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস সহকারে এবং পরকালীন জীবনে ছওয়াবের আশা রেখে যে ব্যক্তি ছিয়াম আদায় করবে তার জন্য অনুরূপ পুরস্কার নির্ধারিত রয়েছে। ঈমান অর্থ আল্লাহ্র উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখা, যেভাবে রাখার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। আর ইহতিসাব শব্দটির ব্যাখ্যায় ইবনুল আছীর বলেন, 'সৎকর্ম পালন ও অপছন্দনীয় কাজ থেকে বিরত থাকার ক্ষেত্রে ইহতিসাবের অর্থ হল যে, প্রতিদান প্রাপ্তির আশায় আত্মনিবেদন ও ধৈর্য অবলম্বন এবং পুণ্যের কাজে নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী আত্মনিয়োগের মাধ্যমে তৎপর হওয়া' *(আন-নিহায়াহ, ১/৯৫৫ পৃঃ)*। আল্লামা মুবারকপুরী বলেন, 'এর অর্থ পরকালীন জীবনে প্রতিদান কামনা করা এবং নিয়তে খুলূছিয়াত রাখা'। অর্থাৎ কেবল ছিয়ামের উদ্দেশ্যেই ছিয়াম রাখা; কারো ভয়ে নয়, লজ্জায় নয় বা মানুষকে দেখানো বা শুনানোর জন্য নয়। আল্লামা খাত্তাবী বলেন, 'এর অর্থ দৃঢ় সংকল্প রাখা। সেটা হল- সে এমন আগ্রহের সাথে ছিয়াম রাখবে যে তাতে তার কোনরূপ দ্বিধা থাকবে না, ছিয়ামকে কষ্টকর বিষয় মনে হবে না বা দিনকে খুবই দীর্ঘ অনুভূত হবে না। বরং দিনের দীর্ঘতাকে

সে ছওয়াব অর্জনের বিরাট মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করবে *(মির'আতুল মাফাতীহ, ৬/৪০৪ পৃঃ)*। অর্থাৎ প্রতিটি কাজে ঈমানের পরিচয় রাখা এবং তাতে পরিপূর্ণ আন্তরিকতা বজায় রাখার লাগাতার প্রশিক্ষণই হল ছিয়ামে রামাযান।

৫. রাত্রি জাগরণ : রাত্রি জাগরণ নফল ইবাদতের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইবাদত। পবিত্র কুরআনে মুমিনের পরিচয় দিতে গিয়ে বেশ কয়েক জায়গায় তাদেরকে রাতের ছালাত আদায়কারী হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। রাসূল (ছাঃ)ও কিয়ামুল লাইলের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। সাধারণত রাত্রি জাগরণের জন্য দৃঢ় মানসিক ও শারীরিক সামর্থ্যের প্রয়োজন হয়। রামাযানের দীর্ঘ এক মাস যাবৎ তারাবীর ছালাত আদায়ের মাধ্যমে সহজেই এই কঠিন ও মর্যাদাপূর্ণ ইবাদতটি বান্দার আয়ত্ত হয়ে যায়। যার ধারাবাহিকতা পরবর্তী মাসগুলোতে বজায় রাখা তার জন্য আর কষ্টকর হয় না। এজন্য রামাযান মাসের কিয়াম সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বিশেষভাবে উল্লেখ করে বলেন, 'যে ব্যক্তি রামাযান মাসে ঈমান ও ইহতিসাবের সাথে রাত্রি জাগরণ করে ছালাত আদায় করল, সে ব্যক্তির পূর্ববর্তী গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে' *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৫৮)*।

৬. নিরবচ্ছিন্ন ইবাদত : রামাযানের একটি বিশেষ ইবাদত হল ই'তিকাফ। রামাযানের শেষ দশদিন পূর্ণাঙ্গভাবে ইবাদতে কাটানোর জন্য দুনিয়াবী সংশ্রব থেকে দূরে থেকে একাকী নিরবচ্ছিন্নভাবে

আল্লাহ্‌র ইবাদতে সময় কাটানোর এক সুবর্ণ সুযোগ হল ই'তিকাফ। আত্মিক পরিশুদ্ধির জন্য এর চেয়ে উত্তম প্রশিক্ষণ আর হয় না। দীর্ঘ দশদিনের এই কঠোর সাধনায় লিপ্ত ব্যক্তি অতি সৌভাগ্যবান। কেননা রামাযান যেমন সারা বছরের জন্য প্রশিক্ষণের মাস, তেমনি ই'তিকাফের দশদিন হল এই প্রশিক্ষণের মাসে একটি বিশেষ প্রশিক্ষণকাল। যা তার জন্য সারা জীবনের সম্বল হতে পারে। এজন্য রামাযানের শেষ দশকে উপনীত হলে রাসূল (ছাঃ) রাত্রি জাগরণের জন্য জোর প্রস্তুতি নিতেন। তিনি রাত্রি জাগতেন এবং আপন পরিজনকেও জাগিয়ে দিতেন *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/২০৮৯-৯০)*।

৭. কুরআন শিক্ষা করা : পবিত্র কুরআন শিক্ষার অনুপম সুযোগ এ রামাযান মাস। অন্য মাসে কুরআন তেলাওয়াতের যে ছওয়াব রয়েছে এ মাসে সে ছওয়াব আরো বহুগুণ বেশী। এ কারণে কুরআন তেলাওয়াত এ মাসের একটি বিশেষ ইবাদত। কুরআন নাযিলের এ মাসে পুরা কুরআন একবার অর্থসহ তেলাওয়াত করার সুযোগ অনেকেই গ্রহণ করেন। কুরআন সম্পর্কে জানা ও কুরআনের শিক্ষাকে প্রচার করার জন্য রামাযান মাস অতি উত্তম সুযোগ। কুরআন তেলাওয়াত ও কুরআনের শিক্ষাকে উপলব্ধির জন্য রামাযানের এই ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ বাকী মাসগুলোতেও অব্যাহত রাখার অভ্যাস তৈরী করে দেয়। প্রতি রামাযানে জিবরীল (আঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট পবিত্র কুরআন একবার করে উপস্থাপন করতেন। সালাফে ছালেহীন পবিত্র কুরআন পাঠের জন্য এ মাসে কঠোর সাধনা করতেন। কেউ তিন দিনে, কেউ সাত দিনে, কেউ দশ দিনে কুরআন খতম করতেন। ইমাম মালিক বিন আনাস রামাযান মাস আসলে দরস-তাদরীস বন্ধ করে শুধু কুরআন পাঠ করতেন এবং বলতেন, 'এটা হল কুরআনের মাস'। ইমাম আহমাদও রামাযান মাসে বই-পত্র বন্ধ করে কেবল কুরআনই পাঠ করতেন এবং বলতেন, 'এটা হল কুরআনের মাস'। ইমাম বুখারী রামাযানে দিনে একবার কুরআন খতম করতেন এবং তারাবীর ছালাতের পর কুরআন তেলাওয়াতে রত হতেন এবং প্রতি তিন রাতে একবার খতম করতেন। এমনকি মুসলিম শাসকরাও কুরআন পাঠের জন্য বিশেষ সময় রাখতেন। কথিত রয়েছে যে, খলীফা ওয়ালীদ বিন আব্দুল মালিক রামাযান মাসে ১৭ বার কুরআন খতম করতেন।

৮. আল্লাহকে স্মরণ : রামাযান মাস প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহকে স্মরণ করার অভ্যাস তৈরী করে দেয়। সাহারীর পর দিনব্যাপী সে আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয়গুলো থেকে বিরত থাকার যে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করে, তা তাকে সারাদিন আল্লাহ্‌র স্মরণে ব্যাপৃত রাখে। নিজেকে সবসময় সে যিকির-আযকারে নিমগ্ন রাখে। আর মানুষের জন্য সর্বাধিক পবিত্রতাপূর্ণ ও মর্যাদাবৃদ্ধিকারী বিষয় হল 'আল্লাহ্‌র স্মরণ' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২২৬৯, ২২৭০, সনদ ছহীহ)*।

৯. সৎআমলে অগ্রগামী হওয়া : রামাযানের চাঁদ উঠার পর মৃতপ্রায় আত্মা যেন নতুনভাবে সজীব হয়ে উঠে। অন্যায়, দুরাচার, অলসতার জীর্ণ অপবিত্র পোষাক ঝেড়ে ফেলে সে ন্যায় ও পুণ্যের ঝলমলে পবিত্র পোষাকে সুসজ্জিত হওয়ার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। অন্ধকারের কৃষ্ণগহবর থেকে প্রত্যাবর্তন করে আলোর বন্যায় মিলিত হওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সৎকর্মশীলদের জন্য এ মাসে প্রতিটি সৎকর্মের জন্য সীমাহীন পুরস্কারের ডালি সাজিয়ে রেখেছেন। এ মাসে প্রতিটি সৎ আমলের জন্য ৭০ থেকে ৭০০ গুণ বেশী ছওয়াব প্রদান করা হয় *(মুসলিম)*। হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ বলেন, 'বনী আদমের প্রতিটি সৎআমলের প্রতিদান দেয়া হয় দশ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত; তবে ছিয়াম ব্যতীত। কেননা তা কেবল আমার জন্যই রাখা হয়। তাই এর প্রতিদান আমি নিজেই দান করব' *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৫৯)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যখন রামাযান মাস উপস্থিত হয় তখন আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। অন্য বর্ণনায় জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করা হয় আর শয়তানকে শৃংখলিত করা হয়। অপর বর্ণনায় এসেছে, 'রহমতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়' *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৫৬)*। এজন্য এ মাসে সৎআমলের দিকে বেআমল মানুষ দুর্নিবার আগ্রহ নিয়ে অগ্রসর হয়। যা তাকে পরবর্তী মাসগুলোতে আবার নতুনভাবে সৎ ও ন্যায়ের কাজে আগ্রহী করে তোলে।

১০. ছাদাকা ও দানের হাত সম্প্রসারণ : রামাযান মাস উপস্থিত হলে রাসূল (ছাঃ) এত বেশী দান করতেন যে হাদীছের ভাষায় তা ছিল প্রবাহিত বায়ুর চেয়ে অধিক *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/২০৯৮)*। নফল ছাদাকাসহ বেশী ছওয়াব হাছিলের জন্য এ মাসেই যাকাত

প্রদানের প্রবণতা মুসলিম সমাজে দেখা যায়। এছাড়া ঈদের ছালাতের পূর্বে যাকাতুল ফিৎর আদায় করাকে রাসূল (ছাঃ) প্রত্যেক মুসলমানের উপর বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/১৮১৫)*। এভাবে মানুষের দুঃখে এগিয়ে আসা এবং আর্থিক সহযোগিতার মাধ্যমে তাদের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শনেরও অসাধারণ প্রশিক্ষণ রামাযান মাস প্রদান করে।

১১. সামাজিক সাম্য ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি : রামাযানের সামাজিক গুরুত্ব অতীব লক্ষ্যণীয়। ছিয়াম পালনকারীকে ইফতার করানো অতি ছওয়াবের কাজ *(বায়হাক্বী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৯৯২)*। তাই রামাযান মাসে ছায়েমদের ইফতার করানো মুসলিম সমাজের একটি অপরিহার্য অঙ্গ, যা সামাজিক অঙ্গনকে প্রীতিমুখর করে তোলে। সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের সুবাতাস পরিলক্ষিত হয় সারা দুনিয়া জুড়ে। মাসব্যাপী ফজরের পূর্বে ও সন্ধ্যার সময় মানুষের মাঝে একতার বিনিময়, ফিৎরা আদায়, জামা'আতের সাথে তারাবীর ছালাত আদায় সবকিছুই সারা বছরের জন্য ব্যক্তি ও সমাজজীবনের গতিপথ নির্ধারণ করার মহান শিক্ষা দান করে। এছাড়া বিত্তশালী ও বিত্তহীন নির্বিশেষে সকলেই উপবাসব্রত পালনের ভিতর দিয়ে ক্ষুধার্তের যে যন্ত্রণা অনুভব করতে বাধ্য হয় তা দারিদ্রের যন্ত্রণা সম্পর্কে বিত্তবানদের সচেতন করে তোলে। আরাম-আয়েশ ও ভোগবিলাসে আকণ্ঠ নিমজ্জিত আত্মহারার মানবিক অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। এভাবে একই অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে যে এক সমন্বিত অনুভূতির উজ্জীবন ঘটে সমাজের প্রতিটি স্তরে, তা পরস্পরের সমস্যা ও সম্ভবনাগুলোকে গুরুত্বের সাথে দেখার মানসিকতা প্রস্তুত করে দেয়। রামাযানের এই একটি প্রশিক্ষণই একজন মানুষকে পূর্ণতা দানের জন্য যথেষ্ট।

১২. অন্যায়, অকল্যাণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ : ছিয়ামের মধ্যে রয়েছে ব্যক্তিজীবনকে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পাপ থেকে থেকে মুক্ত করে আত্মশুদ্ধির মহাইঙ্গিত। ঘুষ, জুয়া, চোরাকারবারী, মুনাফাখোরী, প্রতারণা, জালিয়াতিতে সমাজ আজ সয়লাব। সামান্য স্বার্থে মানুষ একে অপরের জানি দুশমন হয়ে পড়ছে। তুচ্ছ কারণে খুন-খারাবী, মিথ্যাচার, অপপ্রচার ইত্যাদি সমাজ জীবনের একটি অপরিহার্য অঙ্গে যেন পরিণত হয়েছে। মানবাধিকার, আধুনিকতার চূড়ান্ত সীমানায় উত্তরণের দাবীদার হয়েও অর্থনৈতিকভাবে উন্নত রাষ্ট্রগুলো গরীব রাষ্ট্রগুলোর উপর লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে বিধ্বংসী খেলায় মেতে উঠছে। এই সর্বগ্রাসী লোভ আর সমাজবিরোধী চিন্তা-চেতনার বিরুদ্ধে সামগ্রিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রশিক্ষণ দেয় রামাযান মাস। এমনকি হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, কেউ যদি ছিয়াম পালনকারীর উপর অন্যায়ভাবে মৌখিক বা শারীরিক আক্রমণ করে বসে তখনও পাল্টা আক্রমণের নির্দেশ না দিয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তুমি বরং বল, আমি ছায়েম' *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৫৯)*। অর্থাৎ আমি ছিয়াম রেখেছি। অতএব আমার উপর তোমার আক্রমণ করা যেমন শোভা পায় না, তেমনি আমারও শোভা পায় না তোমার উপর আক্রমণ করা। এভাবে শত্রু-মিত্র উভয়পক্ষের দিক থেকেই সম্ভাব্য অন্যায়, অবিচারের সমস্ত পথরোধের বাস্তবসম্মত অনন্য সাধারণ প্রশিক্ষণ প্রদান- এ কেবল রামাযান মাসের পক্ষেই সম্ভব। রাসূল (ছাঃ) যথার্থই বলেছেন, الصيام جنة। 'ছিয়াম হল (কুস্বভাব, অনাচারের বিরুদ্ধে) ঢালস্বরূপ' *(মুত্তাফাক আলাইহ, ঐ)*।

১৩. অসৎকাজ থেকে দূরে থাকা : কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য ইত্যাদি সকল প্রকার তাড়না থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করাই ছিয়ামের শিক্ষা। ভিতর-বাহির সমভাবে পাপমুক্ত করার মধ্য দিয়েই ছিয়ামের পূর্ণ বিকাশ লাভ করে। পাপপ্রবণতার বিরুদ্ধে মানুষের ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা সৃষ্টির জন্য রামাযান যে বিজ্ঞানসম্মত প্রশিক্ষণ দান করে তা ছায়েম ব্যক্তিকে পশুপ্রবৃত্তির দিকে অগ্রসর হওয়া থেকে সুদৃঢ় ঢালের মত রক্ষা করে। একজন ছবরকারী, প্রতিরোধকারী হিসাবে স্বীয় আত্মাকে তখন সে এমন স্তরে উন্নীত করতে সক্ষম হয় যার মাধ্যমে সে স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় এক অবস্থানে পৌঁছে যায়। তার বিবেকশক্তি হয়ে উঠে শাণিত ও প্রবল। ফলে পার্থিব জীবনের ক্ষণস্থায়ী স্থূল সুখচিন্তার কবর রচনা করে চিরস্থায়ী পারলৌকিক জীবনের প্রস্তুতি গ্রহণে সে উন্মুখ হয়ে ওঠে। জাহান্নামের আগুন থেকে আত্মরক্ষা করে জান্নাতের চিরন্তন প্রশান্তিময় আবাসস্থলে স্থান করে নেওয়ার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। জান্নাতের দরজায় দাড়িয়ে সেই আহ্বানকারীর হৃদয়স্পর্শী আহ্বান তার প্রাণে জাগায় ব্যাগ্র অনুভূতি - يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر 'হে কল্যাণের অভিযাত্রী! অগ্রসর হও!! হে অকল্যাণের অভিসারী! ক্ষান্ত হও'। মানবের অন্তরের কৃষ্ণ কুৎসিত সবকিছুকে আগুনে পুড়িয়ে দিয়ে তাতে হেদায়াতের নূর প্রজ্জ্বলন করানোর জন্যই রামাযানের আগমন। তাই রামাযান মাস পাওয়া সত্ত্বেও যারা এ মাসের এই অসাধারণ প্রভাব থেকে বঞ্চিত হল তাদের উদ্দেশ্যে কঠোর ভর্ৎসনাবাণী উচ্চারণ করে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি বাজে কথা বা বাজে আমল ছাড়তে পারল না, তার জন্য আল্লাহ্র প্রয়োজন নেই যে সে পানাহার থেকে বিরত থাকুক' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৯৯৯)*। রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, 'কত ছিয়াম পালনকারী এরূপ রয়েছে যার ছিয়াম দ্বারা ক্ষুধা ব্যতীত আর কিছুই লাভ হয় না এবং কত রাত্রি জাগরণকারী রয়েছে যার কিয়াম কেবল রাত্রি জাগরণ ছাড়া কিছুই হয় না' *(আহমাদ, হাকেম, দারেমী, মিশকাত হা/২০১৪)*।

পরিশেষে বলব বছরের শ্রেষ্ঠ দিন যেমন আরাফার দিন, সপ্তাহের শ্রেষ্ঠ দিন যেমন জুম'আর দিন, বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ রাত্রি যেমন লাইলাতুল ক্বদর, তেমনই বছরের সর্বোত্তম মাস হল রামাযান মাস। তাক্বওয়া, তওবা ও তিলাওয়াতের এই মাস আমাদের জন্য মেহমান স্বরূপ। যদি আমরা সঠিকভাবে এ মাসের মেহমানদারী করে থাকি, তবে সত্যি সত্যিই তা প্রশিক্ষণের মাস হিসাবে স্বার্থক হয়ে উঠবে। এ মাস আমাদের জন্য ত্রিশদিনের একটি এলাহী শিক্ষাকেন্দ্র। একটি আধ্যাত্মিক মহাবিদ্যালয়। এ মাস অপ্রকাশ্য শত্রুদের বিরুদ্ধে এক প্রবল জিহাদের ময়দান। এ মাস কল্যাণ ও পুণ্যের এক দিগন্তহীন বিশাল সমুদ্র। যার যত খুশি মণি-মুক্তা কুড়ানোর অফুরন্ত সুযোগ। ঈদুল ফিতর সেই সমুদ্রের বেলাভূমি। শাওয়ালের চাঁদ উঠার মাধ্যমে বার্ষিক প্রশিক্ষণপর্ব শেষে জান্নাতী সওগাত নিয়ে আবার যেন আমরা স্থলের জীবনে ফিরে আসি। প্রশিক্ষণার্থীদের যারা যত উত্তম সম্বল অর্জনে সক্ষম হয়েছে এ মাসে, তারা পরবর্তী এগারো মাস তার যথার্থ বাস্তবায়নে অগ্রগামীদের কাতারভুক্ত হবে। আর যারা বঞ্চিত হয়েছে তারা এই মহাসুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ব্যর্থ হবে। মূলত ইসলাম মানুষের কাছ থেকে যা কিছু কামনা করে তা বাস্তবায়নের পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা অর্জন করানোর জন্যই রামাযানের এই দীর্ঘ প্রশিক্ষণ। আর এই প্রশিক্ষণকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কার্যকর রাখার মাঝেই মানুষের সফলতা-ব্যর্থতা নিহিত। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে এই মাসের দীর্ঘ প্রশিক্ষণে অর্জিত শিক্ষাকে পরবর্তী ১১টি মাসে বাস্তবায়ন করার তাওফীক দান করুন- আমীন!!

সমাজে প্রচলিত শিরকসমূহ : একটি পর্যালোচনা

নূরজাহান বিনতে আব্দুল মজীদ

মহান আল্লাহ তাঁরই ইবাদতের জন্য মানুষকে সৃষ্টি করেছেন *(যারিয়াত ৫৬)* এবং তাদের হেদায়াতের জন্য ১ লক্ষ ২৪ হাজার নবী ও রাসূলকে প্রেরণ করেছেন। নাযিল করেছেন কিতাবসমূহ, যাতে মানবজাতি তাঁর স্পষ্ট পরিচয় লাভ করে তাঁর ইবাদত করে এবং সমস্ত প্রার্থনা নিবেদন যেন তাঁরই নিকটে হয়। কেননা এসবের বিপরীত কর্মকাণ্ড ও বিশ্বাসই শিরক তথা তাঁর সঙ্গে অংশীদার সাব্যস্ত করা।

আল্লাহ্র জাত বা সত্তা, তাঁর নাম ও গুণাবলী সমূহ এবং তাঁর ইবাদতে অন্য কাউকে শরীক সাব্যস্ত করাই হচ্ছে শিরক।

শিরক হল ক্ষমার অযোগ্য জঘন্যতম গোনাহ। এ শিরক মিশ্রিত যেকোন আমল ইসলামের দৃষ্টিতে মূল্যহীন এবং আল্লাহ্র নিকটে তা প্রত্যাখ্যাত। কেউ শিরক করে তওবা না করে মৃত্যুবরণ করলে এই শিরকই তার ঈমান ও জীবনের যাবতীয় সৎকর্মকে নিষ্ফল করে দেবে। এ ধরনের লোকদের ঈমান ও আমলের পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'বলুন, আমি তোমাদেরকে কি সংবাদ দেব নিজেদের আমলের ক্ষেত্রে কারা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত? তারা সেসব লোক দুনিয়ার জীবনে যাদের চেষ্টা-সাধনা ব্যর্থ হয়ে গেছে আর তারা নিজেরা মনে করছে যে, তারা সৎকর্ম করছে' *(কাহফ ১৮/১০৩-১০৪)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'আর আমি তাদের আমলের দিকে অগ্রসর হব, অতঃপর তা (তাওহীদ শূন্য হওয়ার কারণে) বিক্ষিপ্ত ধূলিকণার ন্যায় উড়িয়ে দিব' *(ফুরক্বান ২৫/২৩)*।

আল্লাহ্র তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্যই তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। এ পৃথিবীতে আগমনকারী প্রতিটি নবী বা রাসূল সর্বপ্রথম তাওহীদের দিকেই আহ্বান করেছেন এবং শিরক থেকে বেঁচে থাকার জন্য বারবার তাকিদ জানিয়েছিলেন *(নাহল ৩৬)*। তাওহীদের মর্মবাণী প্রচারের জন্য জীবনের সবচেয়ে বেশী সময় অতিবাহিত করেছেন নূহ (আঃ)। মুহাম্মাদ (ছাঃ)ও এজন্য অশেষ কষ্ট স্বীকার করেছেন। এ বিষয়টি এত গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও এ সম্পর্কে খুব কমই গুরুত্বারোপ করা হয়। এমনকি ইসলামের অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় এ বিষয়ে তেমন লেখালেখিও হয় না। ফলে তাওহীদ সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকার কারণে তাওহীদের পরিপন্থী বিষয় শিরক মুসলিম সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিস্তার লাভ করেছে। অথচ ভয়াবহ ও জঘন্যতম পাপ শিরক থেকে বেঁচে থাকা প্রতিটি মানুষের জন্য অবশ্য কর্তব্য। শিরকের ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, '(হে নবী!) কিন্তু তোমার কাছে আর তোমাদের পূর্ববর্তীদের কাছে ওহী করা হয়েছে যে, তুমি যদি (আল্লাহ্র) শরীক স্থির কর, তাহলে তোমার কর্ম অবশ্য অবশ্যই নিষ্ফল হয়ে যাবে। আর তুমি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(যুমার ৩৯/৬৫)*। পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াতে শিরকের ভয়াবহতা সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে *(বাক্বারাহ, ২/২২; নিসা /১১৬; মায়েদাহ ৫/৭২; আন'আম ৬/৮৮)*।

এ কারণে বান্দার ওপর সর্বপ্রথম অপরিহার্য বিষয় ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল তাওহীদ সম্পর্কে বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জন করা। নিজের ঈমান, আক্বীদা ও যাবতীয় আমল শিরক মুক্ত রাখা। শিরক নামের মহা অপরাধ সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান রাখা। অন্যথা যেকোন সময় শয়তানের খপ্পরে পড়ে যে কারো ঈমান ও জীবনের সৎকর্মের যাবতীয় সাধনা ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। এহেন পরিণতির হাত থেকে যেমন নিজেকে রক্ষা করা আবশ্যক, তেমনি এথেকে অন্য সকল মুসলমানকেও রক্ষা করা যরূরী। নিম্নে আমাদের বাস্তব জীবনে ও সমাজে প্রচলিত নানা ধরনের শিরক সম্পর্কে আলোচনা করা হ'ল :

সমাজে প্রচলিত কতিপয় শিরক :

আমাদের দেশের গ্রাম-গঞ্জে ও শহর-বন্দরে কতিপয় শিরক, বিদ'আত ও নানাবিধ কুসংস্কার ব্যাপকভাবে প্রচলিত। কুসংস্কারজনিত এমন শিরক রয়েছে যা এসব দেশের লোকজন ধর্মীয় বিধান বা নিয়ম মনে করেই পালন করে থাকে। যেমন-

১. **আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ক্ষমতায় বিশ্বাস করা :** আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর জগতের উপর কর্তৃত্ব রয়েছে বলে বিশ্বাস করা। যদি কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সম্পর্কে এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, সে অলৌকিক শক্তির অধিকারী এবং অলৌকিকভাবেই কোন ঘটনা সংঘটিত করতে, বিপদগ্রস্তকে বিপদমুক্ত করা, আশ্রয়হীনকে আশ্রয় দান, সন্তানহীনকে সন্তান দিতে পারে, তাহলে সে মুশরিক বলে গণ্য হবে।

২. **জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত :** জ্যোতির্বিদ্যা হল সৌরজগতের বিভিন্ন অবস্থা পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন ঘটনা সংঘটিত হওয়ার কারণ বর্ণনা করা। জ্যোতির্বিদরা বলে থাকেন যে, অমুক নক্ষত্রের অমুক স্থানে অবস্থানের সময়ে যে ব্যক্তি বিবাহ করবে তার অমুক অমুক জিনিস অর্জিত হবে। যে ব্যক্তি অমুক নক্ষত্রের অমুক জায়গায় অবস্থানের ক্ষণে সফরে থাকবে সে ভাগ্যবান কিংবা ভাগ্যহীন হবে। বর্তমানে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এ ধরনের অর্থহীন-আজগুবি খবরাখবর পরিবেশন করা হয়। আর এগুলোর আশে-পাশে বিক্ষিপ্ত তারকারাজি, সরলরেখা, বক্ররেখা ইত্যাদি ধরনের আঁকা-বাঁকা রেখা অংকিত থাকে। মূর্খ ও দুর্বল ঈমানের কোন কোন মানুষ বিভিন্ন সময় জ্যোতিষীদের নিকট গমন করে থাকে এবং তাদেরকে স্বীয় ভবিষ্যৎ ও বিবাহ-শাদী ইত্যাদি সম্পর্কেও প্রশ্ন করে থাকে।

৩. **যাদু-টোনা, বাণ মারা বা বধ করা :** আমাদের সমাজে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে যদি কারো সাথে কারো শত্রুতা সৃষ্টি হয় এবং এ দু'পক্ষের কোন এক পক্ষ যদি দুর্বল হয়, তবে দুর্বল পক্ষ সাধারণত বিভিন্ন জিন সাধকের মাধ্যমে যাদুর আশ্রয় গ্রহণ করে সবল পক্ষকে বাণ মারে বা বধ করে। আবার অনেক ক্ষেত্রে সবল পক্ষও দুর্বল পক্ষকে সমূলে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে যাদুর আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। এভাবেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অধিকতর ভালবাসা সৃষ্টি, কারো সাথে শত্রুতা সৃষ্টি, কারো বিবাহ হতে না দেয়া, কারও প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি, কাউকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে চলে যাদুর খেলা। আবার এ সকল যাদুকে নিষ্ক্রিয় করতে পুনরায় আশ্রয় গ্রহণ করা হয় যাদুমন্ত্রের। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট তথা জিন, পীর, ওলী-আওলিয়া, এমনকি হিন্দুদের দেব-দেবী প্রভৃতির নিকটেও আশ্রয় প্রার্থনা করা, নির্দিষ্ট দিনে লাল বা কালো মোরগ জিন বা ভূতের নামে রোগীকে যবহ করতে বলা কিংবা মিষ্টি ও ফলমূল গায়রুল্লাহ্র নামে এমনকি হিন্দুদের মন্দিরে অবস্থিত দেব-দেবীকেও মানত করা।

৪. **রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে ধাতব আংটি ও বালা পরিধান করা :** রাজধানী সহ বিভিন্ন শহরের ফুটপাতে এবং বড় বড় পাইকারী বাজারে

এমন কিছু ব্যবসায়ের দোকান পাওয়া যায়, যারা ধাতব নির্মিত আংটি ও বালা বিক্রি করে থাকে। অনেক লোকদেরকে তা বাত রোগ নিরাময়, যে কোন উদ্দেশ্য সফল হওয়া, শনি ও মঙ্গল গ্রহের কুদৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষা ইত্যাদির জন্য করে আংগুলে ও হাতে ব্যবহার করতে দেখা যায়। আল্লাহ্র ইচ্ছার বাইরে কোন বস্তুই নিজস্ব গুণে কোন রোগের ক্ষেত্রে উপকারী বা অপকারী হতে পারে না। এতে রোগীর অন্তরে ধাতব বস্তুর প্রতি উপকারী হওয়ার ধারণার সৃষ্টি হয় এবং রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে আল্লাহ্র পরিবর্তে বস্তুর উপর ভরসা করা হয়। তাই কোন বস্তুকে কোন ক্ষেত্রে উপকারী বা অপকারী ধারণা করে ব্যবহার করা।

৫. **তা'বীয ব্যবহার করা :** জিনের অশুভ দৃষ্টি এবং বিভিন্ন রোগের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য সাধারণ মুসলিমদের মাঝে তা'বীয ব্যবহার একটা সাধারণ রীতিতে পরিণত হয়েছে। অথচ সকল ধরনের তা'বীয ব্যবহার করা শিরক।

৬. **কবর ও মাযারের সম্মান করা :** মাযার স্পর্শ করা, শরীর মাসেহ করা বা চুমু খাওয়া, কবরের মাটি বরকতের নিয়তে নিয়ে তা'বীযে করে গলায় বাঁধা, গায়ে মালিশ করা, রওযা শরীফ, মাযার বা কবর ইত্যাদির ছবি বরকতের জন্যে রাখা, চুমু খাওয়া, সম্মান করা। বিপদাপদ, বালা-মুছীবাত থেকে বাঁচার জন্য ঘর-বাড়িতে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে বরকতের জন্য দোকান, অফিস, হোটেলে ছবি রেখে আদবের সাথে দাঁড়িয়ে এগুলো করা। মাযারকে মাঝে মাঝে মহা ধুমধামের সাথে ধোয়া হয়। আর এ কবরধোয়া পানি বোতলে করে নিয়ে যাওয়া এবং নেক মাকসূদ পূরণের নিয়তে পান করা।

৭. **মাযারে গিলাফের তা'যীম :** বিভিন্ন পীর, ওলী-আওলিয়া, বুযুর্গানে দ্বীনের মাযারে বা কবরের ওপরে আজকাল গিলাফ পরানো হয়। অজ্ঞ, অশিক্ষিত মানুষ অনেক ক্ষেত্রে এসব গিলাফে চুমু খায়, গিলাফ ধরে ফরিয়াদ জানায়, আদবের সাথে মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, এ গিলাফের সুতা তা'বীযে ভরে গলায় বাঁধে। এমনকি অনেকেই আরো একধাপ এগিয়ে গিলাফের কাছেই দো'আ চেয়ে বসে।

৮. **ওরশ :** অনেক মাযারে ও পীরের দরবারে অমাবস্যা, পূর্ণিমা, পীরের জন্ম বা মৃত্যু তারিখ নির্দিষ্ট করে ওরশ হয়ে থাকে। বিজলী বাতি, গেট, চকমকি কাগজ ইত্যাদি দিয়ে প্যান্ডেল, স্টেজ সাজানো হয়। বেপর্দা অবস্থায় নারী-পুরুষ একত্রে বসে যিকির করে, কাওয়ালী-সামা শোনে। ভণ্ড পীর, ফকীররা এ সব ওরশে ওয়ায নছীহতের নামে শরী'আত বিরোধী আক্বীদা-বিশ্বাস প্রচার করে। শাহী তবারক রান্না করা হয়। ওরশের পরে যে টাকা অবশিষ্ট থেকে যায়, তা পীর ও তার খাদেমদের পকেটে চলে যায়। ওরশ মূলত আনন্দোৎসব ও বিনা পুঁজিতে টাকা উপার্জনের পন্থা হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

৯. **খাজা বাবার ডেগ :** একদল লোক বিশেষত যুবকেরা রজব মাস এলেই পথে-ঘাটে, বাজারে যেখানেই সুযোগ পায় সেখানেই একটা ডেগ বা বড় হাড়ি বসায়। লালসালু কাপড় বিছিয়ে, বাঁশ দিয়ে ছাউনি দিয়ে, বিজলী বাতি জ্বালিয়ে, চকমকি কাগজ এবং বিভিন্ন ধরনের রং লাগিয়ে ঘর সাজিয়ে তার মধ্যে স্থাপন করে ডেগ। তারা একে বলে 'খাজা বাবার ডেগ'।

১০. **প্রতিকৃতি, মূর্তি ও ভাস্কর্য ইত্যাদির হুকুম :** কোন নেতা বা স্মরণীয়-বরণীয় ব্যক্তিবর্গের ছবি, চিত্র, প্রতিকৃতি, মূর্তি ও ভাস্কর্য ইত্যাদি তৈরি করা, মাঠে-ঘাটে, অফিস-আদালতে ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এগুলো স্থাপন করা, এগুলোকে সম্মান করা, এগুলোর উদ্দেশ্যে পুষ্পস্তবক অর্পণ ইত্যাদি করা।

১১. **স্মৃতিস্তম্ভ ও শহীদ মিনার :** সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের স্মরণে সমাধি, স্মৃতিস্তম্ভ, স্মৃতিসৌধ বা শহীদ মিনার নির্মাণ, এগুলোকে সম্মান জানানো, সামনে দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা ইত্যাদি।

১২. **অগ্নিপূজা, শিখা চিরন্তন ও শিখা অনির্বাণ :** 'অগ্নি শিখা' অগ্নিপূজকদের উপাস্য দেবতা। তারা বিভিন্নভাবে আগুনের পূজা করে থাকে। এ অগ্নিপূজা সম্পূর্ণ শিরক ও আল্লাহদ্রোহী কাজ। 'শিখা চিরন্তন' বা 'শিখা অনির্বাণের' নামে অগ্নি মশালকে সারা দেশে ঘুরিয়ে ভক্তি শ্রদ্ধা জানানো এবং এগুলোর প্রজ্জ্বলনকে অব্যাহত রাখার জন্য বিশেষ ধরনের বেদীর ওপর এগুলো স্থাপন করা এবং অলিম্পিক মশাল সহ বিভিন্ন ক্রীড়ানুষ্ঠানের মশাল প্রজ্জ্বলনও শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

১৩. **মঙ্গল প্রদীপ :** হিন্দুদের অনুকরণে কোন অনুষ্ঠানের শুরুতে বা কোন প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন উপলক্ষে মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে বিশেষ আনুষ্ঠানিকতা পালন করা।

১৪. **তাছাওউফের শায়খ বা পীরের কল্পনা :** তাছাওউফের শায়খ বা পীরের চেহারা, আকৃতি ইত্যাদি কল্পনা করে মোরাকাবা, ধ্যান, যিকির বা অন্য যে কোন ইবাদত করা শিরক।

১৫. **পীরকে ডাকা ও তার জন্য ঘর সাজিয়ে রাখা :** অনেকে স্বীয় পীর বা কোন বুযুর্গ ব্যক্তিকে বহুদূর হতে ডাকে এবং মনে করে যে, তিনি এটা জানতে ও শুনতে পারছেন। অনেক সময় 'ইয়া গাওছুল আযম', 'ইয়া খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী' ইত্যাদি বলে ডাকতে থাকে এবং নিজেদের ফরিয়াদ পেশ করতে থাকে। কিছু সংখ্যক পীরের অনুসারীরা তাদের বাড়ির মধ্যে একটি ঘর পীরের জন্য সারা বছর সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখে। একটা বড় খাটের ওপর চাদর বিছিয়ে বড় বড় কয়েকটা কোল বালিশ সেট করে 'বিশেষ আসন' তৈরি করা হয়। পীরের ছবিকে মালা পরিয়ে সযত্নে ঐ ঘরে টাঙ্গিয়ে রাখা হয়। ফুল ও জরি দিয়ে ঘরটি সুন্দর করে সাজানো হয়। সারা বছর ঐ ঘরে কাউকে ঢুকতে দেয়া হয় না। মাঝে মাঝে মুরীদরা ঐ ঘরে ঢুকে ছবি ও আসনের সামনে আদবের সাথে চুপ করে বসে থাকে।

১৬. **পীরের বাড়ি বা আস্তানার খাদেম ও জীবজন্তুর প্রতি সম্মান :** অনেককে দেখা যায়, পীরের বা মাযারের খাদেম, গরু, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদিকে দেখামাত্র দাঁড়িয়ে যায়। এগুলোর সামনে মূর্তির ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকে। অনেকে আবার এসব গরু, কুকুর, বিড়ালের পা ধরে বসে থাকে নেক মাকছুদ পূরণের জন্য। খানজাহান আলীর মাযারের পুকুরে কুমীর আছে, চট্টগ্রামে কথিত বায়েজীদ বোস্তামীর মাযারে কচ্ছপ আছে। আবার কোন কোন জায়গায় গজার মাছ, জালালী কবুতর ইত্যাদি পীর-ওলীদের স্মৃতি বহন করছে বলে মানুষের বিশ্বাস। অজ্ঞ অশিক্ষিত মানুষেরা মাযারের ব্যবসায়ী খাদেমদের খপ্পরে পড়ে এ সব কচ্ছপ, গজার মাছ, কুমীর, জালালী কবুতর ইত্যাদিকে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন মনে করে এবং এদের জন্য বিভিন্ন খাদ্যবস্তু পূজাস্বরূপ নিয়ে যায় ও এদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে।

১৭. **পীর, ওলী-আওলিয়াদের কবরের মাটি ও সেখানে প্রজ্জ্বলিত মোমবাতিকে বিভিন্ন রোগের জন্য উপকারী মনে করা :** এ ধরনের কর্ম আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে অহরহ পরিলক্ষিত হয়। তারা বিভিন্ন রোগের ক্ষেত্রে আওলিয়াদের কবরের মাটি ও সেখানে জ্বালানো মোমবাতি অনেক উপকারী মহৌষধ মনে করে অত্যন্ত যত্নের সাথে তা ব্যবহার করে থাকে এবং এর দ্বারা কোন রোগ মুক্তি হলে তা কবরস্থ ব্যক্তির দান বা তাঁর ফয়েয বলে মনে করে।

১৮. **গায়রুল্লাহর নামে যিকির বা অযীফা :** আল্লাহ্র যিকিরের ন্যায় কোন নবী বা রাসূল, পীর, ওলী-আওলিয়া, বুযুর্গ, আলিমের নাম জপ করা, বিপদে পড়লে তাদের নামের অযীফা পড়া। যেমন- 'ইয়া

রাহমাতুল্লিল আলামীন', 'ইয়া রাসূলাল্লাহ', 'নূরে রাসূল, নূরে খোদা', 'হক বাবা, হক বাবা' ইত্যাদি।

১৯. **কামেল পীরের গোনাহ নেই :** খোদা পাক, কামেল পীরও পাক। তাদের কোন গোনাহ নেই। তারা নিষ্পাপ। এ ধরনের কথা বলা ও বিশ্বাস করা।

২০. **পীরের পায়ে সিজদা করা বা কদমবুসি করা :** সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে পীরের পায়ে সিজদা করা বা নেক মাকছূদ পূরণের জন্য, রোগমুক্তির নিয়তে পীরের পা চাটা, পায়ে চুমু খাওয়া, দাড়ি চাটা, দাড়িতে চুমু খাওয়া, ব্যবহার্য থালাবাটি বা অন্য কোন বস্তু চাটা বা চুমু খাওয়া, মাযারে চুমু খাওয়া।

২১. **আল্লাহ্র সত্তার সাথে মিশে যাওয়া :** অনেকের ধারণা মুরীদ যখন 'ফানাফিল্লাহ' পর্যায়ে পৌঁছে, তখন সে আল্লাহ্র সত্তার সাথে মিশে বিলীন হয়ে যায় এবং তাঁর পৃথক কোন অস্তিত্ব থাকে না। খাওয়া, ঘুম, স্ত্রী সহবাস সহ যাবতীয় কাজকর্ম তখন আর নিজস্ব থাকে না। এগুলো সব আল্লাহ্র হয়ে যায় অর্থাৎ এসব কাজ আল্লাহ নিজেই করেন *(নাঊযুবিল্লাহ)*।

২২. **আল্লাহ যা করান, তাই করি :** একদল ফকীর বলে, আল্লাহ যা করান, তা-ই করি। আল্লাহ ছালাত আদায় করান না, তাই আদায় করি না, আল্লাহ গাঁজা টানাচ্ছেন, তাই টানি। তাক্বদীরে ছালাত থাকলে তো আদায় করব।

২৩. **দিলে দিলে ছালাত পড়ি :** অনেক পীর ছালাত, ছওমের ধার ধারে না; কিন্তু খুব সাধনা করে। দু'তিন দিন পর পর একটু খায়। কম কথা বলে। লোকজনের সাথে কম মিশে। দিনের বেশিরভাগ সময় চুপ করে ধ্যান-মগ্ন অবস্থায় বসে থাকে। এরা বলে, আমরা দিলে দিলে ছালাত পড়ি। তোমরা মাত্র ৫ ওয়াক্ত পড়, আর আমরা সারা দিন-রাতই ছালাত পড়ি।

২৪. **সীনায় সীনায় মা'রেফতী :** পীর বা দরবেশ দাবীদার একদল লোক বলে থাকে, 'কুরআন শরীফ মোট ৪০ পারা। ৩০ পারায় যাহেরী ইলমের বিষয় আছে। বাকি ১০ পারা মা'রেফতী বিদ্যায় ভরাপুর। এ ১০ পারা আমরা সীনায় সীনায় পেয়েছি। শরী'আতের আলেমরা এগুলোর খবর রাখেন না।

২৫. **শরী'আতের ইত্তেবা সর্বাবস্থায় ফরয নয় :** অনেকের ধারণা, মুরীদ যখন মা'রেফাতের উচ্চ শিখরে পৌঁছে যায়, তখন তার জন্য শরী'আতের হুকুম-আহকাম, ছালাত, ছওম ইত্যাদি মাফ হয়ে যায়।

২৬. **শিরকের গন্ধযুক্ত নাম ও উপাধি :** যে সকল নাম বা সম্বোধনে শিরকের সংস্পর্শ পাওয়া যায়, সেগুলোকে ইসলাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। জাহেলী যুগে মানুষ নিজের সন্তান-সন্ততির নাম সূর্য, চন্দ্র ইত্যাদির নামের সাথে সম্পৃক্ত করে রাখত। যেমন- আবদে শামস্ বা সূর্যের গোলাম, আবদে মানাফ বা মানাফের গোলাম ইত্যাদি। সন্তানের নামকরণে নবী ও পীর-আওলিয়ার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা। যেমন- গোলাম মুছত্বফা (মুছত্বফার গোলাম), আব্দুন্নবী (নবীর দাস), আব্দুর রাসূল, আলী বখশ (আলী (রাঃ)-এর দান), হোসেন বখশ (হুসাইন (রাঃ)-এর দান), পীর বখশ (পীরের দান), মাদার[১] বখশ (মাদারের দান), গোলাম মহিউদ্দীন (পীর মহিউদ্দীনের গোলাম), আব্দুল হাসান (হাসানের গোলাম), আব্দুল হুসাইন (হুসাইনের গোলাম), গোলাম রাসূল (রাসূলের গোলাম), গোলাম সাকলায়েন ইত্যাদি নাম রাখা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ ধরনের নাম রাখতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। আবার পীর বা ওলীকে এমন কোন উপাধিতে সম্বোধন করা উচিত নয় যা অর্থগত দিক দিয়ে আল্লাহ তা'আলার জন্য প্রযোজ্য। যেমন- গাউছুল আযম (সর্বশ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী), গরীবে নেওয়াজ (গরীবরা যার মুখাপেক্ষী), মুশকিল কোশা (যার মাধ্যমে বিপদাপদ দূর হয়), কাইয়ূমে যামান (যামানা কায়েম করেছেন যিনি) ইত্যাদি।

২৭. **বিপদে পড়ে জিন, ফেরেশতা, পীর, ওলী-আওলিয়াদের ডাকা :** দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ মূর্খ, পীর ও মাযার পূজারী অনেক লোককে দেখা যায় বিপদে-আপদে, রোগে-শোকে আল্লাহ তা'আলাকে বাদ দিয়ে পীর, ওলী, জিন ও ফেরেশতাদের আহ্বান করতে থাকে। যেমন- 'ইয়া গাওছুল আযম বড় পীর আব্দুল কাদের জীলানী', 'ইয়া খাজা বাবা', 'ইয়া সুলতানুল আওলিয়া', 'হে পীর কেবলাজান', 'হে জিন', ... আমাকে রক্ষা করুন, আমাকে বিপদ হ'তে বাঁচান, আমার মাকছূদ পূরা করুন, সন্তান দিন ইত্যাদি। কোন কোন মূর্খলোক বালা মুছীবতের সময় বুযুর্গ লোকদের উদ্দেশ্যে দো'আ করে, ফরিয়াদ জানায়। এভাবে গাইরুল্লাহ্কে ডাকা এবং তাদের কাছে নিজের ফরিয়াদ পেশ করা, তা কাছ থেকে হোক আর দূর থেকেই হোক।

২৮. **পীর, ওলী-আওলীয়াদের স্মৃতিচিহ্নের তা'যীম করা এবং এদের কাছে সাহায্য চাওয়া :** অনেকে পীর, ওলী-আওলিয়াদের স্মৃতিচিহ্নকে এমন তা'যীম করে যে তা শিরকের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। পীর হয়তো কোন গাছের নীচে বসতেন, বিশ্রাম করতেন। পীরের মৃত্যুর পর মুরীদরা ঐ গাছ বা পাথরের গোড়ায় আগরবাতি, মোমবাতি, ধূপ ইত্যাদি জ্বালায়, মীলাদ পড়ায়, বিপদ মুক্তির জন্য ফরিয়াদ জানায়।

২৯. **মন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ভাগ্য পরিবর্তন :** সিলভা, কোয়ান্টাম বা অন্য কোন মেথডের (পদ্ধতি) দ্বারা মন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটানো এবং সকল সমস্যার সমাধান লাভ করার মাধ্যমে জীবনে সফলতা অর্জন করার কথা বলা।

৩০. **কপালে টাকা স্পর্শ করে তা সম্মান করা :** টাকা-পয়সা মানুষের সম্পদ। তা মানুষের জীবনের প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তাই টাকা-পয়সা মানুষের খাদেম। কিন্তু মানুষ টাকার খাদেম বা গোলাম নয়। সম্পদের সম্মান হচ্ছে তাকে সংরক্ষণ করা, তাকে অবজ্ঞা ও তুচ্ছ জ্ঞান না করা, পায়ের নিচে ফেলে দলিত-মথিত না করা। কিন্তু যে মাথা ও কপাল ঠেকিয়ে আল্লাহ্র ইবাদত করা হয় এবং তাঁকে সম্মান জানানো হয়, সেই কপালে টাকা স্পর্শ করে টাকাকে সম্মান করা টাকাকে পূজা করারই শামিল। এ কাজটি অনেক মুসলিম ব্যবসায়ীদের মাঝে পরিলক্ষিত হয়। দোকান খোলার পর প্রথম বিক্রি হলেই তারা এ কাজটি করে থাকে।[২]

৩১. **গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাব :** অনেকের ধারণা মানুষের ভাল-মন্দ, বিপদ-আপদ, উন্নতি-অবনতি ইত্যাদি গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবে হয়। কেউ বিপদে পড়লে বলা হয়, 'এ ব্যক্তির ওপর শনি গ্রহের প্রভাব পড়েছে'। কারো আনন্দের খবরে বলা হয়, 'এ ব্যক্তি মঙ্গল গ্রহের সুনজরে আছে'।

১. 'মাদার'-কে বাংলাদেশের কিছু অঞ্চলের হিন্দুরা বড় ঋষি বলে জানে।

২. ড. মুযযাম্মিল আলী, শিরক কী ও কেন (ঢাকা : তাওহীদ পাবলিকেশন্স), পৃ. ৩৫০।

৩২. **চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের প্রভাব :** অনেকের ধারণা চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ মানুষের ভাল-মন্দ, জন্ম-মৃত্যু, বিপদ-আপদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে।

৩৩. **কোন মাস বা সময়কে ভাল বা খারাপ জানা :** আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ সময় ও দিনক্ষণের ভালমন্দে বিশ্বাসী। মুহাররম, কার্তিক প্রভৃতি মাসে বিয়ে-শাদী করা উচিত নয়, রবি ও বৃহস্পতিবারে বাঁশ কাটা যায় না[৩], সোম ও বুধবারে গোলা হতে ধান বের করা যায় না, শুক্র ও রবিবারে পশ্চিম দিকে যাত্রা করলে ক্ষতি হবে, শনি ও মঙ্গলবারে বিয়ে করা ও ঝাড়ু বাঁধা উচিত নয়, রাতের বেলা ঝাড়ু দিলে আয়-উন্নতি হয় না, রাতে আয়না দেখলে কঠিন পীড়া হয়, রাতে নখ কাটা ঠিক নয়, নতুন বউকে ভাদ্র মাসে শ্বশুর বাড়ীতে রাখা হয় না (কারণ নতুন বছরের পা ভাদ্র মাসে শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর জন্য দেখা অকল্যাণকর), ভাদ্র ও পৌষ মাসে মেয়ে লোকের সওয়ারী পাঠানো যায় না, আশ্বিন মাসের শেষ দিন মুটে বানিয়ে গরুকে গা ধৌত করা ও 'গো ফাল্গুন' বলে মান্য করা ইত্যাদি।

৩৪. **নবজাতকের জন্য :** নবজাতকের হাতে চামড়ার চিকন তার, তাগা বা গাছ বা এ ধরনের অন্য কোন কিছু চুড়ির মতো করে বেঁধে দেয়া হয় যাতে কোন অশুভ রোগ-বালাই বা বদ জিন-ভূত স্পর্শ করতে না পারে। আবার নবজাতককে জিনের অশুভ দৃষ্টি থেকে রক্ষার জন্য বাচ্চার কান ছিদ্র করা, বাচ্চার বালিশের নিচে জুতার টুকরা রাখা অথবা শিশুর মাথার চুল না কাটা। চোখ লাগা থেকে শিশুকে রক্ষার জন্য তার গলায় মাছের হাড়, শামুক ইত্যাদি ঝুলিয়ে রাখা, কপালে কালো টিপ বা দাগ দেয়া।

৩৫. গায়রুল্লাহ্‌র নামে কসম করা : আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহ্‌র নামে কসম করল, সে কুফরী করল অথবা শিরক করল'।[৪] মূলত আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন নামে কসম করলে কসম হয় না। যেমন- রাসূলুল্লাহ্‌র কসম, কা'বা শরীফের কসম, নিজ চোখের কসম, বিদ্যা বা বই-এর কসম ইত্যাদি।

৩৬. **পীর, ওলী বা বুযুর্গ ব্যক্তির অসীলা গ্রহণ :** আল্লাহকে পাওয়ার জন্য, তাঁর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের লক্ষ্যে, ক্ষমা ও সাহায্য পাওয়ার আশায় কোন জীবিত বা মৃত পীর, ওলী বা বুযুর্গ ব্যক্তিকে অসীলা বা মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা।

৩৭. শুভ-অশুভ আলামত : বাহ্যিক দৃষ্টিতে কোন বস্তু, স্থান, শব্দ বা সংকেতকে পসন্দ করা বা না করা মানুষের মানবীয় স্বভাব। এটা দোষের কিছু নয়। তবে ভালকে নিশ্চিতভাবে ভাল এবং মন্দকে অকল্যাণকর বলে জানতে হলে শরী'আতের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রয়োজন। তাওহীদের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে শুভ-অশুভ আলামতে বিশ্বাস করা স্পষ্টভাবে শিরকের পর্যায়ভুক্ত করা যায়। ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ দ্বারা এ বিধানটি আরও দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হয়। এ হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'অশুভ বা অযাত্রা বিশ্বাস করা বা নির্ণয়ের চেষ্টা করা শিরক, কথাটি তিনবার বলেন'।[৫]

পাখি ও প্রাণীর চলাচলের গতিপথকে প্রাক-ইসলামী যুগে আরবের লোকেরা সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের আলামত বলে গণ্য করত এবং তাদের জীবনের পরিকল্পনা গ্রহণের প্রক্রিয়া এ সব আলামতকে ঘিরেই কেন্দ্রীভূত ছিল। শুভ বা অশুভ আলামত নির্ধারণের এই চর্চাকে আরবীতে *তিয়ারা*[১] (উড়াল দেয়া) বলা হত। যেমন- কোথাও যাবার উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি যাত্রা শুরু করলে যদি একটি পাখি তার উপর দিয়ে উড়ে বামে চলে যেত, তাহলে সে ভাবত যে তার দুর্ভাগ্য অবশ্যম্ভাবী; ফলে সে পুনরায় ঘরে ফিরে যেত। ইসলাম এ ধরনের সকল কুপ্রথাকে বাতিল করেছে। সকল মুসলিমকে এ ধরনের বিশ্বাস হতে উদ্ভূত অনুভূতিকে পরিহার করতে বিশেষভাবে যত্নশীল হ'তে হবে। এ ক্ষেত্রে অজ্ঞাতসারে যদি কেউ কোন কাজে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে যা এ প্রকৃতির বিশ্বাসের সাথে সংশ্লিষ্ট, তাহ'লে অবশ্যই আল্লাহ্‌র নিকটে এর থেকে পরিত্রাণ চেয়ে নিম্নের দো'আ দ্বারা আকুল প্রার্থনা জ্ঞাপন করা উচিত : اَللّٰهُمَّ لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْـرُكَ وَلاَ طَيْـرَ إِلاَّ طَيْرُكَ وَلاَ إِلـهَ غَيْـرُكَ 'আল্লাহুম্মা লা খায়রা ইল্লা খায়রুকা ওয়া লা ত্বায়রা ইল্লা ত্বায়রুক ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা'। অর্থ : হে আল্লাহ্! আপনার কল্যাণ ব্যতীত কোন কল্যাণ নেই এবং আপনার দেয়া শুভাশুভ ব্যতীত কোন শুভ বা অশুভ নেই এবং আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই।[৬]

শুভ-অশুভ আলামত বিষয়ে বেশি রকমের বাড়াবাড়ি করা নিরর্থক। বৃহৎ শিরকের উৎসমূলে পরিণত হওয়ার আশংকায় ইসলাম এ ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্বারোপ করে। মূর্তি, মানুষ, তারা, সূর্য ইত্যাদি পূজার উৎপত্তি হঠাৎ করে হয়নি। এ ধরনের পৌত্তলিকতার চর্চা দীর্ঘকালব্যাপী ক্রমান্বয়ে বিকাশমান হয়েছে। বৃহৎ শিরকের শিকড় যত বিস্তার লাভ করে, আল্লাহ্‌র একত্বের প্রতি মানুষের বিশ্বাস ক্রমশ বিলুপ্ত হতে থাকে। এভাবে শয়তানের কুমন্ত্রণার বীজ অঙ্কুরিত হয়ে মুসলিমদের বিশ্বাসের ভিত্তিমূল ধ্বংস করার পূর্বেই তা সমূলে উৎখাত করতে হবে।

শিরক সম্পর্কে সর্বদা স্মর্তব্য হল :

১. জীবন বিপন্ন হলেও শিরক করা যাবে না, ২. শিরকের পাপের কোন ক্ষমা নেই, ৩. শিরকের পরিণতি ধ্বংস, ৪. শিরক সমস্ত নেক আমলকে নিষ্ফল করে দেয়, ৫. মুশরিকরা চিরস্থায়ী জাহান্নামী, ৬. মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নিষেধ, ৭. শিরক মিশ্রিত ঈমান কখনোই ঈমান হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়, ৮. শিরক অতি সন্তর্পনে আগমন করে।

সুতরাং শিরক থেকে বেঁচে থাকার জন্য সবসময় আল্লাহ তা'আলার নিকটে প্রাণখুলে দো'আ করা ও সাহায্য প্রার্থনা করা কর্তব্য। রাসূল (ছাঃ) শিরক হ'তে বাঁচার জন্য আমাদেরকে দো'আ শিখিয়েছেন : اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُبِكَ أَنْ نُشْرِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ نَعْلَمُ 'আল্লাহুম্মা ইন্না না'উযুবিকা আন নুশরিকা শাইআন না'লামুহু, ওয়া নাসতাগফিরুকা লিমা লা না'লামুহ।' অর্থ: হে আল্লাহ্, জেনে বুঝে শিরক করা থেকে আমরা আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং আমাদের অজ্ঞাত শিরক থেকে আপনার নিকটে ক্ষমা চাচ্ছি।[৭] আল্লাহ আমাদের সবাইকে ছোট-বড় সকল প্রকার শিরক হ'তে রক্ষা করুন, আমীন!

৩. এ ধরনের বিশ্বাসের ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের অনেক এলাকা যেখানে বাঁশের হাট রয়েছে, সেসব হাটগুলো সাধারণত রবিবার ও বৃহস্পতিবার ছাড়া অন্য দিনগুলোতে হয়।
৪. তিরমিযী, হা/১৫৩৫; মুসতাদরাক হাকিম, ১/১৮, সনদ ছহীহ ।
৫. তিরমিযী, ৪/১৬০; ইবনু হিব্বান, ১৩/৪৯১; হাকেম, আল-মুসতাদরাক, ১/৬৪; আবূ দাউদ, ৪/১৭।
৬. আহমাদ, ২/২২০; আলবানী, সিলসিলা ছহীহাহ, হা/১০৬৫; সনদ সহীহ।
৭. আহমাদ ও আত্ব-ত্বাবারানী, ছহীহ তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৩৬, সনদ হাসান।

আহলেহাদীছ আন্দোলন : বিদ‘আতীদের উত্থান যুগে

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

মানবতার মুক্তির নামে কিংবা ব্যক্তিগত ও দলগত স্বার্থ সিদ্ধির জন্য বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাছিলের উপায় হিসাবে পৃথিবীতে বহু দল ও মতবাদের উদ্ভব হয়েছে, যা ছিল কিতাব ও সুন্নাত বিরোধী। মূলত অহি-বিরোধী যত প্রকার বিধান, মাযহাব, মতবাদ, ইজম, থিওরী, ফর্মুলা রচিত হয়েছে সবই অনাসৃষ্টি ও ফেৎনা। এসব ফেৎনার মূলোৎপাটনে আত্মনিয়োগ করাই আহলেহাদীছ আন্দোলনের অন্যতম উদ্দেশ্য। আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাতকে সমুন্নত, বলবৎ ও সুপ্রতিষ্ঠিত করাই মুসলিম উম্মাহর জাতীয় জীবনের উন্নতি, অগ্রগতি, বিজয় ও প্রতিষ্ঠা বলে আহলেহাদীছরা মনে করে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-কে বাদ দিয়ে জাতীয় গৌরব প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা কেবল বিজাতীয় আবেগ ও অমুসলিম চেতনামাত্র। পক্ষান্তরে কুরআন ও হাদীছের কার্যত প্রতিষ্ঠা দ্বারা স্বাভাবিক ও অনিবার্যরূপে মুসলমানদের জাতীয় জীবন গৌরবমণ্ডিত হবেই। ইসলামকে সকল প্রকার বাধা-প্রতিবন্ধকতা ও পরাধীনতার কবল হতে মুক্ত করে তার শাশ্বত, সনাতন ও চিরন্তন আদর্শ ও বিধানকে যমীনের বুকে প্রতিষ্ঠিত করাই আহলেহাদীছদের রাজনীতি। এ আদর্শের জন্যই আহলেহাদীছদেরকে বেঁচে থাকতে হয়, জীবন ধারণ করতে হয়, জীবন উৎসর্গ করতে হয়, মরতে হয়। এ আদর্শের সংরক্ষণে সর্বপ্রকার অনৈসলামী প্রভাব হতে মুসলিম উম্মাহকে মুক্ত রাখতে আহলেহাদীছদেরকে জীবনপণ করতে হবে। আহলেহাদীছ আন্দোলনের আরেকটি প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে ব্যবহারিক বৈষম্যের ভিত্তিতে মুসলিম উম্মাহকে নানারূপ দলে বিভক্ত হতে না দিয়ে কিতাব ও সুন্নাতের মর্মমূলে সমগ্র মুসলিম জাতিকে একত্রিত করা। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে অতিভক্তি ও অতিবিদ্বেষের মহামারী জাতীয় জীবনে প্রবেশ করে। এর নিদারুণ ফল স্বরূপ তারা বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। অথচ আল্লাহ্র নির্দেশ ‘তোমরা সকলে মিলে আল্লাহ্র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর। দলে দলে বিভক্ত হয়ো না’ *(আলে ইমরান ১০৩)*। নবী করীম (ছাঃ)-এর ইন্তিকালের অব্যবহিত কাল পরেই মুসলমানরা আপোষে দলাদলি ও ফির্কাবন্দীতে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

মুসলমানদের মধ্যে দলবিভক্তি ও ফির্কাবন্দী সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে আহলেহাদীছ ও মুসলিম উভয় শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য এক ও অভিন্ন ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে রাজনৈতিক কারণে খারেজী ও শী‘আদের উদ্ভব ঘটলে এবং যুক্তিবাদের নামে মু‘তাযিলা ও মুরজিয়া ফেৎনা সৃষ্টি হলে মুসলিম উম্মাহ দু’টি প্রধান দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই বিভক্তির ভিত্তিমূল ছিল কুরআন ও হাদীছ। এক দল ছাহাবায়ে কেরামের প্রতি বিদ্বেষের ফলে রাসূলের হাদীছ পরিত্যাগ করে, এমনকি কুরআনের বিশুদ্ধতাও অস্বীকার করে। এই বিদ‘আতী ফির্কার বিপরীতে আরেকটি দল ছিল যারা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত ও নিরংকুশ অনুসারী ছিলেন। এরাই যুগে যুগে ‘আহলেহাদীছ’ বলে কথিত ও আখ্যায়িত হয়েছেন। হক্বপন্থী এ দল সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُوْنَ ‘আমার সৃষ্টির (মানুষের) মধ্যে একটি দল আছে, যারা হক্ব পথে চলে ও সেই অনুযায়ী ন্যায়বিচার করে’ *(আ‘রাফ ১৮১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও বলেছেন, لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِيْ ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ– ‘চিরদিন আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল হক্বের উপরে বিজয়ী থাকবে। পরিত্যাগকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না এমতাবস্থায় ক্বিয়ামত এসে যাবে, অথচ তারা ঐভাবে থাকবে’ *(মুসলিম হা/১৯২০, ‘ইমারত’ অধ্যায়; বুখারী, ফাৎহুল বারী, হা/৭১)*।

হিজরী ৩৭ সালের পরে মুসলিম জাহানের ৪র্থ খলীফা আলী (রাঃ) ও মু‘আবিয়া (রাঃ)-এর মধ্যকার রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের জের ধরে খারেজী, শী‘আ, মুরজিয়া, কাদরিয়া, জাবরিয়া, মু‘তাযিলা প্রভৃতি ধর্মীয় দলের উদ্ভবের সময় মুসলিম সমাজে ‘আহলুস সুন্নাহ’ ও ‘আহলুল বিদ‘আত’ নামক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত পৃথক দু’টি দলের অস্তিত্ব ছিল। যেমন প্রখ্যাত তাবেঈ মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (৩৩-১১০ হিঃ) বলেন,

لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم.

‘লোকেরা ইতিপূর্বে কখনও হাদীছের সনদ বা সূত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করত না। কিন্তু যখন ফেৎনার যুগ আসল, তখন তারা বলতে লাগল, আগে তোমরা বর্ণনাকারীদের পরিচয় বল। অতঃপর যদি দেখা যেত যে, বর্ণনাকারী ‘আহলুস সুন্নাত’ দলভুক্ত তাহলে তাঁদের বর্ণিত হাদীছ গ্রহণ করা হত। কিন্তু ‘আহলে বিদ‘আত’ হলে তার বর্ণিত হাদীছ গ্রহণ করা হত না’ *(মুকাদ্দামা মুসলিম, পৃঃ ১৫)*।

অতএব প্রতীয়মান হয় যে, হিজরী প্রথম শতকে মুসলিম সমাজে ‘আহলুস সুন্নাহ’ নামক একটি হাদীছপন্থী জামা‘আত ছিল। উল্লেখ্য যে, ৩৭ হিজরীর পূর্বে মুসলিম উম্মাহর আক্বীদা যেমন ছিল অভিন্ন,

তেমনি তাদের আমলের মধ্যে কোন বৈপরীত্য ছিল না। বরং তারা নিজের বা অপরের সকল প্রকার ‘রায়’ ও ‘কিয়াস’ হতে মুখ ফিরিয়ে কেবল কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করতেন। এজন্য তাঁরা ‘আহলুস সুন্নাহ ও ‘আহলুল হাদীছ’ উভয় নামে অভিহিত ও পরিচিত হতেন।

ক্রমবিকাশ ও গতিধারার প্রেক্ষিতে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে ছয়টি যুগে বিভক্ত করা যায়। ১. স্বর্ণযুগ (৩৭ হিঃ পর্যন্ত) ২. বিদ'আতীদের উত্থান যুগ (৩৭-১০০ হি.), ৩. সংকট ও সংস্কার যুগ (১০০-১৯৮ হি.), ৪. সুন্নাত দলনের যুগ (১৯৮-২৩২), ৫. সংকট পরবর্তী যুগ (২৩২-৪র্থ শতাব্দী হিজরী), ৬. তাকলীদী যুগ (৪র্থ শতাব্দী হিজরী থেকে পরবর্তী যুগ) *(আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, পৃঃ ৮৩-৮৪)*। ইতিপূর্বে স্বর্ণযুগে আহলেহাদীছদের বিদ্যমানতার আলোচনা আমরা করেছি। এখানে বিদ'আতীদের উত্থান যুগে আহলেহাদীছদের অস্তিত্ব সম্পর্কে তুলে ধরার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

রাজনৈতিক ও উছূলী কারণে দ্বীন ইসলামে দলতন্ত্র ও ফের্কাবন্দী সৃষ্টি হয়। আর রাজনৈতিক ফের্কাবন্দীকে জিইয়ে রাখার জন্যই উছূলী বিতর্কের সূত্রপাত ঘটে। পরবর্তীতে এর সাথে যুক্ত হয় শরী'আতের ব্যাখ্যাগত মতপার্থক্য এবং গ্রীক ও ভারতীয় দর্শনের কূটতর্ক। তৃতীয় খলীফা ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফতের (২৩-৩৫হিঃ) শেষ দিকে ইয়ামনের জনৈক নিগ্রো মাতার গর্ভজাত ইহুদী সন্তান আব্দুল্লাহ ইবনু সাবা বাহ্যিকভাবে মুসলমান হয়। পরে তারই কূটচক্রজালে মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম 'সাবাঈ' ও 'ওছমানী' নামে দু'টি দলের উদ্ভব হয়। পরবর্তীতে বিদ্রোহী সাবাঈদের হাতেই মহান খলীফা ওছমান (রাঃ) নির্মমভাবে শাহাদাত বরণ করেন।

রাজনৈতিক কারণগুলোর মধ্যে প্রধান ছিল আলী ও মু'আবিয়া (রাঃ)-এর দ্বন্দ্ব। তৃতীয় খলীফা ওছমান-এর মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের দ্রুত বিচারের দাবীতে অটল সিরিয়ার তৎকালীন গভর্ণর মু'আবিয়া ইবনু আবু সুফিয়ানের সাথে চতুর্থ খলীফা আলী (রাঃ)-এর আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসার উদ্দেশ্যে ৩৭ হিজরীতে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে দু'জন খ্যাতনামা ছাহাবী আমর ইবনুল আছ ও আবু মূসা আশা'আরীকে শালিশ নিযুক্ত করেন। কিন্তু আলী (রাঃ)-এর পক্ষের একটি বিরাট দল এই 'শালিশী বৈঠক' বা মীমাংসাসভার বিরোধিতা করে। তাদের মতে 'কিতাবুল্লাহ' তথা আল-কুরআন বিদ্যমান থাকতে কোন মানুষকে শালিশ (মীমাংসাকারী) নিয়োগ করা অন্যায় ও কবীরা গুনাহ। আলী ও মু'আবিয়া (রাঃ) উভয়ে এই গুনাহের কাজ করেছেন। কাজেই তাঁরা দু'জনেই হত্যাযোগ্য অপরাধী। 'লা হাকামা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ব্যতীত কোন শালিশ নেই) এ শ্লোগান দিয়ে তারা আলীর বিরোধিতায় লিপ্ত হয়। এই দলই ইতিহাসে 'খারেজী' (দলত্যাগী) নামে অভিহিত। এই চরমপন্থী খারেজীদের হাতে চতুর্থ খলীফা আলী (রাঃ) শহীদ হন। অন্যদিকে আলী সমর্থক গোঁড়া আরেকটি দল সৃষ্টি হয়। এ দু'দল ছাড়া নিরপেক্ষ আরেকটি দল ছিল যারা আলী ও মু'আবিয়া (রাঃ) ও তাঁদের অনুসারীদেরকে মুমিন গণ্য করে উভয় দলের বিচারভার আল্লাহ্র উপরে ছেড়ে দেন। ছাহাবায়ে কেরামের মাঝের এই রাজনৈতিক বিভক্তির ফলে উছূলী বিতর্কের সূত্রপাত হয় এবং তা পরবর্তীতে খারেজী, শী'আ ও মুরজিয়া নামে পৃথক পৃথক বিদ'আতী ধর্মীয় মতবাদের রূপ পরিগ্রহ করে। হিজরী প্রথম শতাব্দীর শেষার্ধে উমাইয়া খলীফা আব্দুল মালিক ইবনু মারওয়ানের আমলে (৬৫-৮৬হিঃ) ইরাকের বছরা নগরে 'সূসেন' নামক জনৈক খৃষ্টান বাহ্যত মুসলিম হয়ে পরে মুরতাদ হয়ে যায়। তার প্ররোচনায় মা'বাদ জুহানী (মৃ. ৮০ হি.) সর্বপ্রথম মুসলিম সমাজে তাকদীরকে অস্বীকারকারী 'কাদরিয়া' মতবাদের জন্ম দেয়। পরবর্তীতে এ মতবাদের বিপরীতে সৃষ্টি হয় সম্পূর্ণ অদৃষ্টবাদী বিভ্রান্তিকর জাবারিয়া মতবাদ।

সে সময়ে ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনে ইযাম ঐসব ভ্রান্ত মতবাদ ও বিদ'আতী আক্বীদার বিরুদ্ধে দ্বীন ইসলামের আসল রূপ ও ছহীহ-শুদ্ধ আক্বীদার জোর প্রচার-প্রসার শুরু করেন। তারা ব্যাপক দাওয়াতী কার্যক্রমের মাধ্যমে ঐসব ভ্রান্ত আক্বীদার বিরুদ্ধে দুর্জয় প্রতিরোধ দুর্গ গড়ে তোলেন। প্রশাসনিকভাবেও তাদের প্রতিরোধের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ইসলামী খিলাফতের কর্ণধার চতুর্থ খলীফা আলী (রাঃ) চরমপন্থী খারেজী ও অতিভক্ত শী'আদেরকে কঠোরভাবে দমন করেন। এমনকি শী'আদের কিছু উপদলকে তিনি বেত্রাঘাত করে শাস্তি দেন এবং কিছু লোককে জীবন্ত পুড়িয়ে মারেন। এ যুগে বিদ'আতী দলগুলির বিপরীতে আহলেহাদীছগণের নামীয় ও দলীয় স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট ও প্রতিভাত হয়ে ওঠে।

সুতরাং এ বিদ'আতী যুগে চরমপন্থীরা দ্বীন ইসলামের যে ক্ষতি সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছিল তার কবল থেকে আহলেহাদীছগণই ইসলামের উপর সুদৃঢ় থেকে তাকে হেফাযত করেছিলেন। যুগে যুগে তাদের এই প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল, আজও আছে, ক্বিয়ামত পর্যন্ত থাকবে ইনশাআল্লাহ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বর্তমান মুসলিম জাতি যে ভয়াবহ সংকটের সম্মুখীন হয়েছে, তাদের নৈতিক, চারিত্রিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক আকাশ যেভাবে তিমিরাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে তাতে এটা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, সকল দুর্গতি ও সর্বনাশের হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য আহলেহাদীছ আন্দোলনকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। কিতাব ও সুন্নাতের আলোকিত জীবন ব্যবস্থার দিকে মুসলমানদেরকে দৃঢ়পদবিক্ষেপে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। সারা দেশে মুসলিম সংহতি ও ঐক্য গড়ে তোলার লক্ষ্যে দল-মত-মাযহাব নির্বিশেষে সকল মুসলমানকে কেবল বস্তুতান্ত্রিক স্বার্থের পরিবর্তে আহলেহাদীছ আন্দোলন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে জমায়েত হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানায়। অহিভিত্তিক জীবন ব্যবস্থা ও নবী করীম (ছাঃ)-এর একচ্ছত্র ইমামত প্রতিষ্ঠিত হলে দলবিভক্তি ও ফির্কাবন্দীর অবসান ঘটে মুসলিম উম্মাহ একটি ঐক্যবদ্ধ প্লাটফর্মে সমবেত হতে পারবে। আল্লাহ আমাদেরকে অহিভিত্তিক জীবন ও সমাজ গঠনের মাধ্যমে বৃহত্তর মুসলিম ঐক্য গড়ে তোলার তাওফীক্ব দিন- আমীন!

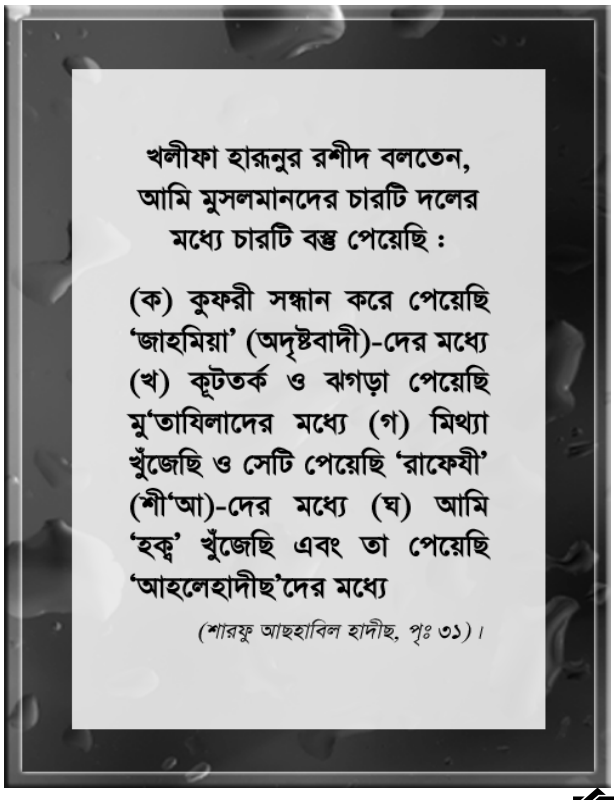

ডা. জাকির নায়েক : এক নবদিগন্তের অভিযাত্রী

আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব

ডা. জাকির আব্দুল করীম নায়েক ইসলাম ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের উপর বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম গবেষক ও বাগ্মীদের অন্যতম। অনন্যসাধারণ প্রতিভাধর 'দাঈ ইলাল্লাহ' হিসাবে তিনি সারাবিশ্বে ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেছেন। গত শতকের মধ্যভাগে ভারতীয় বংশোদ্ভূত দক্ষিণ আফ্রিকান নাগরিক শায়খ আহমাদ দীদাত (১৯১৮-২০০৫) বিভিন্ন ধর্ম ও বস্তুগত বিজ্ঞানের সাথে তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ইসলাম প্রচারের এক নতুন ধারার প্রয়াস শুরু করেন। ডা. জাকির নায়েক এই ধারার সফল পরিণতিই কেবল দান করেননি; বরং মুসলিম সমাজে প্রচলিত নানাবিধ কুসংস্কার ও নবাবিষ্কৃত আচার-আচরণ তথা শিরক-বিদ'আতের বিরুদ্ধেও প্রতিরোধ গড়ে তোলার সুন্দর ও কার্যকর একটি ধারার সূচনা করেছেন। অতি অল্প সময়ে তিনি 'পীস টিভি'র মত আন্তর্জাতিক স্যাটেলাইট প্রচারমাধ্যম ও একদল দক্ষ, নিষ্ঠাবান আলিম ও চিন্তাবিদের সমন্বয়ে ইন্ডিয়ার বুকে যে বহুমুখী ইসলামী দা'ওয়াহ সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেছেন তা এককথায় অভূতপূর্ব। নিম্নে তাঁর পরিচিতি ও দা'ওয়াতী কার্যক্রম সম্পর্কে আলোকপাত করা হল-

১৮ অক্টোবর ১৯৬৫ সালে ভারতের মুম্বাই শহরে এক কনকানি[৮] মুসলিম পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন মেডিকেল ডাক্তার। সেই সুবাদে মুম্বাইয়ের সেন্ট পিটারস স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা ও কিষাণচাঁদ কলেজে মাধ্যমিক শিক্ষা লাভের পর চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নের জন্য টপিওয়ালা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। অতঃপর ১৯৯১ সালে এম.বি.বি.এস ডিগ্রী লাভ করে ডাক্তার হিসাবে কর্ণাটকে কর্মজীবন শুরু করেন। ছাত্রজীবনে তিনি বিখ্যাত শৈল্যবিদ ক্রিস বার্নাডের মত সার্জন হবার স্বপ্ন দেখতেন। শৈশব থেকে তোতলামিতে (stammering) আক্রান্ত থাকায় মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলার কোন পরিকল্পনা তাঁর মোটেই ছিল না। কিন্তু ১৯৮৭ সালে ২২ বছর বয়সে একটি কনফারেন্সে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ তুলনামূলক ধর্মতাত্ত্বিক আলোচক আহমাদ দীদাতের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হলে তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত হন। ফলে তাঁর মাঝে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের প্রবল স্পৃহা জাগ্রত হয়। এক নাগাড়ে তিনি পবিত্র কুরআনসহ বর্তমান বিশ্বের প্রধান প্রধান ধর্মের পবিত্র গ্রন্থসমূহ যেমন- খৃষ্টধর্মের কয়েক প্রকার বাইবেল, ইহুদী ধর্মের তাওরাত ও তালমূদ, হিন্দু ধর্মের মহাভারত, বেদ, উপনিষদ, ভগবতগীতাসহ অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ করা শুরু করেন এবং কয়েক বছরের মধ্যেই সেগুলো আয়ত্ব করে ফেলেন। অতঃপর ১৯৯১ সাল থেকে তিনি দাওয়াতী কর্মকাণ্ডে মনোনিবেশ করেন। পরবর্তীতে ডাক্তারী পেশা ছেড়ে দিয়ে একজন ফুলটাইম ধর্মপ্রচারক হিসাবে মুম্বাইসহ ইন্ডিয়ার বিভিন্ন প্রদেশে বক্তব্য প্রদান করতে শুরু করেন। আল্লাহ্‌র অশেষ রহমতে তাঁর মুখের জড়তা অর্থাৎ তোতলামীর ভাবও দিনে দিনে কেটে যায়। অতি দ্রুতই তিনি জনমনে বিপুল প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হন। ইন্ডিয়ার বাইরে বিভিন্ন দেশ থেকে তাঁর ডাক আসতে থাকে। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তাঁর দাওয়াতী কার্যক্রম বিস্তৃত করার লক্ষ্যে বক্তৃতার ভাষা হিসাবে ইংরেজী বেছে নেন। ইতিমধ্যে আমেরিকা, ইংল্যান্ড, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ইতালী, সঊদী আরব, আরব আমিরাত, কুয়েত, কাতার, বাহরাইন, ওমান, দক্ষিণ আফ্রিকা, বোতসোয়ানা, মৌরিশাস, গায়ানা, ত্রিনিদাদ, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, শ্রীলংকা, মালদ্বীপসহ বিশ্বের অনেকগুলো দেশে ১৩০০-এরও অধিক লেকচার প্রদান করেছেন। ২০০টিরও বেশী দেশের টিভি চ্যানেলে তাঁর বক্তব্যসমূহ প্রচারিত হয়েছে। এ দিক দিয়ে বর্তমান বিশ্বে ইসলামী আলোচকদের মধ্যে তাঁর অবস্থান প্রশ্নাতীতভাবে শীর্ষে। ২০০৯ সালে ইন্ডিয়ার সর্বাধিক প্রভাবশালীদের তালিকায় তার নাম ছিল ৮২তম স্থানে ও ১০ জন শীর্ষ ধর্মবেত্তাদের তালিকায় বাবা রামদেব ও শ্রী শ্রী রবিশংকরের পরই ছিল তার অবস্থান।

ইসলাম ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের উপর খ্যাতিমান বক্তা আহমাদ দীদাত ১৯৯৪ সালে জাকির নায়েককে "Deedat plus" উপাধিতে ভূষিত করেন। দাওয়াতী ময়দানে অসাধারণ সফলতা অর্জনের জন্য তিনি তাঁকে ২০০০ সালে একটি স্মারক প্রদান করেন যেখানে তাঁর খোদাইকৃত বক্তব্য ছিল "Son what you have done in 4 years had taken me 40 years to accomplish, Alhamdulillah". 'বৎস! চার বছরেই তুমি যা করেছ, তা করতে আমার চল্লিশ বছর লেগেছে, আলহামদুলিল্লাহ।'

তিনি বিভিন্ন ধর্মের প্রখ্যাত পণ্ডিতগণের সাথে বিতর্ক অনুষ্ঠানেও অংশ নেন। ইতিমধ্যে তিনি ছোট-বড় শতাধিক বিতর্ক অনুষ্ঠানে যোগদান করেছেন। ২০০০ সালে আমেরিকার শিকাগো শহরে প্রখ্যাত খৃষ্টান পণ্ডিত ড. উইলিয়াম ক্যাম্পবেলের সাথে 'বিজ্ঞানের আলোকে পবিত্র কুরআন ও বাইবেল' বিষয়ে বিতর্ক অনুষ্ঠান খৃষ্টান বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করে। ২০০৬ সালে ব্যাঙ্গালোরে লক্ষাধিক শ্রোতার উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত শ্রী শ্রী রবিশংকরের সাথে তাঁর আন্তঃধর্ম সংলাপ ব্যাপক প্রশংসা কুড়ায়। ২০০৭ সাল থেকে প্রতিবছর নভেম্বর মাসে মুম্বাইয়ের সুবিশাল সুমাইয়া গ্রাউন্ডে ১০ দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক পীস কনফারেন্সের আয়োজন করে থাকেন। ইন্ডিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে খ্যাতনামা ইসলামী পণ্ডিতগণ এখানে আলোচক হিসাবে উপস্থিত থাকেন। সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও সুসজ্জিত ডেকোরেশনে আড়ম্বরপূর্ণ এ আয়োজনে প্রতিবছর কয়েক লক্ষ শ্রোতার আগমন ঘটে। পীস টিভির মাধ্যমে যা সরাসরি সম্প্রচার করা হয় ।

তাঁর বক্তব্যসমূহ সিডি-ভিসিডি এবং বই আকারেও প্রকাশিত হয়েছে এবং বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে তা বিশ্বের নানা জায়গায় প্রচারিত

৮. ভারতে পশ্চিমাঞ্চলে (মহারাষ্ট্র প্রদেশ) আরব সাগরের উপকূলীয় সমভূমি অঞ্চল জুড়ে মালাবার ও কনকান অঞ্চল অবস্থিত। মুহাম্মাদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের পূর্বেই এ অঞ্চলে আরব মুসলিম বণিক ও প্রচারকগণ আগমন করেন এবং বসতি স্থাপন করেন। এ অঞ্চলের মুসলমানরা কনকানী ও মোপলা মুসলমান বলে পরিচিত। ভারতবর্ষের ইতিহাসে তারাই সর্বপ্রাচীন মুসলিম জনগোষ্ঠী । এজন্য তাদেরকে 'The Vanguards of Islam in India' বলা হয়। আরবী ও ফারসী মিশ্রিত স্থানীয় ভাষায় তারা কথা বলে। সাধারণত তাদেরকে শাফে'ঈ মাযহাবভুক্ত মনে করা হয়। ১৮ শতকে তারা থানেশ্বর, মুম্বাই, রত্নগিরি প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। *(উইকিপিডিয়া, kankani people)*।

হচ্ছে। বাংলাদেশে ইতিমধ্যে 'ইসলামিক টিভি'র সৌজন্যে তাঁর অধিকাংশ বক্তব্য বাংলায় ডাবিং করে সিডি-ভিসিডিতে ধারণ করা হয়েছে এবং কয়েকটি প্রকাশনী থেকে তা বই আকারে প্রকাশ করা হয়েছে।[৯]

তাঁর প্রতিষ্ঠিত মুম্বাইয়ের Islamic Research Foundation (IRF) নামক বহুমুখী ইসলামিক সেন্টারটি ১৯৯১ সালে প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকে সারাবিশ্বে অমুসলিম সমাজে ইসলামের বার্তা পৌঁছানো, ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণাসমূহ নিরসন এবং মুসলমানদের মাঝে আত্মসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ প্রতিষ্ঠানে মহিলাদের মাঝে বিশুদ্ধ জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ দাঈ সৃষ্টির জন্য পৃথক শাখা রয়েছে। শিশুদেরকে অংকুর থেকে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে সুশিক্ষিত করার লক্ষ্যে একটি আন্তর্জাতিক মানের ইসলামিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এছাড়া সেখানে ইসলামী গ্রন্থাবলীসহ বিশ্বের অধিকাংশ ধর্মের পবিত্র গ্রন্থাবলীর এক বিশাল লাইব্রেরী গড়ে তোলা হয়েছে। বলা যায়, বিভিন্ন ধর্মের উপর তাঁর প্রতিষ্ঠানের সংগ্রহ বর্তমান বিশ্বে সর্বাধিক সমৃদ্ধ।

২০০৬ সালের ২১ জানুয়ারী এ প্রতিষ্ঠানটি সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ Peace TV নামক একটি ইসলামী টিভি চ্যানেল চালু করে। মুসলিম

বিশ্বে এটাই ছিল তখন সর্বপ্রথম এবং একমাত্র ইসলামিক টিভি। ২০০৭ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে দক্ষিণ আমেরিকা ব্যতীত আমেরিকা ও কানাডাসহ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে চ্যানেলটির সম্প্রচার শুরু হয়। বর্তমানে চ্যানেলটি ১৫০টিরও বেশী দেশে সম্প্রচারিত হচ্ছে। এর দর্শক ৫০ মিলিয়নেরও অধিক। 'The Solution for humanity' শ্লোগান নিয়ে যাত্রা শুরু করা এই ব্যাপকভিত্তিক টিভি চ্যানেলটিকে পবিত্র কুরআন ও হাদীছের প্রামাণিক শিক্ষা অনুসারে ইসলামী আক্বীদা ও নীতি-বিধান প্রচার এবং বিশ্বমিডিয়ায় ইসলামের বিরুদ্ধে প্রচারিত ভুলধারণাগুলোর জবাবদানের জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্রে পরিণত করতে প্রতিষ্ঠানটি দৃঢ় প্রত্যয়ী। ইতিমধ্যে এর কার্যক্রম সারাবিশ্বে সাড়া জাগিয়েছে।

এই টিভি চ্যানেলে প্রতিদিন ডা. জাকির নায়েক সহ বিভিন্ন দেশের অর্ধশতাধিক খ্যাতনামা ওলামায়ে কেরাম ও ইসলামী চিন্তাবিদগণ ইসলামের বিশ্বজনীন আদর্শকে পৃথিবীবাসীর সামনে পরিপূর্ণভাবে উপস্থাপন করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। একদল নও-মুসলিম ব্যক্তিত্ব এর বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করেছেন। এখানে নিয়মিত যাদের বক্তব্য প্রচারিত হয় তারা হলেন- শায়খ আহমাদ দীদাত (দক্ষিণ আফ্রিকা), আবু আমিনাহ বিলাল ফিলিপস (জ্যামাইকা), ডা. ইসরার আহমাদ (পাকিস্তান), আব্দুর রহীম গ্রীন (ইংল্যান্ড), আব্দুল হাকীম কুইক (কানাডা), হুসাইন ইয়ে (মালয়েশিয়া), ইউসুফ এস্টেস (যুক্তরাষ্ট্র), ড. জামাল বাদাভী (কানাডা), শাব্বির আলী (কানাডা), ড. মামদূহ মুহাম্মাদ (সঊদী আরব), জাফর ইদরীস (সুদান), ইউসুফ ইসলাম (ইংল্যান্ড), শায়খ ফয়যুর রহমান (ইন্ডিয়া), আব্দুল করীম পারেখ (ইন্ডিয়া), ডা. শুআইব সাঈদ (ইন্ডিয়া) প্রমুখ। এছাড়া প্রতি বছর অনিয়মিতভাবে বিশ্বের শতাধিক আলোচক এখানে উপস্থিত হন। যাদের একটা বড় অংশই হল নও-মুসলিম।

শিশু ও মহিলাদের জন্যও এখানে বিশেষ প্রোগ্রাম সম্প্রচারিত হয়। এর প্রায় ৭৫ ভাগ প্রোগ্রাম ইংরেজীতে এবং বাকীগুলো উর্দূ ও হিন্দীতে সম্প্রচারিত হয়। জুলাই'০৯ উর্দূ বিভাগ চালুর পর সম্প্রতি বাংলা বিভাগ খোলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে চ্যানেলটি। আগামী ডিসেম্বরে তা পূর্ণাঙ্গভাবে চালু করা সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

২৪ ঘণ্টা সম্প্রচারিত মুম্বাই ভিত্তিক এই টিভি চ্যানেলের অন্তত ৫০ ভাগ সময় তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব তথা ইসলাম ও খৃষ্টধর্ম, ইসলাম ও হিন্দু ধর্ম, ইসলাম ও ইহুদী ধর্ম, ইসলাম ও শিখ ধর্ম ও অনুরূপ বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়া ইসলাম ও বিজ্ঞান ইত্যাদিসহ শারঈ আহকামসমূহ যেমন ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মিত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এ সমস্ত আলোচনার অধিকাংশই পাবলিক লেকচার তথা অডিটোরিয়ামে উপস্থিত জনসমাবেশ থেকে প্রচারিত হয়। মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সব ধর্মের লোক এই সমাবেশগুলোতে ব্যাপক আগ্রহের সাথে উপস্থিত হচ্ছে। বিতর্ক, সাক্ষাৎকার, ঐতিহাসিক ফিচার ইত্যাদি প্রোগ্রাম মুসলিম-অমুসলিম সকল দর্শক-শ্রোতাকে আকর্ষণ করছে। জাকির নায়েক চ্যানেলটিকে "edutainment channel" অর্থাৎ 'শিক্ষাবিনোদন চ্যানেল' বলে আখ্যায়িত করেন। প্রতিষ্ঠানটি সম্প্রতি একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী নিউজ চ্যানেল সম্প্রচারের উদ্যোগও গ্রহণ করেছে। এছাড়া প্রচলিত সূদী ব্যাংকিং ব্যবস্থার বিকল্প হিসাবে একটি আন্তর্জাতিক ইসলামিক ফিন্যান্স ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠার জন্যও এই প্রতিষ্ঠান চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

জাকির নায়েকের দাওয়াতী কার্যক্রমের নীতি ও ধারাসমূহ :

ডা. জাকির নায়েক পেশায় একজন ডাক্তার হওয়া সত্ত্বেও ইসলাম সম্পর্কে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ও গবেষণামূলক ব্যাখ্যা প্রদান এবং সাথে সাথে পবিত্র কুরআন ও হাদীছের রেফারেন্স উপস্থাপনে যে অসাধারণ মেধা ও ধীশক্তির পরিচয় রেখে চলেছেন তা এক বিরল দৃষ্টান্ত। তিনি পবিত্র কুরআন, ছহীহ হাদীছ ও প্রচলিত অন্যান্য ধর্মগ্রন্থসমূহের আলোকে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম ইসলাম ও এর বিধি-বিধান সমূহের যৌক্তিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করে মুসলিম-অমুসলিম সকলের চিন্তার জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে চলেছেন। তাঁর বিশেষ লক্ষ্য সম্পর্কে তিনি বলেন, 'আমি চাই সেসব শিক্ষিত মুসলিম তরুণদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে যারা স্বীয় ধর্মের ব্যাপারে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে এবং ধর্মকে পশ্চাদপদ ভাবতে শুরু করেছে।' তাঁর লক্ষ্য নির্ধারণ যে ভুল হয়নি তরুণ সমাজে তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তা থেকে তা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত। ফালিল্লাহিল হামদ্। তাঁর দাওয়াতী কার্যক্রমে যেসব নীতি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় তা নিম্নে সংক্ষেপে আলোচিত হল-

১- শিরক থেকে সতর্কীকরণ :

ডা. জাকির নায়েকের বক্তব্যসমূহের মূল ধারা হল জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বিশ্ববাসীকে একেশ্বরবাদী বিশ্বাসের দিকে আহ্বান জানানো এবং

৯. এখানে সতর্কতার জন্য বলা প্রয়োজন যে, বিভিন্ন প্রকাশনীর বাংলা অনুবাদসমূহ পরখ করে দেখা গেছে সেখানে বেশ কিছু স্থানে ভুল অনুবাদ করা হয়েছে। আরো উদ্বেগের বিষয় যে, মাসআলাগত বিষয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু যোজন-বিয়োজন করা হয়েছে যা মূল বইয়ে নেই। এজন্য পাঠককে সতর্কতার সাথে বই ক্রয়ের জন্য অনুরোধ করা হল।- লেখক

শিরক থেকে সতর্কীকরণ। তিনি প্রধান প্রধান ধর্মগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি পেশ করে এ কথা প্রমাণ করেন যে, অধিকাংশ ধর্মগ্রন্থই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে এক ও অদ্বিতীয় সত্তা হিসাবে আখ্যায়িত করেছে এবং সাথে সাথে তাঁর সৃষ্টির ইবাদতকে নিষেধ করেছে। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যকার বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলো পরিত্যাগ করে সাদৃশ্যগুলো যেমন- আল্লাহর একত্ববাদ, শিরক পরিত্যাগকরণ ইত্যাদি বিষয় উল্লেখের মাধ্যমে তিনি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম ইসলাম সম্পর্কে সমন্বয়ী ও যুক্তিগ্রাহ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার আহ্বান জানান। এজন্য তিনি প্রত্যেক বক্তব্যে সাধারণত এ আয়াতটি উদ্ধৃত করেন- 'হে আহলে কিতাব! একটি বিষয়ের দিকে এস যা আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করব না, তাঁর সাথে কোন শরীক সাব্যস্ত করব না এবং আল্লাহকে ছাড়া কাউকে পালনকর্তা বানাব না। তারপর যদি তারা স্বীকার না করে, তাহলে বলে দাও সাক্ষী থাক যে আমরা মুসলমান' *(আলে ইমরান ৬৪)*।

তিনি বলেন, পৃথিবীবাসীর পথভ্রষ্ট হওয়ার মূল কারণ এই যে, তারা তাদের ধর্মীয় গ্রন্থগুলো পড়ে দেখে না। যদি মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে তাদের স্ব স্ব ধর্মীয় গ্রন্থগুলো পড়ে দেখত, যথার্থভাবে গবেষণা করত, তবে তারা কখনই পথভ্রষ্ট হতো না।

তুলনামূলক আলোচনার কোন অংশেই তিনি নিজের উদ্দেশ্য থেকে বিস্মৃত হন না। বরং নিজ লক্ষ্যের প্রতি অবিচল থেকে এবং সচেতনভাবে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে তিনি সতর্ক পদক্ষেপে ইসলামের বার্তা প্রচার করে চলেছেন।

২- ইসলামের বিরুদ্ধে সৃষ্ট সংশয় দূরীকরণ :

অমুসলিম সমাজে প্রচলিত এবং বিশ্ব মিডিয়ায় ইসলামের বিভিন্ন বিধি-বিধান নিয়ে প্রচারিত সংশয়-বিভ্রান্তি দূর করার জন্য তিনি ও তাঁর প্রতিষ্ঠান একটি মাইলফলকের মত কাজ করে যাচ্ছে। ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, ইসলাম ও জঙ্গীবাদ, মুসলিম ভ্রাতৃত্ব, ইসলাম ও নারী, শরী'আহ আইন ও বিধান, ইসলামিক অর্থনীতি, ইসলাম ও রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ে তিনি নিয়মিত আলোচনা রাখেন। বক্তব্য শেষে আকর্ষণীয় প্রশ্নোত্তর পর্বে তিনি দর্শকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। প্রোগ্রামগুলোর শিরোনাম যেমন- *'Truth Exposed', 'Dare to Ask', 'Let's Ask Dr. Zakir', 'Izhar-E-Haq', 'Peace Missile', 'Fire of Faith', 'Crossfire'* ইত্যাদি থেকেই অনুষ্ঠানগুলোর প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এসব ক্ষেত্রে যে কর্মনিষ্ঠা, বিচক্ষণতা. আত্মবিশ্বাস, সাহসিকতা প্রয়োজন জাকির নায়েক তা সম্যকভাবে লালন করে চলেছেন। পবিত্র কুরআন ও হাদীছের সাথে বিজ্ঞান ও যুক্তির কার্যকর প্রয়োগের মাধ্যমে তিনি বিভিন্ন বিভ্রান্তির সাবলীল জবাব দেন। তিনি যুক্তির প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন এ কারণে যে, অমুসলিম ও সেক্যুলার মুসলমানরা ইসলামী বিধিবিধানকে অযৌক্তিক ও আধুনিক যুগের সাথে সাংঘর্ষিক মনে করে ইসলামের ব্যাপারে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে। সেক্ষেত্রে তাঁর যুক্তিপূর্ণ আলোচনা সকল ধর্ম ও শ্রেণীর জনগণের বিভ্রান্তি নিরসনের উপযোগী।

৩- মুসলিম জাতিকে এক পতাকাতলে একত্রিত হওয়ার আহ্বান :

ডা. জাকির নায়েক ও তাঁর প্রতিষ্ঠান বক্তব্য, লেখনী ও ফৎওয়া প্রদানের মাধ্যমে গোটা মুসলিম জাতিকে একক প্লাটফরমে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য চেষ্টিত রয়েছেন। চার মাযহাবের ইমামগণ সম্পর্কে জাকির নায়েক তাঁর বক্তব্যে বলেন, ইমামগণ সকলেই ইসলামের খিদমতে এক বিরাট অবদান রেখে গেছেন। তাঁদের বিপুল জ্ঞানবত্তা ও দ্বীনের খাতিরে তাঁদের প্রাণান্ত পরিশ্রমের জন্য তাঁরা মুসলিম উম্মাহ্র নিকট অত্যন্ত শ্রদ্ধাস্পদ। আমরা তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি এবং মহান আল্লাহ্র নিকটে তাঁদের জন্য যথাযথ পুরস্কার কামনা করি। কিন্তু এজন্য এটা সংগত হবে না যে, তাঁদের নামে সৃষ্ট চার মাযহাবের যে কোন একটি মাযহাবের অনুসরণ করা অপরিহার্য করতে হবে। পবিত্র কুরআন ও হাদীছের নিরিখে এ বিভক্তি মোটেও সমর্থনযোগ্য নয়। আর মহামতি ইমামগণও সকলেই বলে গেছেন, যদি তাঁদের প্রদত্ত কোন ফৎওয়া বা সিদ্ধান্ত পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিরোধী হয়, তবে তাঁদের ফৎওয়া অবশ্যই পরিত্যাজ্য হবে। সুতরাং সর্বাবস্থায় রাসূলের সুন্নাতকে অগ্রাধিকার দেওয়াই মুসলিম জাতির জন্য অপরিহার্য, যদিও তা ইমামগণের সিদ্ধান্তের বিপরীত হয়। তিনি বলেন, যদি কোন লেবেল দিয়ে নিজেকে পরিচিত করতে হয়, তবে সেই লেবেলে নিজেকে পরিচিত করাই সর্বোত্তম যা আল্লাহ রাব্বুল আমীন পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ-'মুসলিম'। সুতরাং যদি কেউ জিজ্ঞেস করে যে, আপনি কে? তবে বলা উচিৎ আমি মুসলিম। যেমন কুরআনে এসেছে, 'সাক্ষী থাক যে আমরা মুসলমান' *(আলে ইমরান ৬৪)*। আর যারা নিজেদের মুসলিম দাবী করে অথচ কুরআন ও হাদীছ অনুযায়ী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে না তাদেরকে বলা উচিৎ 'মৌখিক মুসলমান' (Lip Service Muslim)। যেমন আল্লাহ বলেন, 'হে রাসূল, তাদের জন্য দুঃখ করবেন না, যারা দৌড়ে যেয়ে কুফরে নিপতিত হয়; যারা মুখে বলে, আমরা মুসলমান, অথচ তাদের অন্তর মুসলমান নয়' *(আলে ইমরান ১৭৬)*।

এভাবে পৃথিবীর সকল মুসলমানের উচিৎ কেবলমাত্র পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসরণ করা এবং এটা নিশ্চিত করা যে, তারা পরস্পর বিভক্ত নয়। এটাই মুসলিম জাতির ঐক্যবদ্ধ হওয়ার একমাত্র পথ। আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্র নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা নির্দেশদাতা তাদের। তারপর তোমরা যদি কোন বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি প্রত্যর্পন কর- যদি তোমরা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর এটাই কল্যাণকর ও পরিণতির দিক থেকে উত্তম' *(নিসা ৫৯)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না' *(আলে ইমরান ১০৩)*।

তাঁর মতে যদি প্রত্যেক মুসলমান অর্থ অনুধাবনসহ কুরআন পড়ত এবং ছহীহ হাদীছের যথাযথ অনুসরণ করত তবে আজ হয়ত মুসলমানদের মাঝে যাবতীয় বিভ্রান্তি ও বিভক্তি দূর হয়ে যেত। আর সেদিন হয়তো এক ও একক মুসলিম উম্মাহ হিসাবে আমরা বিশ্ববাসীর সামনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে পারতাম।

৪- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসরণ :

তিনি জীবনের সর্বক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসরণ করার জন্য সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন, একজন সত্যিকারের মুসলিমের উচিৎ কেবলমাত্র কুরআন ও হাদীছের অনুসরণ করা। মহামতি ইমামগণ কিংবা ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য বা সিদ্ধান্ত অনুসরণযোগ্য তবে যে পর্যন্ত তা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপর ভিত্তিশীল হবে। যদি তাঁদের সিদ্ধান্ত কুরআন ও সুন্নাহের বিরুদ্ধে চলে যায়, তবে অবশ্যই তা পরিত্যাজ্য। তাই মাযহাবী দৃষ্টিকোণে যদি একজন মুসলমানকে কোন মাযহাব অনুসরণ করতেই হয় তবে সেটা হতে হবে একমাত্র নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মাযহাব। যেমন রাসূলুল্লাহ

(ছাঃ) বলেন, 'মুক্তিপ্রাপ্ত তারাই যারা অনুসরণ করে সেই নীতি, যেই নীতির উপর আমি এবং আমার ছাহাবীরা রয়েছি' *(তিরমিযী)*।

৫- পূর্ণ রেফারেন্সসহ বক্তব্য উপস্থাপন :

তাঁর বক্তব্য উপস্থাপনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল পবিত্র কুরআনের প্রতিটি আয়াত এবং প্রতিটি হাদীছ উল্লেখ করার সময় তিনি অপরিহার্যভাবে মূলসূত্র উল্লেখ করেন। হাদীছের বিশুদ্ধতা নিরূপণে তাঁর বিশেষ সতর্কতা লক্ষ্যণীয়। এজন্য সবসময় তিনি 'Authentic Hadeeth' বা ছহীহ হাদীছ কথাটি উল্লেখ করে থাকেন। বিস্ময়কর যে, বক্তব্যকালীন সময় তিনি একাধারে প্রত্যেকটি আয়াত ও হাদীছ এবং অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের উদ্ধৃতিসমূহ মূলসূত্র থেকে ক্রমিক নম্বর, এমনকি পৃষ্ঠা ও লাইন নম্বরসহ জড়তাহীনভাবে উল্লেখ করে যান কোন প্রকার লিখিত নোট ছাড়াই। যেন সকল ধর্মগ্রন্থই তাঁর মস্তিষ্কে সংরক্ষিত। তাঁর এই অবিশ্বাস্য ধীশক্তি ও উপস্থাপনা কৌশল বিভিন্ন ধর্মের বড় বড় পণ্ডিতদেরকেও হতবাক করেছে। এভাবে তিনি কুরআন ও হাদীছ উপস্থাপনায় বিশুদ্ধতাকে অগ্রাধিকার প্রদান ও পূর্ণাঙ্গ দলীলসহ প্রাঞ্জল বক্তব্য উপস্থাপনের মাধ্যমে দ্বায়িত্বশীলভাবে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে অব্যাহত প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন।

৬- সাহসিকতা :

সদাহাস্য, রসিকতাপূর্ণ, নিরহংকার, সাধাসিধে, নিরীহদর্শন এই ব্যক্তিত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল হক্ব প্রচারে দ্বিধাহীন সাবলীলতা ও দ্বায়িত্বপূর্ণ সাহসিকতা। হক্ব প্রচারে তিনি যে কতটা নির্দ্বিধ তার প্রমাণ মেলে গত ২ ডিসেম্বর'২০০৭ তিনি একটি পাবলিক লেকচারে এক অমুসলিম দর্শকের প্রশ্নের জওয়াবে তিনি ইয়াযিদ বিন মুআবিয়া সম্পর্কে বলতে গিয়ে 'রাযিআল্লাহ' উচ্চারণ করেন এবং 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতে'র মত অনুযায়ী কারবালার ঘটনায় তাঁকে দোষী না করে বরং এ ঘটনাকে রাজনৈতিক দুর্ঘটনা বলে উল্লেখ করেন। বহু মতবাদ, বিশেষত শী'আ মতবাদদুষ্ট অঞ্চলে জাকির নায়েকের এ স্পর্শকাতর মতপ্রকাশ খুব একটা সহজ ছিল না। শী'আ ও শী'আ মতবাদাচ্ছন্ন মুসলমানরা তার এ বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ শুরু করলে শান্তভাবে ও সাহসিকতার সাথে তিনি পরিস্থিতি সামাল দেন। তিনি বিভিন্ন আধুনিক জাহেলী মতবাদের প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি এবং সমকালীন মুসলিম বিশ্বের কর্মকাণ্ড ও সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন সংশয়হীন চিত্তে। আন্তঃধর্ম সংলাপে এ কথা সুস্পষ্ট করতে তিনি পিছপা হন না যে, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ইসলামে গুরুত্বপূর্ণ। তাই বলে এর অর্থ এই নয় যে, অন্য ধর্মকে সত্য বা গ্রহণযোগ্য মনে করতে হবে। বরং ইসলামই আল্লাহ্র মনোনীত একমাত্র অনুসরণযোগ্য ধর্ম।

তিনি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের একজন দ্ব্যর্থহীন সমালোচক। তিনি মুসলমানদেরকে ডলারের পরিবর্তে অন্য মুদ্রা ব্যবহার এবং ডলার-প্রচলিত ব্যাংকে টাকা জমাদান বা লেনদেন না করার পরামর্শ দিয়েছেন। টুইন টাওয়ারের ঘটনার পশ্চাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ. বুশেরই হাত রয়েছে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে সন্ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য তিনি বুশকে পয়লা নম্বর সন্ত্রাসী বলে অভিহিত করেন। *(সাক্ষাৎকার, দৈনিক তে ওয়াহা নুই, অকল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, ৬ সেপ্টেম্বর' ২০০৪)*।

৭. স্বতঃস্ফূর্তভাবে দর্শকদের প্রশ্নের জবাব দান :

প্রচলিত সেমিনার বা কনফারেন্স পদ্ধতি থেকে বেরিয়ে এসে শ্রোতাদের খুব কাছাকাছি হওয়ার জন্য তিনি বক্তব্যের মঞ্চে ডায়াস বিহীনভাবে উপস্থিত হন। তাঁর প্রতিটি বক্তব্য শেষে একটি প্রশ্নোত্তর পর্ব থাকে যেখানে দর্শকরা সরাসরি মাইকের মাধ্যমে তাঁকে বিভিন্ন প্রশ্ন করে। আকর্ষণীয় এ পর্বটি মুসলিম-অমুসলিম সকলের জন্য খুব উপকারী। তিনি সহজ ভাষায় বিভিন্ন উদাহরণ, উদ্ধৃতি দিয়ে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও যুক্তি সহকারে উত্তর প্রদান করেন। গভীর জ্ঞানোৎসারিত দর্শন প্রকাশ নয়; বরং অতি সরল-স্বাভাবিক ও সহজবোধ্য উপস্থাপনগুণে তিনি আম জনসাধারণের কাছে সমাদৃত হয়েছেন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজের শিক্ষকসহ উচ্চ পদস্থ আমলা, কূটনীতিক, প্রশাসনিক কর্মকর্তারাও এসব অনুষ্ঠানে নিয়মিত অংশগ্রহণ করেন। যখন-তখন কুরআন, হাদীছ ও বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে পরিপূর্ণ সূত্রসহ উদ্ধৃতি পেশ করায় তাঁর দক্ষতা প্রশ্নাতীত। এছাড়া অনলাইনে তাঁর প্রতিষ্ঠান আইআরএফ-এর পক্ষ থেকে সার্বক্ষণিক যে কোন বিষয়ে প্রশ্নোত্তর দেওয়া হয়।

৮- আন্তঃধর্ম বিতর্কে অংশগ্রহণ :

চিরন্তন সত্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর জন্য ব্যাপক ও কার্যকরী মাধ্যম হিসাবে ডা. জাকির নায়েক বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মের পণ্ডিতদের সাথে আন্তঃধর্ম বিতর্কে অংশগ্রহণ করে থাকেন। ২০০০ সালে আমেরিকার শিকাগোতে ডা. উইলিয়াম এফ ক্যাম্পবেলের সাথে জাকির নায়েক *"The Quran & the Bible in the Light of Modern Science"* শীর্ষক এক উন্মুক্ত বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন এবং সফলভাবে তাঁর চ্যালেঞ্জ মুকাবিলা করেন। ২০০৬ সালে তিনি ভারতের ব্যাঙ্গালোরে প্রখ্যাত হিন্দু সাধক শ্রী শ্রী রবীশংকরের সাথে *'The Concept of God in Hinduism and Islam, in the light of sacred scriptures'* শীর্ষক আন্তঃধর্ম সংলাপের আয়োজন করেন। লক্ষাধিক মানুষ এ সমাবেশে উপস্থিত হয়।

২০০৬ সালের ১২ সেপ্টেম্বর খৃষ্টসমাজের প্রধান ধর্মীয় নেতা ভ্যাটিকানের পোপ বেনেডিক্ট (১৬শ) মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে অসম্মানজনক মন্তব্য (জার্মানীর রিজেন্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত এক সেমিনারে ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে পোপ ১৪ শতকের বাইজান্টাইন সম্রাট ম্যানুয়েল (২য়) প্যালেলোগাসের একটি উক্তি নকল করেন- "তুমি আমাকে দেখাও যে, মুহাম্মাদ কোনটা নিয়ে এসেছেন যাকে নতুন বলা যায়? বরং তুমি সেখানে যা-ই পাবে সবকিছু কেবল অনিষ্ট ও অমানবিক; যেমন 'তরবারীর মাধ্যমে তাঁর প্রচারিত বিশ্বাসকে বিস্তারের নির্দেশপ্রদান' করার পর সৃষ্ট ক্ষোভ প্রশমনের জন্য মুসলিম নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনায় বসার আগ্রহ প্রকাশ করলে ২৯ সেপ্টেম্বর জাকির নায়েক তাঁকে উন্মুক্ত সংলাপের জন্য আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'পোপের ইচ্ছামতো আমি কুরআন ও বাইবেলের যে কোন বিষয়ে বিতর্কে সম্মত আছি। ইটালিয়ান ভিসা পেলে আমি নিজ খরচে রোম বা ভ্যাটিকানে তাঁর নিকটে যাব। আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত আন্তর্জাতিক টিভি চ্যানেলে সরাসরি সম্প্রচারিত এই উন্মুক্ত ও পাবলিক ডিবেটে অংশগ্রহণ করতে। বিতর্ক শেষে একটি দর্শকদের জন্য প্রশ্নোত্তর পর্বও থাকবে যাতে সারাবিশ্বের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ ইসলাম ও খৃষ্ট ধর্ম সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা লাভ করতে পারে।' বলা বাহুল্য পোপ ইতিপূর্বে মুসলমানদের সংলাপে বসার আগ্রহ ব্যক্ত করলেও জাকির নায়েকের

এই আহ্বানের পর তিনি নিশ্চুপ হয়ে যান। এমনকি সরব পশ্চিমা মিডিয়াও ছিল এক্ষেত্রে নিশ্চুপ।

ডা. জাকির নায়েকের বক্তব্যের নমুনা :

নিম্নে দু'টি বিষয়ে তাঁর বক্তব্যের সারাংশ উল্লেখ করা হল-

কুরআনের সত্যতা প্রসংগে :

কুরআনের চিরন্তন সত্যতা ও আল্লাহ্র কালাম হওয়া প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি ১৪০০ বছর পূর্বে কুরআনে বর্ণিত কয়েকটি বিষয় যেমন- বিগব্যাংগ তত্ত্ব, পৃথিবীর আকার, চাঁদের আলো, গ্রহ-নক্ষত্রের পরিভ্রমণ, পানিচক্র, সমুদ্রের লোনা পানি ও মিঠা পানি, ভূ-তত্ত্ব ইত্যাদির অবতারণা করেছেন, যেগুলোর প্রমাণ সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় পাওয়া গেছে। তিনি বলেন, অবিশ্বাসীরা বলে বসতে পারে এটা 'হঠাৎ করে মিলে যাওয়া'র মত একটা কিছু। ইংরেজীতে একে বলা হয় 'Theory of Probablity' বা 'সম্ভাবনার সূত্র'। উদাহরণস্বরূপ একটি কয়েন যদি টস করা হয় তবে এ সূত্র অনুযায়ী সঠিক দিকটি অনুমান করার সম্ভবনা ½ ভাগ বা ৫০%। অর্থাৎ 'হেড'ও পড়তে পারে, 'টেইল'ও পড়তে পারে। আবার যদি দু'বার করা হয় তবে দু'বারই সঠিক অনুমানের সম্ভাবনা ½+½= ¼ ভাগ বা ২৫%। যদি তিন বার করা হয় তবে সম্ভাবনা ½+½+½= ⅛ ভাগ বা ১২.৫%। এভাবে এই থিউরী অনুযায়ী যদি কুরআনকে বিচার করা যায় তবে প্রথমে ধরা যাক পৃথিবীর আকার নিয়ে। একটা মানুষ কোন বস্তুর আকার নিয়ে প্রায় ৩০ ধরনের চিন্তা করতে পারে। যেমন- সোজা, বর্তুলাকার, আয়তকার ইত্যাদি। আর অনুমান করে একটা আকার যদি নির্ধারণ করে তবে সূত্র অনুযায়ী তা সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা ১/৩০ ভাগ। চাঁদের আলো নিয়ে কোন অনুমানিক সিদ্ধান্ত সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা ½ ভাগ অর্থাৎ ৫০% । আবার পৃথিবী সৃষ্টির উপাদান নিয়ে যদি অনুমান করা হয় তার যথার্থতার সম্ভাবনা ১/১০০০০ ভাগ। অতঃপর সামষ্টিকভাবে এই তিনটি আনুমানিক উত্তর সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা ১/৩০×½× ১/১০০০০ = ৬০০০০০ ভাগের ১ ভাগ বা .০১৭%। এভাবে 'সম্ভাবনার সূত্র' অনুযায়ী তিনটি বিষয়ের আনুমানিক উত্তর সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা যদি মাত্র .০১৭% হয় তবে সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় যে, কুরআনে বিজ্ঞান বিষয়ক যে হাজারটা বর্ণনা এসেছে তা 'অনুমান করে বলা' বা 'আন্দাজে বলা'র সম্ভাবনাও জিরো ভাগ। সুতরাং যদি প্রশ্ন করা হয়, কে এভাবে সুনিশ্চিত সত্য ও প্রামাণ্য তথ্য দিতে পারেন। নিঃসন্দেহে তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি এই পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন। আর তিনিই হচ্ছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যার পক্ষে এসব তথ্য দেওয়া সম্ভব। এভাবে তিনি অবিশ্বাসীদের নিকট বিভিন্নভাবে বিজ্ঞান ও যুক্তির আলোকে প্রমাণ দিয়েছেন যে, কুরআন আল্লাহ্র বাণী, তা রাসূল (ছাঃ)-এর প্রখর বুদ্ধিপ্রসূত (!) কিছু নয়।

সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ প্রসংগে :

'সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ' প্রসঙ্গে তিনি ২০০৬ সালে মুম্বাইতে একটি সেমিনার করেন। যেখানে ইন্ডিয়ার সুপ্রীম কোর্টের সাবেক বিচারপতি হজবার্ট সুরেশ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এবং বক্তব্য রাখেন। ৩ ঘণ্টার এই সেমিনারে তিনি ইতিহাস থেকে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধর্মের লোকদের হাতে ঘটে যাওয়া সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, পাশ্চাত্য মিডিয়া ও তাদের বুদ্ধিজীবীদের মাধ্যমে সর্বাধিক প্রচারিত যে মিথ অর্থাৎ 'সকল মুসলমান সন্ত্রাসী নয়, তবে সকল সন্ত্রাসী মুসলমান' তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মিথ্যাচার। তিনি বলেন যে, সন্ত্রাস যদি কোন ধর্মের বিশেষ করে ইসলামের 'সম্পদ' প্রচার করা হয় তবে বলতে হয় অন্য ধর্মের লোকেরা যুগে যুগে যে নৃশংস সন্ত্রাস চালিয়েছে তার তুলনায় মুসলমানরা নিতান্তই শিশুতুল্য।

তিনি বলেন, সন্ত্রাস কোন ধর্মের সম্পদ নয়, এটা হল রাজনীতিবিদদের পুঁজি। তারা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থে সন্ত্রাসকে সমাজের বুকে জিইয়ে রাখেন। যেভাবে ওসামা বিন লাদেন ৯/১১ হামলার জন্য দায়ী কি-না আজও তার কোন প্রমাণ নেই। এটা শুধুমাত্র হাইপোথেসিস। অথচ একেই উপলক্ষ করে আজ মুসলমানরা আক্রমণের লক্ষবস্তু হয়ে পড়েছে। আফগানিস্তান, ইরাকসহ অন্যান্য মুসলিম দেশে হাজার হাজার নীরিহ মানুষকে প্রতিনিয়ত হত্যা করা হচ্ছে। এসবের কারণ হয় সেটা ভোট ব্যাংকের জন্য অথবা ক্ষমতা ও শক্তিমত্তা প্রকাশের জন্য নতুবা অর্থের জন্য। এটা ওপেন সিক্রেট। কোন ঘটনা ঘটলেই আমেরিকা প্রমাণ ছাড়াই আল-কায়েদাকে ও ইন্ডিয়া লশকর-ই-তাইয়েবাকে দায়ী করে। এসব মূলত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিভিন্ন স্বার্থপ্রণোদিত 'পলিটিক্যাল গেম'। বৃটিশদের প্রবর্তিত 'divide & rule' পলিসিই এখন বর্তমান বিশ্বের নীতি। তিনি বলেন, সন্ত্রাসকে সংজ্ঞায়িত করতে গেলে ভৌগলিক বা ঐতিহাসিক দিক চিন্তা করতে হবে। কারণ আজকে যাকে অন্যরা সন্ত্রাসী বলছেন, আপনাদের কাছে সে মুক্তিযোদ্ধা, দেশপ্রেমিক! মূলত: পৃথিবী জুড়ে সন্ত্রাসের একমাত্র কারণ 'অবিচার'। অত্যাচারিত মানুষ যখন বিচার পায় না তখন সৃষ্ট ক্ষোভ থেকে অস্ত্র হাতে তুলে নেয়।[১০] তিনি বলেন, আমি এসব সন্ত্রাসীদের পক্ষাবলম্বন করছি না যেহেতু ইসলাম কখনো বলেনি নিরপরাধ-নীরিহ মানুষকে হত্যা করতে। সুতরাং এটাও অন্যায়। আর আমি বারবার বলি, অন্যায়ের বিচার কখনো অন্যায় দিয়ে করা যায় না। এতে কোনদিন সুবিচার আশা করা যায় না। নীরিহ মানুষ হত্যার পিছনে কোন যুক্তিই পাওয়া যাবে না। কিন্তু মোটের উপর এটা সত্য যে, সমস্ত সন্ত্রাসের কারণ তথা অবিচার বন্ধ না হলে এসব সন্ত্রাসী ঘটনা বন্ধ হবে না। যদি সন্ত্রাস বন্ধ করতে হয় তবে সর্বাগ্রে প্রয়োজন অবিচার-অত্যাচার দূর করা। কেননা এসব সন্ত্রাসীদের পক্ষে যুক্তি রয়েছে। তারা নিজেদের আত্মীয়-স্বজন, হাজার হাজার মানুষকে তারা নিহত হতে দেখেছে। অপরাধীরা তাদের সামনে ঘুরছে। কিন্তু তাদের কোন বিচার সমাজে হয় না। তাই তারা আইন হাতে তুলে নিয়েছে। আপনি এসব সন্ত্রাসীদের ন্যায়ানুগ শাস্তিবিধান করতে পারেন, কিন্তু তাদের যুক্তিকে অস্বীকার করতে পারেন না। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন, ২০০৬ সালের ১১ জুলাই বোম্বেতে একটি ট্রেনে ৭টি বোমা বিস্ফোরিত হয় যাতে মারা যায় ২০০-এর বেশী নীরিহ লোক, আহত হয় ৮০০-এরও বেশী লোক। সরকারের পক্ষ থেকে দাবী করা হয় এ ঘটনা ঘটিয়েছে লশকর-ই-তাইয়েবা, ২০০২ সালের ফেব্রুয়ারীতে গুজরাটের গণহত্যার প্রতিশোধ হিসাবে। এটা যদি সত্যি হয় তবে ঘটনা পরম্পরায় চিন্তা করুন এটা কি বন্ধ করা যেত না? সহজেই যেত। তবে এর জন্য দায়ী কে? (১) সেই রাজনীতিবিদরা যাদের প্লানে গুজরাটের গোধরাতে ট্রেনে আগুন ধরানো হয়েছিল। (২) কেন্দ্রীয় সরকার যারা এটা থামানোর সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তা করেনি দলীয় স্বার্থে। (৩) গুজরাটের সাধারণ জনগণ যারা উস্কানীপ্রাপ্ত হয়ে মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালিয়েছিল। (৪)

১০. অরুন্ধতী রায়ের ভাষায়- 'ভিকটিম যখন আর ভিকটিম হতে চায় না তখনই সন্ত্রাসের জন্ম নেয়।'

গুজরাটের পুলিশবাহিনী যারা এই তাণ্ডব না থামিয়ে নিষ্ক্রিয়ভাবে তা দেখছিল; বরং সন্ত্রাসীদের উল্টো সহযোগিতা করেছিল। (৫) গুজরাটের বিচারবিভাগ যারা এ ঘটনায় কোন ব্যবস্থা নেয়নি। (৬) সর্বশেষে যারা এই অন্যায়ভাবে প্রতিশোধ নিয়েছে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে। এরা সকলেই সমানভাবে দায়ী। তবে আমরা যদি প্রথমটি ঠেকাতে পারতাম তবে শেষোক্তগুলো ঘটার সুযোগ পেত না। তিনি বলেন, এসব ঘটনাকে কেন্দ্র করে আবার মুসলিম সাধারণ জনতার উপর চালানো হয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে চরম হয়রানী। বাড়ী বাড়ী তল্লাশী হয়। যদি বই পাওয়া যায় জিহাদের উপর। ব্যাস! সেটাই হল প্রমাণ। অথচ একই বই বাজারের বুকস্টলে বহু বছর ধরে পাওয়া যায়। যদি এগুলো সন্ত্রাসের কারণ হয় তবে এসব বুকস্টল কেন বন্ধ করা হচ্ছে না? আর তাই যদি হয় তবে তো কুরআন শরীফ থাকলেই সমস্ত মুসলিমকে গ্রেফতার করতে হয়। আমি বলি, দোষীদের শাস্তি প্রদান করুন, কোন সমস্যা নেই। কিন্তু দিনের পর দিন অজ্ঞাতস্থানে নীরিহ মানুষকে কেন আটকে রাখতে হবে? কেন তাদের অনেকের কাছ থেকে জোর করে সাদা কাগজে স্বাক্ষর নেয়া অথবা এমন বিষয়ে স্বীকৃতি নেয়া হচ্ছে যা তারা জানে না? এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুম্বাইতে সেমিনার হল। আমন্ত্রিত প্রাক্তন দু'জন পুলিশ অফিসার বললেন, পাকিস্তান ও ভারতের মাদ্রাসাগুলো এর জন্য দায়ী। জনৈক এ্যাডভোকেট তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, এমন একটি প্রমাণ কি আপনাদের হাতে আছে। তারা তা দিতে ব্যর্থ হলেন। এভাবেই চলছে মুসলিম জনসাধারণকে হয়রানী। এতে প্রকৃত অপরাধী ধরা পড়ুক বা না পড়ুক নীরিহ মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্টি করা হচ্ছে ভীতি আর ক্ষোভ। আর এসব কাজে মূলত ব্যবহার করা হয় মিডিয়াকে। বিশেষ করে রাজনীতিবীদদের নিয়ন্ত্রিত মিডিয়া যারা এক নিমিষেই সাদাকে কালো আর কালোকে সাদা, হিরোকে জিরো আর জিরোকে হিরো করতে অভ্যস্ত। এদের থেকে সাবধান থাকতে হবে।

তিনি বলেন, অনেক মুসলমান সংশয়-দ্বিধা নিয়ে বলে আমি মৌলবাদী নই, চরমপন্থী নই। আমি বলি, একজন মৌলবাদী হিসাবে আমি গর্বিত। কেননা আমি ইসলামের যাবতীয় মৌলিক নীতিমালাকে মেনে চলার চেষ্টা করি। একজন চরমপন্থী হওয়া অন্যায় কিছু নয়। কেউ কি আমাকে বলতে পারবেন একজন চরম সৎ, একজন চরম ন্যায়পরায়ণ, চরম দয়ালু, চরম ক্ষমাশীল হওয়া অন্যায়? বরং এসব ক্ষেত্রে চরমপন্থী হওয়াটাই কুরআনের নির্দেশ। কারণ আংশিক বা সুবিধামত নীতি মেনে চলা এটা ইসলামের নীতি নয়। আল্লাহ বলেছেন 'তোমরা ইসলামের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে প্রবেশ কর'। এভাবে আমাদেরকে বাজে মন্তব্য-আলোচনার টেবিল উল্টে দিতে হবে।

তিনি বলেন, আমাদের মুসলমানদের উচিৎ ভয় না পেয়ে সত্য প্রকাশে সাহসী হওয়া। তবে সেটাও হতে হবে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে ও জ্ঞানের সাথে। যেভাবে এসেছে সূরা নাহালের ১২৫ নং আয়াতে। অন্যান্য সময়ের মত এখানেও তাঁর বক্তব্য শেষ করেন Dr. Joseph Adam Pearson-এর একটি উক্তি দিয়ে, 'People who worry that nuclear weaponry will one day fall in the hands of the Arabs, fail to realize that the Islamic bomb has been dropped already, it fell the day MUHAMMED (pbuh) was born' অর্থাৎ 'লোকেরা যারা আশংকা করে যে, পরমাণু বোমা একদিন আরবদের হস্তগত হবে, তারা আসলে বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে যে, ইসলামিক বোমা অনেক আগেই পৃথিবীতে পড়েছে, আর এটা সেদিনই যেদিন মুহাম্মাদ (ছাঃ) জন্মগ্রহণ করেছেন'।

তাঁর লিখিত বই ও অন্যান্য প্রকাশনা :

তাঁর লেকচারের উপর ভিত্তি করে কয়েকটি বই যেমন- 'প্রধান প্রধান ধর্ম সমূহে আল্লাহ্র ধারণা', 'কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান- সামঞ্জস্যপূর্ণ না অসামঞ্জস্যপূর্ণ?', 'ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের সচরাচরকৃত প্রশ্নসমূহের জবাব', 'ইসলাম ও সন্ত্রাসবাদ', 'সন্ত্রাসবাদ ও জিহাদ', 'ইসলামে নারী অধিকার- সংরক্ষিত না নিগৃহীত?', 'আল-কুরআন- পাঠের সাথে সাথে অনুধাবন করা কি উচিৎ?', 'কুরআন কি আল্লাহ্র বাণী?','বিজ্ঞানের আলোকে বাইবেল ও কুরআন', 'সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' প্রভৃতি শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। যার প্রায় সবগুলোই বাংলাভাষায় অনূদিত হয়েছে। এছাড়া তাঁর বিষয়ভিত্তিক ভিডিও ও অডিও লেকচারের শতাধিক সিডি, ডিভিডি 'আইআরএফ' সহ বিভিন্ন সংস্থা থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। বাংলাদেশে 'ইসলামিক টিভি' চ্যানেলের সৌজন্যে বাংলা ভাষায় ডাবিংকৃত ভিডিও লেকচারও প্রকাশিত হয়েছে।

এভাবে তিনি অব্যাহত গতিতে সফলভাবে ও নিষ্ঠার সাথে তাঁর কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে চলেছেন। সারাবিশ্বে সৃষ্টি হয়েছে তাঁর লক্ষ-কোটি অনুরক্ত। বহু মানুষ তাঁর দাওয়াতের মাধ্যমে ইসলামের সত্যতা অনুভব করে ইসলাম গ্রহণ করছেন। শুধু তা-ই নয় তাঁর দা'ওয়াতী পদ্ধতি অনুসরণ করে বিশ্বের আনাচে-কানাচে মুসলিম সমাজেও সৃষ্টি হচ্ছে দক্ষ, প্রজ্ঞাবান দাঈ ইলাল্লাহ। আমাদের দেশে সামাজিক অবক্ষয়ের এই চরম অবস্থাতেও গত কয়েক বছরে বিশেষত তরুণ সমাজে ইসলামের প্রতি সচেতনতা সৃষ্টির হার যে বেশ আকারে বৃদ্ধি পেয়েছে, তার পিছনে জাকির নায়েকদের অবদান কম নয়।

সমালোচনা :

ডা. নায়েকের গুণগ্রাহীদের মত তাঁর সমালোচকের সংখ্যাও কম নয়। অমুসলিমরা ছাড়াও মুসলমানদের মধ্য থেকেও তার সমালোচক প্রচুর।

তথাকথিত উদারপন্থীরা তাকে খুব গোঁড়াপন্থী, অন্যদিকে অনেক আলেম তাঁকে শিথিলপন্থী বলে সমালোচনা করেছেন। আবার অনেকে তাঁর তুলনামূলক দাওয়াতী পদ্ধতিকেই ভুল মনে করেন। স্বঘোষিত মুরতাদ আলী সিনা[১১] তাঁকে 'শ্যোম্যান' বলে হেয় করতে চেয়েছে। ইন্ডিয়ান লেখক খুশওয়ান্ত সিং জাকির নায়েকের দেয়া বক্তব্য ও যুক্তিসমূহকে 'বালসুলভ' বলে আখ্যা দিয়েছেন। তার মতে, ডা. নায়েক সস্তা যুক্তি উপস্থাপন করে মানুষকে আকৃষ্ট করতে পারলেও এতে মুসলমানদের পশ্চাদপদ হওয়ার পথই অবারিত হচ্ছে। দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে ২০০৮ সালের আগষ্ট মাসে ডা. নায়েকের বিরুদ্ধে এক ফৎওয়ায় বলা হয়, 'জাকির নায়েকের বক্তব্যে এটা সুস্পষ্ট যে তিনি একজন গায়রে মুকাল্লিদের প্রচারক। সুতরাং তাঁর কোন বক্তব্যের উপর নির্ভর করা উচিৎ হবে না।' হোসাইন (রাঃ)-এর শাহাদাতের ঘটনায় ইয়াযীদকে দোষারোপ না করায় তাঁকে 'কাফের' ফৎওয়া দেয়া হয়েছে। এছাড়া ছূফী ও পীরপন্থী বিভিন্ন সংগঠন তাঁর ঘোর বিরোধিতা করে আসছে। তবে ডা. নায়েক এ ব্যাপারে বলেন, তাঁর বিরুদ্ধে এসব ফৎওয়া গুরুত্বহীন। কেননা তাদের বরং ইমাম বুখারীর বিরুদ্ধেই ফৎওয়া জারী করা উচিৎ। ইসলাম সম্পর্কে সীমিত জ্ঞানের অধিকারী কিছু আলেম এসব ফৎওয়া দিচ্ছেন। এর কোন প্রভাব তাঁর উপর পড়বে না।'

সম্প্রতি তিনি তাঁর আসন্ন বৃটেন ও কানাডা সফরে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছেন। পূর্বনির্ধারিত প্রোগ্রাম অনুযায়ী ১৮ জুন বৃটেন যাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণের প্রাক্কালে ১৭ জুন বৃটিশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা জারির পত্রটি তাঁর হস্তগত হয়। একই সাথে ড. আবু আমিনা বিলাল ফিলিপসকেও বৃটিশ ভিসা দেওয়া হয়নি। বৃটিশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তেরেসা মে ১৬ জুন এই নিষেধাজ্ঞা জারীর পর বলেন, 'বৃটিশ নাগরিকদের জন্য কল্যাণকর নয় এমন কিছু পরিচালনার সুযোগ আমি দিতে পারি না। ডা. নায়েকের বিভিন্ন মন্তব্যে আমার কাছে এটাই প্রতীয়মান হয়েছে যে, তাঁর আচরণ অগ্রহণযোগ্য।' তাঁর বিভিন্ন সময় প্রদত্ত বক্তব্য থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি হল- ১. তিনি মুরতাদদের হত্যা করার বিধানকে সমর্থন করেন। ২. তিনি বলেছেন, '..যদি ওসামা বিন লাদেন মুসলমানদের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন, তাহলে আমি তার সাথে আছি', '..তিনি যদি কোন সন্ত্রাসীকে ভয় দেখান, তিনি যদি আমেরিকার মত সর্ববৃহৎ সন্ত্রাসী রাষ্ট্রের প্রতি ভীতি প্রদর্শন করেন, তবে আমি তার সাথে রয়েছি..', '...প্রত্যেক মুসলিমেরই সন্ত্রাসী হওয়া উচিৎ...'। ৩. স্ত্রীকে হালকাভাবে প্রহার করার বৈধতা পুরুষের রয়েছে- এমন কথা বলা। ৪. সমকামিতার শাস্তি হিসাবে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া। ৫. স্বল্প পোষাক পরিধানের মাধ্যমে পশ্চিমা মহিলারা নিজেদের ধর্ষিত হওয়ার সুযোগ দিচ্ছেন-এমন মন্তব্য করা) উল্লেখ করে তাঁর বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদ উস্কে দেওয়ার অভিযোগ দেয়া হয়েছে। ডা. জাকির নায়েক এ অভিযোগকে অপ্রাসঙ্গিক আখ্যা দিয়ে বলেন, স্থানীয় মিডিয়া ও রাজনৈতিক গোষ্ঠীর চাপে তাঁর বক্তব্যের অপব্যাখ্যা করে তাঁর ভিসা বাতিল করা হয়েছে। তিনি বৃটিশ হাইকোর্টে এর বিরুদ্ধে আপীল করেছেন এবং এ ব্যাপারে ইন্ডিয়া সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। উল্লেখ্য, সিঙ্গাপুর, মালদ্বীপ ও শ্রীলংকায় টানা সফর করার পর বৃটেনে ২৭-২৯ জুন এবং কানাডায় ২-৪ জুলাই তাঁর প্রোগাম ছিল। বৃটিশ সরকারের দেখাদেখি কানাডা সরকারও তাঁর প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি করে। কানাডার টরেন্টোতে অনুষ্ঠিতব্য 'ফেইথ কনফারেন্স'টি আয়োজকদের বর্ণনা মতে উত্তর আমেরিকার ইতিহাসে সর্ববৃহৎ আয়োজন ছিল। এদিকে মুসলিম কানাডিয়ান কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা তারেক ফাতাহ কানাডা সরকারের এই সিদ্ধান্তে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, 'আমরা খুবই খুশী যে সরকার ডা. নায়েকের মন্তব্যগুলো সচেতনভাবেই লক্ষ্য করেছে এবং এরূপ একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে'। তারেক ফাতাহ একজন মডারেট ও মুসলিমদের পক্ষে কানাডা সরকারের লবিস্ট হিসাবে পরিচিত। তিনি সম্প্রতি জাকির নায়েকের মন্তব্য সমূহ উদ্ধৃত করে ফেডারেল এমপিদের কাছে তাঁর বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক অনেকগুলি ই-মেইল বার্তা প্রেরণ করেন।

শেষকথা : পরিশেষে বলতে হয়, পৃথিবী জুড়ে ইসলাম যেন আজ বড় অসহায়ত্বের শিকার। পাশ্চাত্য বিশ্বের সর্বাত্মক আক্রমণ ও ষড়যন্ত্রে দিশাহারা মুসলিম বিশ্ব একদিকে যেমন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অঙ্গনে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে, অন্যদিকে স্বয়ং মুসলমানদেরই অব্যাহত কাটা-ছেঁড়ায়, যোজন-বিয়োজনে রুগ্ন ইসলাম যেন অন্যের দ্বারে দ্বারে হাত পেতে বেড়াচ্ছে। নীতিহারা মুসলমানদের অপরিণামদর্শী কর্মকাণ্ডে খোদ ইসলাম যেন আজ 'ধর্মান্তরিত' হয়ে পড়েছে। ফলে ইসলামের বিশ্বজনীন জীবন ব্যবস্থাপনা আজ তথাকথিত আধুনিক বিশ্বে সত্যি সত্যিই অচল, সেকেলে (!) পরিণত। ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত মুসলিম চিত্তমানসে এই অন্ধকার যখন দিন দিন ঘনীভূত হচ্ছে তখন ডা. জাকির নায়েকদের মত সুস্থ আক্বীদা ও চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বদের বলিষ্ঠ আত্মপ্রকাশ সত্যিই আশাব্যঞ্জক। ইতিমধ্যে ৪৫ বছর বয়সী এই ব্যক্তি যা কিছু করেছেন তা এককথায় বর্ণনাতীত। দীর্ঘদিন যাবৎ মুসলিম বিশ্ব চেতনাদৃপ্ত সাহসী একটি নেতৃত্বের অভাবে হাহাকার করছে; যে নেতৃত্ব জাতিগত বেষ্টনী অতিক্রম করে বৈশ্বিক নেতৃত্বের সঞ্চার করবে। অন্যায়, অবিচার, প্রহসন, মিথ্যা, ভ্রান্ত বিশ্বাস ও কুসংস্কারের মায়া-মরিচিকাপূর্ণ তিমিরজঞ্জাল ছিন্ন করে সারাবিশ্বের মানুষকে একক স্রষ্টার সুমহান মর্যাদাপূর্ণ পতাকাতলে সমবেত করার প্রচেষ্টা চালাবে। বলা বাহুল্য, এই আহ্বান জানানোর নৈতিক হিম্মতটুকুও যেন দুর্বল চেতনাসম্পন্ন মুসলিম সমাজ এখন হারিয়ে ফেলছে। ডা. জাকির নায়েকদের প্রয়াস তাই আমাদের আশান্বিত করে, বুকে বল নিয়ে আসে, দিগন্তপ্রান্তে নবারুণের স্বপ্ন জাগায়। মহান আল্লাহ তাঁর প্রচেষ্টাকে বরকতমণ্ডিত করুন এবং তাঁদের কর্মতৎপরতার মাধ্যমে বিশ্ববাসীর দুয়ারে ইসলামের সেই সুমহান আদর্শ ও জীবন বিধান আলোকোজ্জ্বল, মহিমামণ্ডিত হয়ে উঠুক প্রতিনিয়ত। আমীন!!

---

১১. ইরানের এই শী'আ লোকটি স্বীয় ধর্ম পরিত্যাগ করে বর্তমানে কানাডায় বসবাস করছে। রাসূল (ছাঃ)-কে সন্ত্রাসের নায়ক ও ইসলামকে সন্ত্রাসের ধর্ম চিহ্নিত করে পৃথিবী থেকে এর অনুসারীদের শিকড় উপড়ে ফেলার মিশন নিয়ে সে ২০০৫ সালে একটি ওয়েবসাইট *www.faithfreedom.com* চালু করে। ইসলামের বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্বেষ ছড়ানোয় সউদী আরবসহ কয়েকটি মুসলিম দেশে এই ওয়েবসাইটটি নিষিদ্ধ। নীতিগতভাবে সকল ধর্মের বিদ্বেষী হলেও যথারীতি ইসলামই তার ও তার অনুসারীদের একমাত্র টার্গেট। সে গর্বভরে নিজেকে 'এক্স মুসলিম' পরিচয় দেয় এবং 'এক্স মুসলিমস্' নামে মুরতাদদের জন্য একটি ফোরাম গঠন করেছে।

শায়খ আলবানী (রহঃ)-এর অছিয়ত ও নছীহত

অনুবাদ : নূরুল ইসলাম

ক. সকল মুসলিমের প্রতি অছিয়ত :

পৃথিবীর প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তি বিশেষ করে সালাফে ছালেহীনের অনুসৃত নীতি-পদ্ধতির উপর ভিত্তিশীল দাওয়াতে অর্থাৎ পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্র বরকতমণ্ডিত দাওয়াতে শরীক আমাদের ভাইগণকে ও আমি নিজেকে প্রথমত আল্লাহভীতি অর্জনের অছিয়ত করছি। অতঃপর উপকারী জ্ঞান অধিকহারে অর্জনের অছিয়ত করছি। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ 'তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। আর তিনিই তোমাদেরকে শিক্ষা দান করেন...' *(বাক্বারাহ ২/২৮২)*।

আমি আরও অছিয়ত করছি আমাদের নিকট সংরক্ষিত সেই বিশুদ্ধ জ্ঞান সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য, যা কোনক্রমেই পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্ এবং সালাফে ছালেহীনের মানহাজ থেকে বহির্ভূত নয়। আমি অছিয়ত করছি যেন তারা এই ইলমকে সাধ্যমত বৃদ্ধি করার সাথে সাথে তার সঙ্গে আমলকে সম্পৃক্ত করেন। যাতে এই ইলম তাদের বিরুদ্ধে দলীল না হয়; বরং তাদের পক্ষে সেদিন দলীল হিসাবে গৃহীত হয় 'যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না, কিন্তু যে সরল অন্তর নিয়ে আল্লাহ্র কাছে আসবে সে ব্যতীত' *(শু'আরা ২৬/৮৮-৮৯)*। অতঃপর আমি তাদেরকে সতর্ক করছি সে সমস্ত লোকের সংস্পর্শ হতে বেঁচে থাকার জন্য যারা সালাফী পথ থেকে অনেক অনেক বিষয়ে বিচ্যুত হয়েছে। যার সমষ্টি হল, মুসলমানদের বিরুদ্ধে ও তাদের জামা'আত সমূহের বিরুদ্ধে বহির্গত হওয়া। আমরা তাদেরকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী এই নির্দেশই দিব যে, وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا 'তোমরা আল্লাহ্র বান্দা হিসাবে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও' (*মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫০২৮*)।

আমাদের কর্তব্য হল, আমাদের দাওয়াতের বিরোধীদের ব্যাপারে নম্রতা অবলম্বন করা এবং সর্বদা আল্লাহ্র নিম্নোক্ত বাণীকে স্মরণ করা। মহান আল্লাহ বলেন, اُدْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ 'আপনার পালনকর্তার পথের প্রতি আহ্বান করুন প্রজ্ঞার সাথে ও উত্তম উপদেশ শুনিয়ে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন উত্তম পন্থায়' *(নাহল ১৬/১২৫)*।

এই হিকমত বা প্রজ্ঞা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম হক্বদার ব্যক্তি সেই, যে আমাদের মূলনীতি ও আক্বীদার সর্বাধিক বিরোধী। যাতে আমাদেরকে একই সাথে হক্বের দাওয়াত প্রচারের দায়িত্বভার এবং অন্যদিকে খারাপ আচরণের বোঝা বহন করতে না হয়।

সুতরাং প্রত্যেক মুসলিম দেশের ভাইদের প্রতি আমাদের একান্ত অনুরোধ তারা যেন এসকল ইসলামী শিষ্টাচার পালন করেন। আর এর পিছনে তাদের উদ্দেশ্য যেন হয় একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন; মানুষের প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা প্রাপ্তি নয়। সম্ভবত এতটুকুই যথেষ্ট। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক।

খ. ছাত্রদের প্রতি নছীহত :

ফিকহ গ্রন্থাবলীর মধ্যে শায়খ সাইয়িদ সাবিক রচিত 'ফিকহুস সুন্নাহ' গ্রন্থ অধ্যয়নের জন্য আমি ছাত্রদেরকে নছীহত করছি। এক্ষেত্রে অন্যান্য সহায়ক গ্রন্থ যেমন 'সুবুলুস সালাম'-এর সহযোগিতা নিবে। আর যদি 'তামামুল মিন্নাহ্'র প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তাহলে এটি তাদের জন্য বেশী কার্যকরী হবে। অনুরূপভাবে আমি তাদেরকে নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী রচিত 'আর-রাওযাতুন নাদিইয়াহ' পড়ার জন্যও নছীহত করছি।

তাফসীর গ্রন্থাবলীর মধ্যে হাফেয ইবনু কাছীর রচিত 'তাফসীরুল কুরআনিল আযীম' পড়তে অভ্যস্ত হওয়া ছাত্রদের উচিত। কোন কোন ক্ষেত্রে এতে বিস্তৃত আলোচনা থাকলেও বর্তমানে এটি সবচেয়ে বিশুদ্ধ তাফসীর। আর মনগলানো উপদেশমালার জন্য ইমাম নববীর 'রিয়াযুছ ছালেহীন' পড়া কর্তব্য।

আক্বীদার ক্ষেত্রে ইবনু আবিল ইযয হানাফীর 'শারহুল আকীদা আত-তাহাবিয়্যাহ' পড়ার জন্য আমি তাদেরকে নছীহত করছি। এটি অধ্যয়ন করতে গিয়ে আমার টীকা-টিপ্পনী ও ব্যাখ্যার সাহায্য নিবে। অতঃপর তারা শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ ও তদীয় ছাত্র ইবনুল কাইয়িম আল-জাওযিয়্যাহ (রহঃ)-এর রচনাবলী পড়বে। কেননা আমার বিশ্বাস মতে তাঁরা দু'জন ঐ সকল বিরল আলেমদের অন্যতম, যারা তাক্বওয়া ও বিশ্বস্ততার সাথে তাদের ফিকহে সালাফে ছালেহীনের নীতি-পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন।

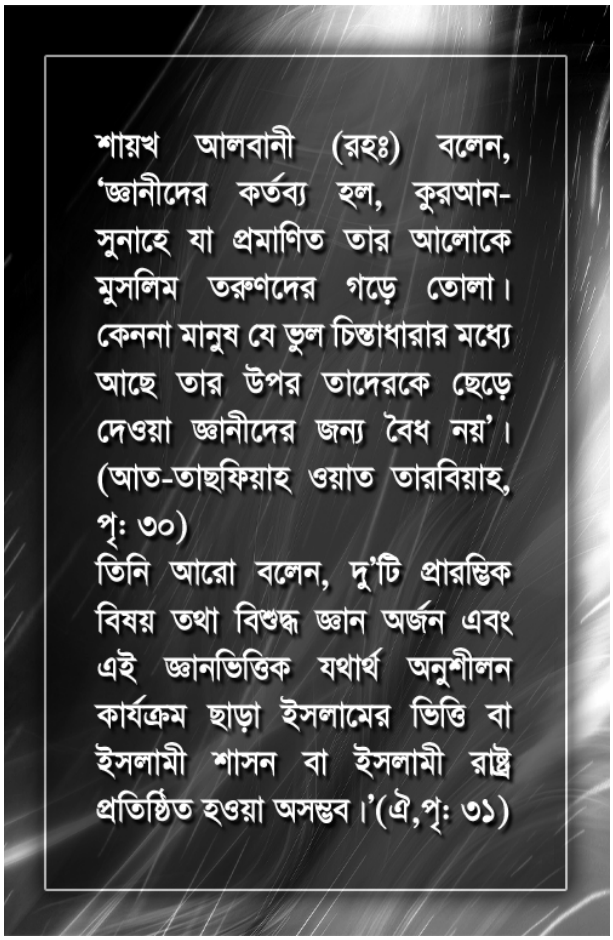

সাক্ষাৎকার

['বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের এই স্মৃতিচারণমূলক সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন 'তাওহীদের ডাক'-এর পক্ষ থেকে মুযাফফর বিন মুহসিন ও নূরুল ইসলাম]

(৩য় পর্ব)

(৭) নওগাঁ, জোকাহাট : ১৯৮১ সালের সম্ভবত ৪ জানুয়ারী। ড. রহমানী, ড. মুজিবুর রহমান ও মাওলানা আব্দুল মতিন কাসেমীসহ আমরা আত্রাই থেকে নৌকাযোগে জোকাহাট যাচ্ছি। ট্রেন লেইট থাকায় আত্রাই স্টেশনে পৌঁছতে এবং নৌকায় যেতে গিয়ে সম্মেলনস্থলে পৌঁছতে আমাদের রাত হয়ে গেল। ঘাটে নৌকা ভিড়তেই মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন ফযল সাহেবের দরাজ গলার বক্তৃতা কানে এলো। ভাষণের শেষদিকে উনি তখন বলছেন, 'আমি আজ উনিশটি বছর বাংলার আনাচে কানাচে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বক্তৃতা করে ফিরছি। জানি না আমার বক্তব্য শুনে ১৯ বছরে ১৯ জন বেনামাজী ছেলে নামাযী হয়েছে কি-না। কিন্তু 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র গত তিন বছরের তৎপরতায় ইতিমধ্যে বহু তরুণ নামাযী হয়েছে, সৎচরিত্রবান ও সমাজসচেতন হয়েছে। অতএব হে তরুণ সমাজ! তোমরা সবাই 'যুবসংঘে' যোগদান কর। আমাদের ভাই গালেব ছাহেব আসছেন, তোমরা তার কাছে সবকিছু জেনে নিবে।' অতঃপর বক্তব্য শেষ করে ট্রেন ধরার জন্য তিনি বেরিয়ে গেলেন। আমরা খানিকবাদেই পৌঁছলাম। কিন্তু ওনার সাথে দেখা হল না। উনি পোষ্টারে নাম দেখে আমাদের কথা উল্লেখ করছিলেন, কিন্তু আমরা যে উপস্থিত হয়ে গেছি-তা উনি জানতেন না। আমাদের অনুপস্থিতিতে তাঁর এই নির্দেশনা আমাদের জন্য আন্তরিক দো'আ হিসাবে গ্রহণ করি। আজকে বেঁচে থাকলে তিনি না জানি কত খুশী হতেন!

(৮) নামো শংকরবাটি, চাঁপাই নবাবগঞ্জ : ১৯৮৫ সালের শীতকাল। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এখানকার প্রায় ৪৬ বছরের প্রাচীন হেফযুল উলুম টাইটেল মাদরাসার বার্ষিক সমাবেশের দ্বিতীয় দিনে আমি আমন্ত্রিত হয়েছি। বেশ রাত হলে আমি বক্তব্য দিতে উঠি। মনে পড়ে, আড়াই ঘণ্টার ভাষণের শেষদিকে সেদিন বলেছিলাম, এ মাদরাসার দীর্ঘ ৪৬ বছরে ৪৬ জন যোগ্য আলিম ও মুহাদ্দিছ কেন তৈরী হল না-এ দুর্ভাগ্যের কারণ ও সমাধান কি, নেতৃবৃন্দ সে বিষয়ে কখনো চিন্তা করেছেন কি? অতঃপর এর সমাধান বিষয়ে অনেক কথা সেদিন বলেছিলাম। বক্তব্য শেষে বিশ্রামস্থলের দিকে পা বাড়াতেই স্থানীয় খ্যাতনামা আলেম, মুনাযির ও বাগ্মী মাওলানা মুহাম্মাদ হোসায়েন মওড়ী পথ আগলে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, আমি বক্তাদের ওয়ায বেশীক্ষণ শুনতে পারি না। কিন্তু আজ চলে যেতে পারলাম না। প্যান্ডেলের বাইরে প্রচণ্ড ঠান্ডায় এক ঠায় দাঁড়িয়ে শেষ পর্যন্ত আপনার বক্তব্য শুনেছি। আপনি যা বলেছেন তার সাথে আমি শতভাগ একমত। আল্লাহ আপনার হায়াত দারায করুন...। একইভাবে তিনি আবেগ প্রকাশ করেছিলেন ১৯৯২ সালে গাইবান্ধার জান্নাতপুর মাদরাসার বার্ষিক জালসায় আমার বক্তব্যের পর, যখন তিনি সেখানে শিক্ষক ছিলেন।

(৯) চকউলি, নওগাঁ : ১৯৮৫ সালের সম্ভবতঃ ৫ ও ৬ নভেম্বর। মান্দা থানাধীন চকউলি হাইস্কুল প্রাঙ্গনে দু'দিনব্যাপী ইসলামী সম্মেলন। ড. আব্দুল বারী, আবু তাহের বর্ধমানী, আব্দুর রঊফ, আব্দুল মতীন সালাফী, আব্দুছ ছামাদ সালাফী ও আমিসহ আরও অনেকে। সম্মেলনের কয়েকদিন পূর্বে 'মান্দা এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে' শিরোনামে পর পর দু'টো পত্র এলো আমার কাছে অনেকের স্বাক্ষর সহকারে। সারমর্ম এই যে, 'যদি আপনারা এখানে আসেন তাহলে বৃহত্তর হানাফী সমাজের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমরা সম্মেলন রুখে দেব'। এছাড়া হুমকিমূলক আরো অনেক বাজে কথা। এসবের কোন তোয়াক্কা না করে আমরা রাজশাহী থেকে নাটোর গেলাম। ওখান থেকে ড. আব্দুল বারী, আব্দুল মতীনসহ একত্রে ট্রেনে সান্তাহার নামলাম। সম্মেলনস্থলে যেয়ে দেখি বিশাল আয়োজন। লোকে লোকারণ্য। কোথায় কে বাধা দেবে? আসলে চিঠিতে হুমকি পাঠিয়ে আমাদের আতঙ্কিত করতে চেয়েছিল বিরোধীপক্ষ। প্রথমদিন অসুস্থতার কারণে বক্তৃতা করতে পারলাম না। পরদিন পেটের পীড়া আরো মারাত্মক আকার ধারণ করলে অনেকগুলো ট্যাবলেট-ক্যাপসুল খেয়ে মঞ্চে গিয়ে বসলাম। গিয়ে দেখি হুমকিদাতাদের প্রধান ব্যক্তি মঞ্চে বসে আছে। আমাকে দেখে ছোট্ট করে সালাম দিল। আমিও আগের ঘটনা না জানার ভঙ্গিতে উত্তর দিলাম। অতঃপর ক্লান্ত, অবসন্ন দেহে বসে বসে বক্তৃতা করলাম। সেদিনের আড়াই ঘণ্টার ভাষণ ছিল আমার জীবনের অন্যতম স্মরণীয় ভাষণ। সম্মেলনস্থলকে পুরা দেশ এবং স্টেজে বসা মেহমানদেরকে সরকারের সাথে তুলনা করে সেদিন ইসলামী রাষ্ট্রের রূপরেখা তুলে ধরেছিলাম। অতঃপর এ দেশ ধর্মনিরপেক্ষ মতে চলবে, না ইসলামী বিধান অনুযায়ী চলবে। ইসলামের নামে প্রচলিত মাযহাবী ফিকহের উপর চলবে, না ছহীহ হাদীছের বিধান অনুযায়ী চলবে- এর উপর ভোটাভুটি করি। গগণবিদারী আওয়াযে উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থায় ইসলাম ও ছহীহ হাদীছের বিধানের পক্ষে দৃপ্ত কণ্ঠে শ্লোগান তুলে বলেছিল, 'কুরআন-হাদীছ যেখানে, আমরা আছি সেখানে'। 'কুরআন-হাদীছ ছাড়া অন্য কিছু মানি না, মানব না'। বস্তুত এ শ্লোগানটি সেদিন আমাদের জনসভায় প্রথম উচ্চারিত হয়। যদিও এ পথ শুধু শ্লোগানের নয়, এ পথ বহু সংগ্রামের, বহু ত্যাগ ও তিতিক্ষার। তবুও জনগণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি এবং আগামী দিনে এর পক্ষে সুদৃঢ় আন্দোলনের স্থায়ী প্লাটফরম সৃষ্টির প্রচেষ্টায় সামান্য হলেও অগ্রসর হতে হয়ত পেরেছি, এ অনুভূতি নিয়ে সেদিন নওগাঁ থেকে ফিরেছিলাম।

(১০) হারাগাছ, রংপুর : সম্ভবতঃ ১৯৮৫ সালেই হবে। হারাগাছ ইসলামী সম্মেলনে ড. আব্দুল বারী, সাথে আমি ও অন্যান্য বক্তাগণ আছেন। তামাক অধ্যুষিত এলাকা এবং বিড়ি ফ্যাক্টরীতে ভরা পৌর শহর। এইদিন আমি ওঠার আগেই স্থানীয় বিড়ি ফ্যাক্টরীর মালিকদের পক্ষ থেকে আয়োজক কমিটির মাধ্যমে আমাকে অনুরোধ করা হয় যেন আমি তামাকের বিরুদ্ধে কিছু না বলি। বড়ই মুশকিলের কথা। যাইহোক আমি মূল ভাষণ শুরু করেই বললাম, তামাক যে

মাদকদ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত এবং সে কারণে তামাক-বিড়ি-জর্দা ইত্যাদি যে স্পষ্টভাবে হারাম, তা আমি আজকের সভায় বলব না। সুযোগ পেলে অন্যদিন এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।' এই বলে বক্তব্যের মূল বিষয়বস্তুতে চলে গেলাম। শ্রোতারা যা বোঝার বুঝে ফেলে মুখ টিপে হাসল। এইদিন বক্তব্যের পর প্রশ্নোত্তর ও সাময়িক এক উত্তেজনা প্রশমনের জন্য সভাপতি ড. আব্দুল বারী ছাহেবের নির্দেশে আমি আরো দু'বার বক্তৃতা করতে বাধ্য হই।

(১১) বগুড়া শহর : ১৯৮৬ সালে বগুড়া শহরের প্রাণকেন্দ্র আলতাফুন্নেছা খেলার মাঠে যেলা জমঈয়তে আহলেহাদীসের বার্ষিক কনফারেন্স। পাশেই হানাফীদের নামকরা প্রতিষ্ঠান জামীল মাদরাসা। তাদের অপচেষ্টায় সম্মেলন বন্ধের জন্য সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ডিসি শহীদুল আলম ড. আব্দুল বারী ছাহেবকে না আসার জন্য বলেছেন বলে শুনলাম। যথাসময়ে আমরা ফাৎহ আলী ব্রীজ সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে পৌঁছলাম। অবস্থা যা শুনলাম, রীতিমত তুলকালাম কাণ্ড। আমাদের মাইকিং-এ বাধা দিয়ে পাল্টা মাইকিং করা হচ্ছে সমাবেশের বিরুদ্ধে। এমতাবস্থায় স্থানীয় জমঈয়ত নেতৃবৃন্দ ভরসা পাচ্ছেন না। মাওলানা আবু তাহের বর্ধমানী বগুড়ায় নেমেই আবার ফিরে গেছেন। মাওলানা মতিউর রহমান রংপুরী বগুড়া রেলস্টেশনে নেমে ছদ্মবেশে কোনমতে এসেছেন। ড. আব্দুল বারী ও আমি হোটেলকক্ষে একান্তে বসলাম। বললাম, স্যার! যদি আমরা সম্মেলন না করে চলে যাই, তাহলে বগুড়ায় আহলেহাদীছদের জন্য চরম বিপর্যয়কর পরিবেশের সৃষ্টি হবে। কেউ না যাক, আপনাকে ও আমাকে যেতেই হবে। চলুন, আল্লাহ ভরসা। উনি রাযী হলেন। 'যুবসংঘ'-এর ছেলেদের পাহারায় আমাদের জীপ সমাবেশস্থলে পৌঁছলো। অনেক কষ্টে ভিড় ঠেলে মঞ্চে উঠলাম। এমন পরিবেশেও লোকজনের বিপুল উপস্থিতি দেখে আনন্দে আমার বুক ভরে উঠল। মঞ্চে উঠেই ইশারায় শ্রোতাদেরকে কোনরূপ শ্লোগান দিতে নিষেধ করলাম। পরিস্থিতি বুঝে সভার শুরুতেই সভাপতি ড. আব্দুল বারী উদ্বোধনী ভাষণ দিতে গিয়ে দূরদর্শিতার সাথে বললেন, আজকে আমাদের অনেক বক্তা আছেন। কিন্তু সবাইকে সময় দেয়া যাবে না। কেবলমাত্র আসাদুল্লাহ আল-গালিব বক্তৃতা করবে। এত দ্রুত উঠার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। মনে পড়ে রাজশাহী সাহেব বাজারের হকার্স মার্কেট থেকে কেনা ১২০ টাকা দামের উলেন চাদরটি তখন আমার গায়ে জড়ানো। এ অবস্থাতেই উঠলাম। হামদ ও ছানা শেষে আপনা থেকেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, ওয়া মান আহসানু ক্বাওলাম মিম্মান...সূরা হা-মীম সাজদার ৩৩ নং আয়াতটি। ইতিপূর্বে এই আয়াতের ভিত্তিতে আমি কোথাও কোন বক্তৃতা করিনি। আয়াত শেষ করতেই ময়দানের পাশ থেকে হানাফী মসজিদের মাইক থেকে বলা হল, 'আপনারা সভা বন্ধ করুন- আমরা এখন এশার নামায পড়ব।' আযান শুরু হয়ে গেল। আমি সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বললাম, 'আপনারা ওযু না থাকলে তায়াম্মুম করে নিজ নিজ জায়গায় দাঁড়িয়ে যান, আমরাও এশার জামা'আত করব।' জনতা উঠে কাতারবন্দী হয়ে গেল। ড. আব্দুল বারী বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। আমি বললাম, 'স্যার দো'আ করুন! সভা এখন আমার হাতে।' অতঃপর জামা'আতসহ এশার ছালাত আদায় করে নিলাম। তারপর ভাষণ শুরু করলাম। ৪৫ মিনিটের ভাষণে আহলেহাদীছ আন্দোলনের দাওয়াত যে মূল ইসলামের দাওয়াত এবং তা যে সকল মানুষের চিরন্তন কল্যাণের জন্য-সেটা আমার বক্তব্যে জোর দিয়ে তুলে ধরলাম। ভাষণ শেষ করতেই জনাব ড. আব্দুল বারী উঠে দাঁড়ালেন। অতঃপর মিনিট দশেকের মধ্যে সভাপতির ভাষণ শেষ করে বগুড়ার স্থানীয় অন্ধ হাফেয আব্দুল্লাহ ইবনে কাযেমকে মঞ্চে উঠিয়ে দিয়ে আমাকে নিয়ে গাড়িতে উঠলেন। আমরা হোটেলে চলে এলাম। অতঃপর রাত ১২-টায় নির্বিঘ্নভাবেই সমাবেশ সমাপ্ত হল। এভাবে বিরোধীদের নানামুখী প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ইতিবাচকভাবে তা মুকাবিলা করার মাধ্যমে আমরা সে যাত্রা উৎরে গেলাম, *ফালিল্লাহিল হাম্দ*। পরদিন ফৎহ আলী ব্রীজ সংলগ্ন জামে মসজিদে বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মীদের উপস্থিতিতে যেলা সভাপতি এ্যডভোকেট ওয়াজেদ আলী তরফদার আনন্দের আতিশয্যে জমঈয়ত সভাপতি ছাহেবকে উদ্দেশ্য করে বললেন, স্যার! আপনি হাল ধরে থাকুন, ভাই গালেবকে ছেড়ে দিন ময়দান চাষ করার জন্য ও কোদাল মারার জন্য।'

(১২) নানূপুর ইসলামিয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম : সম্ভবতঃ ১৯৮৭ সালের অক্টোবরে হবে। মক্কা শরীফের জনৈক মেহমান আবু 'আরাব এলেন ঢাকায়। উনার গন্তব্য হল চট্টগ্রামের পটিয়া, নানূপুর, জিরি- প্রভৃতি মাদরাসা। প্রতিবছর নাকি উনি আসেন এসব স্থান পরিদর্শন ও আর্থিক সাহায্য প্রদানের জন্য। আব্দুল মতীন সালাফীর সাথে তাঁর কিভাবে পরিচয় ঘটে জানি না। তবে মেহমানের অনুরোধে তিনি তাঁর সাথে যাচ্ছেন। জমঈয়তের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক উপলক্ষে আমি তখন ঢাকায় ছিলাম। মতীন ভাই আমাকে ধরে বসলেন। ফলে আমাকেও সঙ্গী হতে হল। যথাসময়ে আমরা নানূপুর মাদরাসায় পৌঁছলাম। এখান থেকে মাইজভাণ্ডারী দরবার খুবই নিকটে। নানূপুর পীর ছাহেবের সাথে মাইজভাণ্ডারীদের প্রবল বিরোধ ছিল। আমরা গিয়ে মসজিদে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দিলাম। সম্ভবতঃ জুম'আর ছালাতের পরই অনুষ্ঠানটি ছিল। ফলে তা সংক্ষিপ্ত ছিল। পীর ছাহেব মেহমানকে বক্তব্য দানের আহ্বান জানালেন। আব্দুল মতীন ভাই তার অনুবাদ করলেন। অতঃপর আমাকে আহ্বান করা হল। আমি মাত্র ১৫ মিনিটে বক্তব্য শেষ করলাম। যতদূর মনে পড়ে দু'টো উদাহরণের মাধ্যমে বক্তব্য দিয়েছিলাম। পাশেই বসা পীর ছাহেবের দিকে ইঙ্গিত করে বলেছিলাম- ধরে নিন আমি রাজীব গান্ধীর মত একজন বড়মাপের হিন্দু যুবক এসেছি পীর ছাহেবের কাছে 'ইসলাম' গ্রহণের জন্য। চট্টগ্রাম থেকে আসার পথে রাস্তার ধারে ধারে বড় বড় পীরের দরগাহের বিশাল বিশাল তোরণ দেখলাম। পীর ছাহেবের কাছে মুরীদ হওয়ার পূর্বে আমি এসব দরগাহ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বললেন, ইসলামের চারটি মাযহাব। আমরা এবং ওরা সবাই হানাফী মাযহাবভুক্ত। তবে ওদের সাথে আমাদের তরীকায় পার্থক্য রয়েছে। নিঃসন্দেহে আমাদের তরীকাই সর্বোত্তম। এখানে মুরীদ হলেই আপনি পরকালে মুক্তি পাবেন। আমি একজন সচেতন ও শিক্ষিত হিন্দু যুবক। আমরাও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র- চার দলে বিভক্ত। এদের মধ্যেও রয়েছে সাধন-ভজন পদ্ধতির বিস্তর পার্থক্য। রয়েছে প্রবল সামাজিক বৈষম্য। মানুষে মানুষে জাত-পাতের এই পার্থক্য ও পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ আমাকে টেনে এনেছে উদার ও সাম্যের ধর্ম ইসলামের কাছে। কিন্তু বাস্তবে একি দেখছি? হিন্দুরাও চার, মুসলামানরাও চার? তাদের ব্রাহ্মণ-যজমানি, এদের পীর-মুরীদী, ওদের ভেট-নৈবেদ্য, এদের নযর-নেয়ায। ওদের শ্রাদ্ধ, এদের খানা? ওদের পরস্পরে ধর্মীয় বিরোধ, এখানেও একই অবস্থা। প্রবল সন্দেহের জালে আটকে গিয়ে আমি মুরীদ না হয়েই উঠে দাঁড়ালাম। এখন বলুন হে পীর ছাহেব! আমাকে ইসলামে দাখিল করাবার জন্য আপনার কাছে কি বক্তব্য রয়েছে?

দ্বিতীয় উদাহরণ : দেড় হাযার ছাত্র ও ৪০ জনের মত শিক্ষক ছাড়াও জুম'আয় আগত পার্শ্ববর্তী এলাকার বেশ কিছু লোকও রয়েছেন। হঠাৎই আমার নযরে পড়লো বাইরে দেওয়াল লিখনের দিকে। সেখানে চারটি ইসলামী রাজনৈতিক দলের নাম। সেটিকে সামনে রেখে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বললাম, আপনারা সবাই একই পরিবেশে থেকে একই উস্তাযের কাছে একই উদ্দেশ্যে- অর্থাৎ ইসলাম শেখার উদ্দেশ্যে লেখাপড়া করেন। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সবার একটাই- দেশে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করা- সবাই সমস্বরে বলল 'ঠিক'। এবারে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তাহলে আপনারা এখানে চারটি দল কেন?' পিনপতন নীরবতা। আমি আবারো বললাম, আপনারা সবাই বলেন, 'বিশ্ব মুসলিম এক হও'। 'ভাত-কাপড়-বাসস্থান, ইসলাম দেবে সমাধান'। তাহলে আপনারা নিজেরা কেন এক হতে পারলেন না? আপনাদের অনৈক্যের সমাধান তাহলে ইসলাম কী দিয়েছে? যে ইসলাম আপনাদের দেড় হাযার শিক্ষিত মানুষকে এক করতে পারল না, সে ইসলাম কিভাবে কোটি মানুষকে এক করবে? তাহলে কি ইসলাম অনৈক্য, হিংসা ও হানাহানির ধর্ম? নিশ্চয়ই নয়। তাহলে গলদটা কোথায়? হতবুদ্ধি হয়ে একদৃষ্টে চেয়ে আছে সবাই আমার দিকে। খানিক বিরতি দিয়ে বললাম, হতাশ হবার কিছু নেই। সমাধান ইসলামেই নিহিত আছে। আল্লাহ বলেছেন, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا। অর্থাৎ 'তোমরা সকলে সমবেতভাবে আল্লাহ্র রজ্জুকে ধারণ কর'। কিন্তু আমরা সেখানে 'হাবলুল্লাহ'কে (আল্লাহ্র রজ্জুকে) ছেড়ে দিয়ে বিভিন্ন জনে বিভিন্ন 'আব্দুল্লাহ'কে ধরেছি বিভিন্ন অজুহাতে। আল্লাহ বলেছেন, وَلَا تَفَرَّقُوا। 'তোমরা ফের্কায় ফের্কায় বিভক্ত হয়ো না'। আমরা সেখানে ধর্মের নামে অসংখ্য মাযহাব ও তরীকায় বিভক্ত হয়েছি। অন্ততঃ চারটি মাযহাব মান্য করাকে আমরা 'ফরয' ঘোষণা করেছি। এই সব মাযহাব ও তরীকার দেওয়াল খাড়া করে আমরা ক্রমেই সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণতর গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে পড়েছি। এর সাথে রয়েছে রাজনৈতিক দলাদলি। টেবিলের চার কোণ থেকে চারজনই বলছি, 'বিশ্ব মুসলিম এক হও'। অথচ কেউই চার কোণ ছেড়ে মাঝখানে আসছি না। আমরা প্রত্যেকেই স্ব স্ব দল নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে চাই। তাহলে ঐক্যের পথ কি? নিশ্চয়ই রয়েছে। চলুন আমরা সেপথের সন্ধান করি। আর সে পথ হল এই যে, আমরা নিজেদের 'রায়'কে নয়, বরং অহীর বিধানকে চূড়ান্ত সত্য হিসাবে গ্রহণ করব। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে একমাত্র সমাধান হিসাবে মেনে নেব। ব্যাখ্যাগত মতভেদ হলে ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের ব্যাখ্যাকে অগ্রাধিকার দেব। এরপরও যদি ছোটখাট কোন মতভেদ থাকে এবং ঈমান ও কুফরের মত বিষয় না থাকে, তাহলে সেজন্য আমরা পরস্পরের প্রতি সহনশীল থাকব। ইনশাআল্লাহ এ পথেই মুসলিম ঐক্য ফিরে আসবে। ইসলাম যে সাম্যের ধর্ম, তা প্রমাণিত হবে। অমুসলিমরা ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হবে।

ছাত্রদের মধ্যে কয়েকজন একসঙ্গে বলে উঠলো- 'এ ধরনের কোন আন্দোলন কি বাংলাদেশে রয়েছে? আমরা আজই সে আন্দোলনে যোগ দেব।' বললাম, 'ব্যস্ত হবেন না ভাইয়েরা। সে আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। আমাদের কেবল খুঁজে নিতে হবে।' সবাই প্রায় সমস্বরে জানতে চাইলো কোথায় সে আন্দোলনের ঠিকানা, কারা এর নেতা ইত্যাদি। আমি জবাব না দিয়ে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বসে পড়লাম। মতীন ভাই আমার পিঠ চাপড়ে বললেন, 'আপনি বোধ হয় জাদু জানেন'।

দুপুরে খানাপিনার পর ছাত্রদের দাবীক্রমে আবার বসলাম মাদরাসার একটি কক্ষে। এরপর তারা ইচ্ছামত প্রশ্ন করতে থাকল। আমি কেবল জবাব দিয়ে গেলাম। তবে 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বা তার ঠিকানা কিছুই বললাম না। 'আহলেহাদীছ'-এর সবকিছুই বললাম কেবল 'আহলেহাদীছ' শব্দটা উল্লেখ করলাম না। কেননা শব্দটি উল্লেখ করা মাত্র তাদের যাবতীয় প্রশ্ন ও জানার ইচ্ছা নিমিষেই উবে যাবে। কারণ তারা 'আহলেহাদীছ'কে একটি পৃথক 'ফের্কা' হিসাবে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে। তাদেরকে যত্রতত্র লা-মাযহাবী, রাফাদানী, গায়ের মুক্বাল্লিদ এমনকি বেদ্বীন আখ্যা দিতেও তারা মোটেই কুণ্ঠাবোধ করে না। তাই তাদেরকে শুধু আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিকানা বললাম। তখনই ইউসুফ নামে দাওরা ক্লাসের এক ছাত্র ও বিজ্ঞানের একজন শিক্ষক (সম্ভবত আব্দুর রাযযাক) আহলেহাদীছ আক্বীদা কবুল করার ঘোষণা দেন। তারা পরে রাজশাহীতে চিঠিও দিয়েছিলেন। আমি তাদের নামে সম্ভবত বইপত্র পাঠিয়েছিলাম।

(১৩) খাসবাগ, রংপুর : ১৯৯৬ সালের ১ জানুয়ারী। 'আন্দোলন'-এর রংপুর যেলা সম্মেলন। 'জমঈয়ত'-এর স্থানীয় নেতৃবৃন্দ রংপুরের প্রাণকেন্দ্র সেন্ট্রাল রোড বা তার আশপাশে আমাদের সম্মেলন হতে দেবেন না। জনাব আব্দুল বাকী তখন আমাদের কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক। উনি খাসবাগের বাশিন্দা। প্রতিবেশী হানাফী মসজিদ কমিটি সদস্য। অবশেষে তিনি উক্ত হানাফী মসজিদ কমিটিকে বললে তারা সানন্দে রাযী হয় এবং নিজেরা সম্মেলনের জন্য চাঁদা আদায়ে সহযোগিতা করেন। তাদের উৎসাহ ও সহযোগিতার ফলেই আল্লাহ্র রহমতে সফলভাবে সম্মেলন করা সম্ভব হয়। ঐদিন হানাফী ভাইদের সহযোগিতার কারণ ছিল এই যে, ইতিপূর্বে এক সম্মেলন থেকে ফেরার পথে খাসবাগে বাকী ছাহেবের ওখানে সাময়িক যাত্রাবিরতি করি। ঐদিন জুম'আর দিন থাকায় পার্শ্ববর্তী উক্ত হানাফী মসজিদে ছালাত আদায় করতে যাই। মসজিদ কমিটি আমার পরিচয় পেয়ে আমাকেই খুৎবা দিতে অনুরোধ করেন। আমি স্বাভাবিক নিয়মে মাতৃভাষায় সংক্ষিপ্ত খুৎবা দেই। খুৎবায় আমি চার ইমামের উক্তিসমূহ উদ্ধৃত করে নিরপেক্ষভাবে ছহীহ হাদীছ অনুসরণের মাধ্যমে পরকালীন মুক্তি হাছিলের আহ্বান জানাই। জুম'আর পর কমিটি ও মুছল্লীগণ এখানে একটি বড় ধরনের সম্মেলন করার জন্য তখনই অনুরোধ করেন। এ ঘটনার কয়েকমাসের মধ্যেই আমাদের উক্ত সম্মেলনের তারিখ হয়। এভাবে ওনাদের পূর্বের অনুরোধ রক্ষা করা হয়, আমাদের সম্মেলনও সম্পন্ন হয়। *ফালিল্লা-হিল হামদ*। ঐ দিন এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। সম্মেলনের প্রস্তুতিতে 'যুবসংঘ'-এর যে ছেলেটি সবচেয়ে বেশী ভূমিকা নিয়েছিল, সেই ছেলেটি সম্মেলন শেষে ভোররাতে পীরগাছায় গিয়ে তার বাড়ীতে ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু সকালে আর ওঠেনি। ঘুমের মধ্যেই তার মৃত্যু হয়ে যায়। ইন্না লিল্লাহে.....। সকালে আমরা পীরগাছায় যেয়ে এ ঘটনা শুনে খুবই মর্মাহত হলাম।

(১৪) খুলনা : ১৯৯৯ সালে খুলনা হাদীস পার্কে যেলা সম্মেলন। সঙ্গে খুলনা প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন ডাকা হয়েছে। সকালে সাংবাদিক সম্মেলন শেষ করেছি। বিকালে পার্কের সমাবেশে যাব। হঠাৎ প্রশাসনের পক্ষ থেকে সেখানে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হল। ব্যাপারটা কিছুই বুঝলাম না। উপায়ান্তর না দেখে তড়িঘড়ি করে প্রেসক্লাব মিলনায়তন ভাড়া করা হল। চারিদিক থেকে কর্মীরা আসতে শুরু করল। ৫-টার মধ্যেই মিলনায়তন ভর্তি হয়ে গেল। বসা বা দাঁড়ানোর

কোন স্থান নেই। কিন্তু লোকজন আসছেই। ওদিকে মাগরিবের মধ্যেই মিলনায়তন ছাড়তে হবে। সেভাবেই চুক্তি। অথচ মাগরিবের পর বিশেষতঃ শহরের লোকজন আসবে। এমতাবস্থায় আমার নির্ধারিত বক্তব্য শেষ করে সবাইকে সার্কিট হাউস ময়দানে গিয়ে মাগরিবের ছালাত আদায় করতে বললাম (পূর্বেই সার্কিট হাউসে দু'টি কক্ষ বরাদ্দ নেওয়া হয়েছিল)। স্রোতের মত কর্মীরা চলল সব সার্কিট হাউসের দিকে, যা অচিরেই মিছিলের রূপ ধারণ করল। পুলিশ দৌড়ে এল। কেননা তাদের অনুমতি ছাড়া মিছিল নিষিদ্ধ। এদিকে সালাফী ছাহেব ও যেলা সভাপতি এবং 'আন্দোলন'-এর নেতারা আমাকে বিরত রাখার চেষ্টা করলেন। আমি বললাম, পুলিশকে আমার কাছে আসতে দিন। আমি গাড়ি নিয়ে মিছিলের মধ্যভাগে যাচ্ছি। আপনারা আসুন। পিকচার প্যালেস মোড় থেকে সার্কিট হাউস খুব দূরে নয়। শ্লোগানমুখর তবে সংযত মিছিল দেখে পুলিশ চড়াও হলো না বরং সাথে সাথেই চলল। আমি আগে গিয়ে হেলিপ্যাড গ্রাউণ্ডে দাঁড়ালাম। মিছিলও সেদিকে এল। সবাইকে ইঙ্গিতে কাতার দিতে বললাম। একজনকে আযান দিতে বললাম। পুলিশ কর্মকর্তা এসে জোব্বাধারী মাওলানা জাহাঙ্গীরকে বিনয়ের সাথে বলল, আপনাদের মিছিল কি এরপরেও চলবে? ডিআইজি থেকে বারবার ওয়ারলেস আসছে মিছিল যেন না হয়। আমাদের চাকুরীটা বাঁচান। আমি তাদেরকে বললাম, 'ডিআইজিকে বলে দিন এটা আহলেহাদীছের মিছিল। এটা কোন ভাংচুরের মিছিল নয়।' অতঃপর মাগরিব পড়ে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিয়ে প্রোগ্রামের সমাপ্তি টানলাম।

তারপর সার্কিট হাউসে আমাদের নির্ধারিত কক্ষে ঢুকলাম। বারান্দায় কর্মী ভরা। ইতিমধ্যে বাগেরহাট যেলা সভাপতি এসে জানালেন, কিছু হানাফী ভাই আহলেহাদীছ হতে চান। বারান্দায় সবাই লাইন দিয়ে বসলেন। মোট ৪২ জন আহলেহাদীছ হলেন এবং বায়'আত নিলেন। *আলহামদুলিল্লাহ*। সবাইকে নছীহত করে বিদায় দিলাম। একটু পরে এমদাদ মামা এসে বললেন, এনডিসি ছাহেব ডিসি ছাহেবের বরাতে বলেছেন, যেন সার্কিট হাউসে আমি রাত্রিযাপন না করি। কেননা এখানে গণ্ডগোলের আশংকা রয়েছে। বিষয়টা আঁচ করতে পেরে আমি সালাফী ছাহেব, (জয়পুরহাটের) মাহফূয ও শফিকুলকে রাত ৯-টার ট্রেন ধরে চলে যেতে বললাম। আমি ইচ্ছা করেই থেকে গেলাম। কেননা চলে গেলে বিরোধী পক্ষ অপব্যাখ্যা করার সুযোগ নেবে। মামাকে বললাম, 'এনডিসিকে বলে দিন, এখান থেকে আমি কোথাও যাব না। কোন পুলিশ প্রহরা লাগবে না। আমাদের কর্মীরা এখানে থাকবে।' কর্মীরা বারান্দা ভরে শুয়ে থাকল। পরদিন অন্যান্য সাংগঠনিক প্রোগ্রাম সেরে সাতক্ষীরা গেলাম।

মূল ঘটনা ছিল এই যে, সম্মেলন বানচাল করার জন্য ইতিপূর্বে সংগঠন থেকে বহিষ্কৃত একজন ব্যক্তি নিজ হাতে লিফলেট লিখে ফটোকপি করে ছড়িয়ে ছিল যে, 'ড. গালিবকে রুখে দাঁড়ান। তিনি হানাফীদের কাফের বলেন। আপনারা দলে দলে হাদীস পার্কে এসে তার দাঁতভাঙ্গা জবাব দিন'। এ লিফলেট তারা শহরের হানাফী মসজিদগুলোতে বিতরণ করে এবং প্রশাসনের কাছেও সম্মেলন বন্ধের জন্য আবেদন করে ও তাতে লিফলেটটি জুড়ে দেয়। সে মোতাবেক যেলা প্রশাসন হাদীস পার্কের সম্মেলন আকস্মিকভাবে বন্ধ করে দেয় এবং সার্কিট হাউসে আমার না থাকার অনুরোধ করে। তারপরও তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিয়ে বিবিধ সমস্যা মুকাবিলা করে মোটামুটি সফলভাবেই প্রোগ্রাম সম্পন্ন হল। *ফালিল্লাহিল হাম্দ*।

(চলবে)

লেখা আহ্বান

ইসলামের বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সুস্থ সাহিত্য বিনির্মাণের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে দীর্ঘদিন পর নতুন অবয়বে যাত্রা শুরু করেছে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর মুখপত্র **'তাওহীদের ডাক'**। সত্যানুসন্ধিৎসু যুবক, ছাত্র ও লেখকদের নিকট থেকে বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য, আহলেহাদীছ আন্দোলন, মনীষী চরিত, সাময়িক প্রসঙ্গ, কবিতা, মতামত, শিক্ষণীয় গল্প প্রভৃতি বিষয়ে লেখা আহ্বান করা হচ্ছে।

-নির্বাহী সম্পাদক

ফিলিস্তীন : এক অন্তহীন কান্নার প্রস্রবণ

আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

শুরুকথা : ভূমধ্যসাগর ও জর্ডান নদীর মধ্যবর্তী ভূখণ্ড ফিলিস্তীন বা প্যালেস্টাইন মুসলিম, খৃষ্টান ও ইহুদী তথা সকল ধর্মাবলম্বীর নিকট একটি পবিত্র ভূমি। সুদীর্ঘ ইতিহাস বিজড়িত ফিলিস্তীন মধ্যপ্রাচ্য তথা বিশ্ব মানচিত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অঞ্চল। অথচ জর্ডান, লেবানন ও সিরিয়া বেষ্টিত এ ভূখণ্ডের প্রতিটি বালুকণার সাথে মিশে আছে ছোপ ছোপ রক্ত। ক্রুসেড যুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত এই ছোট্ট অঞ্চলটি আজ ইসরাঈল নামক এক আস্ত হায়েনার করতলগত। গত ৬০ বছর থেকে ফিলিস্তীনীদের রক্ত নিয়ে হোলি খেলছে আমেরিকার অনৈতিক সমর্থনপুষ্ট ইসরাঈল। অন্যদিকে সারা বিশ্বের মোড়লরা কেউবা এ অন্যায়ের সহযোগিতা করছে, কেউবা কাপুরুষের ন্যায় চোখ বুজে সহ্য করছে এই হোলি খেলা। এ বছরের ৩১ মে সারা বিশ্বকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে এ ইহুদী রাষ্ট্রটি তার আসল চেহারা আরেকবার উন্মোচন করল। গাজার ক্ষুধার্ত-তৃষ্ণার্ত, ভুখা-নাঙ্গা মানুষের মুখে এক মুঠো আহার তুলে দেওয়ার জন্য রওয়ানা হয় তুর্কী ত্রাণবাহী জাহাজ ফ্রিডম ফ্লোটিলা মাভি মারমারা। গাজার উপকণ্ঠে পৌঁছার পূর্বেই ইসরাঈলী সন্ত্রাসীরা এই জাহাজে বর্বর হামলা চালিয়ে ৯ জন তুর্কী মানবাধিকার কর্মীকে হত্যা করে। এই গণহত্যা সারা বিশ্বের মানুষকে আরো একবার ইসরাঈল সম্পর্কে ভাবাতে শুরু করে।

ইহুদী জাতির পরিচয় :

ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রসঙ্গে আলোচনার শুরুতেই ইহুদীদের সম্পর্কে বলা প্রয়োজন। কেননা ইহুদী রাষ্ট্র হিসাবেই ইসরাঈলের জন্ম। ইহুদীদের প্রধান নবী হলেন মূসা (আঃ), যার কিতাব হল তাওরাত। ইহুদীরা আল্লাহকে বিশ্বাস করে, যার নাম তাদের কাছে জেহোভা। এখান থেকেই ইহুদী নামের উৎপত্তি। কারো মতে, ইহুদীদের অপর নাম বনী ইসরাঈল। ইসরাঈল মূলত ইয়াকুব (আঃ)-এর অপর নাম। তাঁর মোট ১২ জন সন্তান ছিল। ১২ ভাইয়ের বড় ইয়াহুদার নামানুসারেই বনী ইসরাঈলকে 'ইহুদী' বলা হয়। বনু ইসরাঈলরা পথভ্রষ্ট হয়ে গেলে আল্লাহ তাদের হেদায়াতের জন্য মূসা (আঃ)-কে তাওরাত সহ প্রেরণ করেন। বনী ইসরাঈলের উপর আল্লাহর ছিল অগণিত নিয়ামত, অফুরন্ত অনুগ্রহ। পবিত্র কুরআনে প্রায় ৪৩টি স্থানে বনী ইসরাঈলের আলোচনা রয়েছে। তন্মধ্যে প্রায় ১৬টি স্থানে বনু ইসরাঈলের উপর আল্লাহ প্রদত্ত নে'আমতরাজির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর যখন আমি সমুদ্রকে পৃথক করে দিলাম অতঃপর তাদেরকে রক্ষা করলাম এবং ফেরাঊনকে ডুবিয়ে দিলাম' *(বাক্বারাহ ৫০)*। তাদেরকে প্রদত্ত আরো নে'আমতসমূহ যেমন- রাজাধিপতির মর্যাদা প্রদান *(মায়েদাহ ৬০)*, রিযিক প্রদান *(জাছিয়া ১৬)*, তীহ প্রান্তরে ছায়া ও খাবারের ব্যবস্থা *(বাক্বারাহ ৫৭)*, পানির ব্যবস্থা *(বাক্বারাহ ৬০)*।

এছাড়াও আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর আরো অনেক অনুগ্রহ করেছেন। যেমন- গো-বৎসের পূজা করার পরও আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দেন' *(বাক্বারাহ ৫১-৫২)*। বজ্রপাতে মৃত্যু ঘটানোর পর তাদেরকে আবার পুনর্জীবন দান করেন' *(বাক্বারাহ ৫৫)*। এ রকম আরো অভাবনীয়, আশাতীত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নে'আমতরাজি দিয়ে আল্লাহ ইহুদীদের মান-মর্যাদা, প্রভাব-প্রতিপত্তি, শান-শওকত বৃদ্ধি করেছেন।

এরপরও কুটিল ইহুদীরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় না করে একের পর এক নাফরমানী করে চলেছিল। গোবৎসের পূজা, যুদ্ধ করতে অস্বীকার, আল্লাহকে প্রকাশ্যে দেখতে চাওয়ার মত ধৃষ্টতা, মান্না ও সালওয়ার উপর আপত্তি, নবীদেরকে হত্যা, শনিবারের মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞা লংঘন *(বাকারা ৫১-৫২; মায়েদা ২৪; ঐ ৬১; নিসা ১৫৭; বাকারা ৬৫-৬৬)* ইত্যাদি বহু ক্ষেত্রে তারা আল্লাহর নাফরমানী করে। ফলে আল্লাহ তাদের উপর নানাবিধ গযব নাযিল করেন। যেমন- লাঞ্ছনা ও পরমুখাপেক্ষিতা *(বাক্বারাহ ৬১, আলে ইমরান ১১২)*। এছাড়াও ক্ষণিক গযবসমূহ ছিল- (ক) তীহ প্রান্তরে ৪০ দিন উদভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়ানো *(মায়েদা ২৪)*। (খ) বজ্রপাতে ধ্বংস হওয়া *(বাক্বারাহ ৫৫)*। (গ) গো-বৎস পূজার জন্য পরস্পরকে হত্যার মাধ্যমে নিষ্ঠুর শাস্তি প্রাপ্ত হওয়া *(বাক্বারাহ ৫৪)*। (ঘ) মাথার উপর তূর পাহাড়কে ঝুলিয়ে দেয়া *(আ'রাফ ১৭১)*। (ঙ) বৈধ ও পূত-পবিত্র বস্তু হারাম হয়ে যাওয়া *(নিসা ১৬০-১৬১)*। (চ) নিকৃষ্ট বানর ও শুকরে পরিণত হওয়া *(বাক্বারাহ ৬৫-৬৬)* প্রভৃতি।

মূলত ইহুদীরা হচ্ছে একটি প্রতারক, ধুরন্ধর, বিশ্বাসঘাতক নিষ্ঠুর জাতি। তাই লাঞ্ছনা ও অপমান এদের চিরসঙ্গী। এদের উপর আল্লাহর সবচেয়ে বড় গযব হচ্ছে মুসলমান বা অন্য কোন জাতির ন্যায় তারা কোন স্থানে একত্রিত জীবন যাপন করতে পারবে না। এজন্য ইতিহাসের পাতায় তাদেরকে সবসময় দুরাচারী, অপমানিত, বহিস্কৃত অবস্থাতেই দেখা যায়। এইতো গত শতাব্দীতেই তারা মুসলিম খিলাফত আমলে আরব থেকে বহিস্কৃত হয়ে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে আশ্রয় নেয়। আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলার কর্তৃক নিষ্ঠুরভাবে আক্রান্ত ও বিতাড়িত হয়।

ফিলিস্তীনের ভৌগলিক পরিচয় :

Palestine এর আরবী নাম فلسطين যার অর্থ সুন্দর কিছু। এর আরেকটি অর্থ আল্লাহর ভূমির রক্ষক *(ইসলামী বিশ্বকোষ ১৫তম খণ্ড, পৃঃ ১৫৩)*। মূলত শব্দটি গ্রীক। যার অর্থ- ফিলিসিয়াবাসীদের ভূখণ্ড। অর্থাৎ যারা আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ১২০০ শতকের দিকে কেনান তথা জর্ডান

নদীর বেলাভূমির দক্ষিণ তীরাঞ্চল দখল করেছিল। এরা ছিল প্রাচীন জুডা রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত ফিলিসিয়ার অধিবাসী। এশিয়ার পশ্চিম প্রান্তসীমা ও ভূমধ্যসাগরের পূর্ব সীমানা বরাবর ফিলিস্তীন রাষ্ট্রটি অবস্থিত। এর উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণে ইসরাঈলের অস্তিত্ব থাকলেও মূলত উত্তরে লেবানন এবং সিরিয়া, দক্ষিণে সুয়েজ উপসাগর ও মিশরীয় সিনাই উপদ্বীপ, পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর ও পূর্বে জর্ডান অবস্থিত।

এর মোট আয়তন ৬৩৩৫ বর্গকিলোমিটার। ১৯৪৮ সালে এই পরিমাণ ছিল ২৬,৩২৩ বর্গকিলোমিটার। মোট জনসংখ্যা ৪০ লাখ। ১৯৪৮ সালে ছিল ১ কোটি। তন্মধ্যে পশ্চিমতীরে বাস করে ২৫ লাখ, গাজায় ১৫ লাখ, ইসরাঈলে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক ১১ লাখ, জর্ডানে ২৮ লাখ, অন্যান্য আরব দেশে ১৭ লাখ এবং সারা পৃথিবীতে ১ লাখ। প্রায় ১ কোটি মানুষের একটি জাতিগোষ্ঠী এমনইভাবে আজ স্বদেশ থেকে বিতাড়িত, ভাগ্যবিড়ম্বিত। তাদেরকে পাশবিক শক্তি প্রতারণার মাধ্যমে এ অবস্থায় নিক্ষেপ করেছে।

গাজা : আয়তন ৩৬০ বর্গ কিঃমিঃ। দৈর্ঘ্য ৪১ কিঃমিঃ। প্রস্থ ১২ কিঃমিঃ। প্রাচীর বেষ্টিত একটি কারাগারের মত। ইসরাঈলের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণায় ভূমধ্যসাগর ঘেঁসে এক চিলতে জায়গা গাজা।

পশ্চিম তীর : ২ হাযার ৩৯০ বর্গ মাইল। এখানকার অনেকেই উচ্চ মধ্যবিত্ত ও বিদেশে কর্মরত।

ইসরাঈলের ইতিহাস :

৬৩৬ খৃষ্টাব্দে ইসলামের দ্বিতীয় খলীয় ওমর (রাঃ)-এর খিলাফতকালে ফিলিস্তীন সর্বপ্রথম ইসলামী খিলাফতের অধিকারভুক্ত হয়। অতঃপর দীর্ঘ চারশত বছর পর ১০৯৬ সালে ক্রুসেডাররা মুসলামানদের হাত থেকে ফিলিস্তীন দখল করে নেয়। পুনরায় ১১৮৭ সালে গাজী ছালাহুদ্দীন আইউবীর নেতৃত্বে মুসলামানরা জেরুজালেম পুনরুদ্ধার করে। ১৫১৭ সালে সুলতান প্রথম সেলিম ফিলিস্তীন রাষ্ট্রটি মামলুক সুলতান কানজুল ঘোরীর নিকট থেকে ওছমানীয় খিলাফতের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। ১৯১৮ সালে ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর ফিলিস্তীন কার্যত বৃটিশ উপনিবেশে পরিণত হয়। ইতিমধ্যে তুর্কী খিলাফতের বিরুদ্ধে আরব ভূখণ্ডে আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ধীরে ধীরে শুরু হতে থাকে। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে মক্কার ইমাম বা শাসক ছিলেন শরীফ হুসাইন। তিনি এ আন্দোলনের গতিবৃদ্ধিতে বিস্তর ভূমিকা রাখেন। ঠিক এই সময়ের কিছু পূর্বেই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে জায়নিজম (Zionism) নামে একটি আন্দোলন শুরু হয়। এই জায়নিজম আন্দোলনের উদ্ভব হয় ভিয়েনা শহরে। থিওডর হারজল নামক একজন হাঙ্গেরীয় ইহুদী সাংবাদিক ভিয়েনার ইহুদীদের নিয়ে শুরু করেন জায়োনিস্ট আন্দোলন। ১৮৯৭ সালে তিনি সুইজারল্যান্ডে প্রথম 'আন্তর্জাতিক জায়োনিস্ট কংগ্রেস' আহ্বান করেন *(অধ্যাপক কে আলী, মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস, পৃঃ ৩৩৮)*।

এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল ইহুদীদের জন্য একটি আলাদা আবাসভূমি তৈরী করা। এই উদ্দেশ্যকে সামান রেখে থিওডর দাবী করলেন, প্যালেস্টাইন ছিল ইহুদীদের আদি নিবাস। অতএব সব ইহুদীকে সেখানে ফিরে যেতে হবে, গড়তে হবে পৃথক আবাসভূমি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অন্যতম নেতা শরীফ হুসাইন প্রতিশ্রুতি দেন যে, তিনি তুরস্কের বিরুদ্ধে বৃটেনকে সহযোগিতা করবেন। আর ব্রিটিশ সরকার তাঁকে আরব সাম্রাজ্য গড়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। অন্যদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বিলাতে এসিটনের দারুণ অভাব দেখা দেয়। ঐ সময় জায়োনিস্ট আন্দোলনের বিখ্যাত নেতা ও রসায়নবিদ হাইম ওয়াইজম্যান। যিনি বিলেতের ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন। তিনি ব্রিটিশ সরকারকে বলেন, তিনি এসিটন উৎপাদন করতে পারবেন। ব্রিটিশ সরকারকে তিনি এ বিষয়ে সাহায্য-সহযোগিতা করতে রাজি তবে শর্ত হচ্ছে যে, যুদ্ধে জিতলে প্যালেস্টাইনে গড়তে দিতে হবে ইহুদীদের বিশেষ আবাসভূমি। *(এবনে গোলাম সামাদ, ইহুদীদের জাতীয় পরিচয়, নয়া দিগন্ত, ১৯ জানুয়ারী ২০০৯, পৃঃ ৬)*।

ইহুদীদের দাবী অনুযায়ী ১৯১৭ সালে ব্রিটিশ সরকার নানা স্বার্থকে সামনে রেখে ইহুদীদের জাতীয় আবাসভূমি সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। এটাকে 'বেলফোর ঘোষণা' (Belfour Declaration) বলা হয় *(মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস, পৃঃ ৩৩৮)*। এখান থেকেই শুরু ফিলিস্তীন সমস্যার। যাহোক প্রথম বিশ্বযুদ্ধে হারার পর ফিলিস্তীন আসে ব্রিটেনের নিয়ন্ত্রণে। ফলে বহু ইহুদী ইউরোপ থেকে গিয়ে প্যালেস্টাইনে বসবাস করতে শুরু করে। তারা কিনতে শুরু করে জলাভূমি। ইহুদীরা এসব জলাভূমি সেচে বের করে আবাদি ভূমি। এরকম একটি জলাভূমি সেচে তারা তৈরী করে তেল আবিব শহর

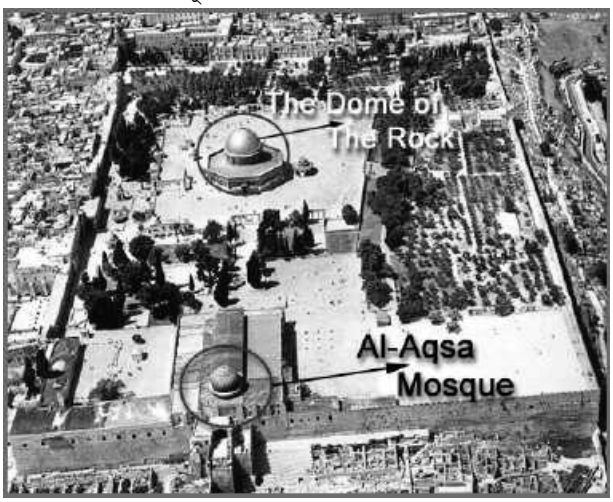

এবং প্রতিষ্ঠা করে একটি বিশ্ববিদ্যালয়। ক্রমে ক্রমে আরবগণ নিজ দেশে পরবাসীতে পরিণত হতে থাকে। ব্রিটিশ সরকারের নীতির ফলে আরবদের অসন্তোষ বেড়ে চলল। এ অসন্তোষ আত্মপ্রকাশ পেল আরব-ইহুদী দাঙ্গার মধ্য দিয়ে। ১৯২১, ১৯২৯ ও ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে আরব ও ইহুদীদের মধ্যে যে দাঙ্গা হয়েছিল, তাতে অসংখ্য লোক হতাহত হয়। ব্রিটিশ সরকার সামরিক শক্তির সাহায্যে এসব দাঙ্গা বন্ধ করে। ১৯৩৬ সালে পরিস্থিতি বেগতিক দেখে ব্রিটিশ সরকার একটি 'রয়েল কমিশন' (Royal Commission) নিয়োগ করে। কিন্তু এই কমিশনের প্রস্তাব আরব-ইহুদী উভয়ই প্রত্যাখ্যান করে। ফলে কোন সমাধান ছাড়াই আরব-ইহুদী সংঘর্ষ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফিলিস্তীনের অবস্থার পরিবর্তন হল। আরব ও ইহুদীরা কিছু সময়ের জন্য সংগ্রাম হতে নিরত হয়ে মিত্রশক্তির খেদমতে আত্মনিয়োগ করল। এ সময় ইহুদীরা আমেরিকার সাথে

যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে তাদের সাহায্য লাভ করে। আমেরিকারও মধ্যপ্রাচ্যে একটি শক্তিশালী ঘাটির প্রয়োজন ছিল। সে মনে করল ইহুদী-ফিলিস্তীনী দ্বন্দ্ব তার সে প্রয়োজন মেটাতে পারে। সুতরাং সে ফিলিস্তীনে ইহুদীদের জাতীয় আবাসভূমি সৃষ্টির প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানাল। ১৯৪২ সালে ডা. হাইম ওয়াইজম্যান ও আরও কয়েকজন ইহুদী নেতা আমেরিকার সাথে এক বৈঠকে মিলিত হয় এবং সেখানে বিটমোর প্রোগ্রাম (Bitmore Programme) নামে একটি প্রস্তাব পাস করা হয়।এ প্রস্তাব অনুসারে ইহুদী সাধারণতন্ত্র হিসাবে ফিলিস্তীন প্রতিষ্ঠার দাবী করা হয়। এ সংবাদে সমগ্র আরব জাহান ক্ষেপে ওঠে এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৫ সালে আরবলীগ গঠিত হয়। ১৯৪৮

সালে আরবলীগের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে পাশ হয় ফিলিস্তীনকে বিভক্ত করে ইসরাইল নামে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব। ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর এর প্রেসিডেন্ট হন হাইম ওয়াইজম্যান *(ঐ)*।

জাতিসংঘের অবিচারে হতাশ হয়ে আরব বিশ্ব সশস্ত্র পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়। আরবলীগের সমস্ত সদস্য অস্ত্রশক্তি প্রয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। ফলশ্রুতিতে ১৯৪৮ সালে ইহুদী ও আরবদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ বাধে। আরবগণ যখন নিশ্চিত বিজয়ের পথে তখন জাতিসংঘ ৪ সপ্তাহের জন্য যুদ্ধবিরতি করতে বলে। এই সুযোগে ইসরাঈল আমেরিকা থেকে অস্ত্রশস্ত্র আমদানি করে। অন্যদিকে উদ্বাস্তুবেশে আমেরিকাও সৈন্য পাঠায়। ফলে ইহুদীরা প্রভূত শক্তি সঞ্চয় করতে সক্ষম হয়। অতঃপর পুনরায় যুদ্ধ শুরু হলে আরবরা আর পেরে উঠেনি। ইহুদীরা ফিলিস্তীনের একটি অংশ অধিকার করে ইসরাঈল নামে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। এভাবে দীর্ঘ ষড়যন্ত্র-সংগ্রামের পর ইহুদীরা একটি কৃত্রিম রাষ্ট্র গঠনে সক্ষম হয় *(ঐ)*।

৬০ বছরের রক্তস্নাত পথ :

ইসরাঈল নামক এই রাষ্ট্রটির অবৈধ জন্মলাভের পর থেকেই তার ভিতরে লুকানো পশুবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ ক্রমেই ঘটতে থাকে। ১৯৪৮ থেকে ২০১০ পর্যন্ত দীর্ঘ ৬১ বছরে ইসরাঈল যে বর্বরতা ও পাশবিকতা দেখিয়েছে তা মানুষ কোন দিন কল্পনাও করেনি।

১৯৪৮ সালে ফিলিস্তীন-ইসরাঈল যুদ্ধের সময় পশ্চিমতীর জর্ডানের এবং গাজা মিসরের দখলে চলে আসে। পরবর্তীতে ১৯৬৭ সালে ৬ দিনের ভয়াবহ যুদ্ধে ইসরাঈল পুনরায় সেগুলো দখল করে নেয়। ১৯৮২ সালে ইসরাঈল লেবাননে আগ্রাসন চালিয়ে ১৭ হাযার ৫০০ মানুষকে হত্যা করে। এদের বেশীর ভাগই ছিল নিরীহ জনসাধারণ। ঐ একই বছর লেবাননের শাবরা-শাতিলা গণহত্যায় ১ হাযার ৭শ নিরীহ মানুষ নিহত হয়। লেবাননে ইসরাঈলের উপর্যুপরি আক্রমণে ইয়াসির আরাফাত তাঁর পিএলও-এর ঘাটি বৈরুত থেকে তিউনিশিয়ার রাজধানী তিউনিসে সরিয়ে আনেন। তাতেও রক্ষা হয়নি। তিউনিসেও ১৯৮৬ সালে হামলা চালিয়ে বহু লোককে হত্যা করে ইসরাঈল।

এরপর ১৯৯৬ সালে কানা গণহত্যায় নিহত হয় ১০৬ সাধারণ লেবাননী জনগণ। এরা ছিল জাতিসংঘ আশ্রিত এবং নিহতদের অনেকেই ছিল শিশু। ২০০৬ সালে তারা লেবাননের মারওয়াহিন গ্রামের অধিবাসীদের ঘরবাড়ী ছেড়ে চলে যেতে বলে। সবাই তা মেনে নিয়ে রাস্তায় নামতেই হেলিকপ্টার থেকে তাদের গুলি করে হত্যা করা হয় *(রবার্ট ফিস্ক, কেন পশ্চিমা বিশ্বকে তারা ঘৃণা করে, দ্য ইন্ডিপেনডেন্ট, ৭ জানুয়ারী, ২০০৯ অনুবাদ : মু. আবু তাহির, নয়া দিগন্ত, ১১ জানুয়ারী ২০০৯, , পৃঃ ৬)*।

বিভক্ত ফিলিস্তিনীদের ভাগ্য বিড়ম্বনা :

অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে আজ ভাগ্যবিড়ম্বিত ফিলিস্তীন জাতি দুইভাগে বিভক্ত- হামাস/গাজা বনাম ফাতাহ/পশ্চিম তীর। মিশরের 'ইখওয়ানুল মুসলিমীন' (ইসলামী ভ্রাতৃসংঘ)-এর আদর্শে গঠিত হয় হামাস। মিশরে ইখওয়ানের উদয় হয় ১৯২৬ সালে। এর প্রতিষ্ঠাতা হলেন হাসান আল-বান্না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই দল মিসরে খুবই শক্তিশালী হয়ে উঠে। মিসরের সাবেক প্রেসিডেন্ট জামাল আব্দুন নাসের দলটিকে নিষিদ্ধ করেন। দলটি এখনো মিসরে বেআইনী। গাজায় হামাস দল হিসাবে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে ১৯৮৭ সালের ১৪ই ডিসেম্বর। এরপর থেকেই জনসমর্থন সঞ্চয় করে চলেছে এ সমাজসেবামূলক রাজনৈতিক দলটি। পাশাপাশি ফিলিস্তীনকে ইসরাঈলের করাল গ্রাস থেকে উদ্ধার করার জন্য তারা সশস্ত্র সংগ্রামেও যুক্ত হয়েছে। ফিলিস্তীনের মুক্তি সংগ্রামে আশা-ভরসার প্রতীক হয়ে ওঠায় সংগঠনটি ২০০৬ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনে বিজয় লাভ করে। কিন্তু হামাসকে সন্ত্রাসী দল আখ্যা দিয়ে আমেরিকা-বৃটেনসহ বিশ্ব মোড়লরা তাদেরকে ফিলিস্তীনের শাসনভার গ্রহণে স্বীকৃতি দেয়নি। বরং তাদেরকে নির্বাচিত করার অপরাধে (?) শাস্তি স্বরূপ গাজার অধিবাসীদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে আন্তর্জাতিক অবরোধ। ফলে এক অঘোষিত কারাগারে পরিণত হয়েছে গাজা। বিশ্ববাসীর চোখের সামনে আজ এক বুক শূন্যতা নিয়ে খাদ্যসহ জীবনোপকরণের অভাবে ধুঁকে ধুঁকে দিনাতিপাত করছে সেখানকার কয়েক লক্ষ বনু আদম। অথচ হামাস কোন সন্ত্রাসী দল নয়। এটা জনসমর্থিত বিপ্লবী রাজনৈতিক দল। সন্ত্রাসবাদ ও বিপ্লববাদ সমার্থক নয়। সন্ত্রাসীদের সাথে বৃহত্তর সমাজের যোগাযোগ থাকে না, কিন্তু বিপ্লবীদের থাকে। জাতিসংঘ চার্টারের ৫১ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে- 'কোন দেশ যদি শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং তার নাগরিকরা নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ে, তখন সেই দেশের সমস্ত প্রতিষ্ঠানের এবং সমস্ত নাগরিকের এককভাবে বা সংঘবদ্ধভাবে থেকে তাদের আত্মরক্ষার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। সেই হিসাবে হামাসের পূর্ণ অধিকার রয়েছে ইসরাঈলের বিরুদ্ধে লড়াই করার। কেননা তারা হল অত্যাচারিত ফিলিস্তিনী জাতির মুক্তিকামী সংগঠন। অন্যদিকে Palestine Liberation Organization (PLO)-এর একটি অংশ হচ্ছে আল-ফাতাহ, যা ১০ অক্টোবর ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে সংগঠনটি ইয়াসির আরাফাতের আপোষহীন সাহসী নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও তাদের লেজুড়দের বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। এই আল-ফাতাহর সংগ্রামের ফসল হিসাবে

১৯৮৮ সালের ১৫ নভেম্বর স্বাধীন ফিলিস্তীনের ঘোষণা আসে। সর্বশেষ ২০০১ সালে আসলো শান্তি প্রক্রিয়ার সকল চড়াই-উৎরাই পেরোনোর শেষ পর্যায়ে বিল ক্লিনটনের দ্বিতীয় মেয়াদের শেষ দিকে দ্বিতীয় ক্যাম্প ডেভিড চুক্তিতে ইসরাঈল-ফিলিস্তীন উভয়পক্ষকেই স্বাক্ষর করানোর জন্য একত্রিত করা হয়েছিল। কিন্তু আরাফাত ঐ প্রতারণামূলক চুক্তির কতগুলো Volted line-এ স্বাক্ষর করতে অস্বীকৃতি জানান। ফলে আমেরিকা-ইসরাঈলের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় ইয়াসিরকে দৃশ্যপট থেকে সরানো। তাই তারা তাকে আল-ফাতাহ-র সদর দপ্তর রামাল্লায় টানা দুই বছর বন্দী করে রাখে। অতঃপর রহস্যজনকভাবে ১১ নভেম্বর ২০০৪ সালে প্যারিসের একটি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এভাবে বিদায় ঘটে এককালের মজলুম জনতার প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর আরাফাতের। এরপর দলটির হাল ধরেন তাঁরই ডেপুটি আপোষকামী মাহমূদ আব্বাস। নেতৃত্বের পরিবর্তনে বিপ্লবী আপোষহীন দলটি এখন মার্কিন-ইসরাঈল চক্রের আজ্ঞাবহ হয়ে পড়েছে। ফলে মার্কিন-ইসরাঈলী ষড়যন্ত্রকে বাস্তবে রূপদান করতে আরাফাতের আল-ফাতাহ এখন আর কোন বাধা নয়।

জরাজীর্ণ এই সংগঠনটি এখন দুর্বলচিত্ত আব্বাসের পরিচালনায় একটি জনসমর্থনহীন দলে পরিণত হয়েছে। এমতাবস্থায় ফিলিস্তিনী জনগণ আরাফাতের ফাতাহ-এর বিকল্প খুঁজতে থাকে এবং পেয়ে যায় আরাফাতের জীবদ্দশায় নিষ্ক্রিয় থাকা সংগঠন হামাসকে। এভাবেই দৃশ্যপটে আগমন হামাসের। ইসরাঈলের জন্য স্পর্শকাতর ইস্যুগুলো যেমন ফিলিস্তীনী উদ্বাস্তুদের প্রত্যাবর্তন, প্রস্তাবিত ফিলিস্তীন রাষ্ট্রে জেরুজালেমের অন্তর্ভুক্তি ইত্যাদি দাবীতে হামাস আপোষহীন ও অটল। ফলশ্রুতিতে হামাস একদিকে যেমন ইসরাঈলের চক্ষুশুলে পরিণত হয়, অন্যদিকে পরিণত হয় ফিলিস্তিনীদের নয়নমণিতে, যা প্রতিফলিত হয় ২০০৬ সালের ২৫শে জানুয়ারীর নির্বাচনে। নির্বাচনে মাহমূদ আব্বাস নেতৃত্বাধীন দল পরাজিত হলেও সঊদী আরবের মধ্যস্থতায় ফাতাহ ও হামাস উভয়ের অংশগ্রহণে কোয়ালিশন সরকার গঠন করা হয়। এরপর থেকে এই কোয়ালিশন সরকারকে ভেঙ্গে দেয়ার জন্য ইসরাঈল তার সর্বশক্তি নিয়োগ করে। অবশেষে পশ্চিমাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রেসিডেন্ট মাহমূদ আব্বাস কোয়ালিশন সরকার ভেঙ্গে দেন। এহেন মুহূর্তে আসন্ন বিপদ বুঝতে পেরে হামাস দারিদ্র্যপীড়িত গাজার অধিকার গ্রহণ করে এবং ফাতাহ পশ্চিম তীরের অধিকার গ্রহণ করে। এইভাবে একটি জাতি হিসাবে ফিলিস্তীন বিভক্ত হয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে ফিলিস্তীন জাতির একতাবদ্ধ শক্তিও ভেঙ্গে দু'টুকরো হয়ে যায়।

বর্তমান ফিলিস্তীনের অবস্থা :

বর্তমানে ইসরাঈল পশ্চিম তীরের চারিদিকে আন্তর্জাতিক আইন পরিপন্থী একটি নিরাপত্তা প্রাচীর তৈরী করেছে, যা সেখানে বসবাসরত ২০ লাখ ফিলিস্তিনীকে বস্তুত খাঁচাবন্দী করে রেখেছে। এছাড়া প্রতিমাসে বসবাসরত হাযার হাযার ইহুদীর সাথে যোগ হচ্ছে আরো অগণিত ইহুদী। অন্যদিকে ইসরাঈল সরকার পশ্চিম তীরের ইফরাত এলাকার ৪২৫ একর (১৭২ হেক্টর) ভূখণ্ড দখল করে নিয়েছে। এই ভূখণ্ডে অন্তত ২ হাযার ৫০০ নতুন ভবন নির্মাণ করা হবে। এই ভবনগুলোতে অন্তত ৩০ হাযার ইসরাঈলীর থাকার ব্যবস্থা করা হবে *(নয়া দিগন্ত, ১৮ ফেব্রুয়ারী '০৯, পৃঃ ৫)*।

পশ্চিম তীরের ইহুদী বসতিগুলোতে বর্তমান প্রায় ২ লাখ ৯০ হাযার ইসরাঈলী বসবাস করে। ২০০১ সালে এই সংখ্যা ছিল ২ লাখের নিচে। অন্যদিকে গাজা থেকে রকেট ছোঁড়া হলেও পশ্চিম তীর থেকে কোন রকেট ছোড়া হয়নি। তারপরও গত বছর সেখানে ইসরাঈলী হামলায় ৫০ জন ফিলিস্তীনী নিহত হয় *(খালেদ মিশাল, কোন বর্বরতাই মুক্তির সংকল্প দমাতে পারবে না, অনুবাদ: ফারুক ওয়াসিফ, প্রথম আলো, ৭ জানুয়ারী, ২০০৯, পৃঃ ১১)*।

অন্যদিকে গাজা মূলত একটি বড় আকারের শরণার্থী শিবির, যার ৮৩ ভাগ মানুষ দরিদ্র। গাজার ফিলিস্তীনীদের সাথে পশ্চিম তীরের ফিলিস্তীনীদের বৈবাহিক সম্পর্কও নেই। এমনকি গাজার ছাত্র পশ্চিম তীরের কোন প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনারও সুযোগ পায় না। এইভাবে একটি জাতিকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সাথে একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে ইসরাঈল। ১৯৬৭ সাল থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত গাজা এলাকা ইসরাঈলের দখলে ছিল। ফিলিস্তীনীদের অবিরাম প্রতিরোধ-আন্দোলনে অপদস্থ ইসরাঈলীরা ২০০৫ সালে গাজা ছেড়ে গেলেও অত্যাচারী প্রতারক ইসরাঈল গাজার উপর অবরোধ চাপিয়ে দেয়। তারা গাজায় ঢোকার ও বেরুনোর সব পথ বন্ধ করে দেয়। দক্ষিণ মিসরের সিনাইয়ের দিকে একটা প্রবেশ পথ আছে। কিন্তু মার্কিন-ইসরাঈলের চাপের মুখে মিসর সে পথটিও বন্ধ করে দেয়।

এই অবরুদ্ধ গাজার উপর তারা ২০০৬ সালে বিমান হামলা চালিয়ে ২৯০ জন নিরীহ গাজাবাসীকে হত্যা করে। তারপর ২০০৮ সালের জানুয়ারীতে গাজায় বিমান হামলা চালিয়ে ১৪০ জনকে হত্যা করে। এরপর ২০০৮ সালের জুন মাসে ৬ মাসের যুদ্ধবিরতি চুক্তির মাধ্যমে গাজায় ইসরাঈলের অবরোধ প্রত্যাহার এবং গাজা থেকে রকেট নিক্ষেপ বন্ধে সম্মত হয় হামাস।

কিন্তু ইসরাঈল ৪ ও ১৭ নভেম্বর আকাশ ও স্থলপথে গাজায় হামলা চালিয়ে যুদ্ধ বিরতি ভঙ্গ করলেও ওবামার নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত মিডিয়ায় তা ধামাচাপা পড়ে যায়। ১৯ ডিসেম্বর ২০০৮ সালে ইসরাঈল-হামাস ৬ মাসের যুদ্ধ বিরতির মেয়াদ শেষ হয়। এরপর ২৭ ডিসেম্বর যুদ্ধ বিরতি ভঙ্গকারী ইসরাঈল গাজায় নির্বিচারে গণহত্যা শুরু করে। বিনা উসকানীতে ঠাণ্ডা মাথায় গাজার ঘুমন্ত, নিরীহ মানব সমাজের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ইসরাঈল। ইসরাঈলী জঙ্গী বিমানগুলো আকাশ পথে, যুদ্ধ জাহাজগুলো নৌপথে এবং ট্যাংক বহরের দুর্ভেদ্য নিরাপত্তাবূহ্য নিয়ে ইসরাঈলী পদাতিক বাহিনী প্রায় ২২ দিন যাবত মানবতার বিরুদ্ধে সভ্য দুনিয়ার এক নজীরবিহীন নৃশংস তাণ্ডব চালায়। নবাবিষ্কৃত ফসফরাস বোমায় মানবহত্যার নিষ্ঠুর পরীক্ষা চালায়। এমনিতেই দীর্ঘ অবরোধের কারণে গাজাবাসী নিঃস্ব, অসহায় ও সম্বলহারা। নেই তাদের পর্যাপ্ত খাদ্য-পানীয়। তার উপর নিষ্ঠুর ইসরাঈল বাহিনীর বর্বর আক্রমণে গাজাবাসী অসহায় হয়ে পড়ে। টানা ২২ দিনের মর্মন্তুদ হত্যাকাণ্ডে গাজা পরিণত হয় সাক্ষাৎ বধ্যভূমিতে। ফিলিস্তীনের সরকারী পরিসংখ্যান মতে এই হামলায় ৪১০ শিশু ও ১০০ নারী সহ ১৩০০ শ'রও বেশী লোক নিহত হয়, আহত হয় ৫ হাযার ৩শ' লোক। ৪ হাযার ১শ' বাড়ীঘর পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়। অন্যদিকে ইসরাঈলী সেনা মারা যায় মাত্র ১৩ জন।

এই নৃশংস হামলার কারণ হিসাবে ইসরাঈল অজুহাত দেয় হামাস গাজা থেকে রকেট ছুঁড়লে তার জবাবে আমরা এই হামলা চালিয়েছি। অথচ হামাসের রকেট হামলায় ইসরাঈলে মারা যায় ১৩ জন, আর তার জবাবে ইসরাঈল হত্যা করে ১৩০০ জন !! এরপরেও কারো মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, শক্তির ব্যবধানে বহুগুণ পিছিয়ে থেকেও খামাখা

রকেট হামলা চালিয়ে ইসরাঈলকে উস্কানী দেয়ার পিছনে হামাসের যুক্তি কি? হামাসের রাজনৈতিক শাখার প্রধান খালিদ মিশেল এর উত্তরে লেখেন, 'আমাদের ঘরে বানানো রকেটগুলো আর কিছুই নয়, দুনিয়ার কাছে আমাদের ফরিয়াদ। যেন তারা শুনতে পায় যে, আমরা এখনো বেঁচে আছি মরে যাইনি। ইসরাঈল ও মার্কিন শক্তি চাচ্ছে আমরা মরব কিন্তু আওয়াজ করব না। আমরা বলছি আমরা মরব তবু নীরব হব না *(প্রথম আলো, জানুয়ারী ২০০৯, পৃঃ ১১)*।

শান্তির ললিতবাণী প্রচারকরা কোথায়?

সন্ধ্যার মৃদুমন্দ হাওয়ায় ঘুমাতে যাওয়া আর পাখির কোলাহলে আনন্দঘন পরিবেশে ঘুম জাগা শিশুটি যখন নিমিষেই হচ্ছে পিতৃহারা, মায়েরা হচ্ছে সন্তানহারা, স্ত্রীরা হচ্ছে স্বামীহারা। পিতৃহারা সন্তানের বুকফাটা আর্তনাদ, স্বামীহারা বিধবার গগণবিদারী চিৎকার, সন্তানহারা পিতার শোকের মাতম যখন পৃথিবীর আকাশ-বাতাসকে কাপিয়ে তুলেছে; সকলের অলক্ষ্যে নির্যাতিত বান্দার আর্তচিৎকারে আল্লাহ্‌র আরশটিও যেন কেঁপে উঠেছে। সমগ্র পৃথিবী যখন এ গণহত্যায় শোকে মুহ্যমান। সেই মুহূর্তেও মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ নির্লজ্জভাবে উল্টো সহায়হীন ফিলিস্তীনীদের দায়ী করে বিষোদগার করেন। অন্যদিকে শপথ না নেয়ার ঠুনকো অজুহাতে চুপটি মেরে ঠিকই বসে ছিলেন তথাকথিত 'পরিবর্তন'-এর বার্তা নিয়ে হাজির হবু মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওবামা। অথচ ক'দিন আগেই তিনি মুম্বাই বোমা হামলার নিন্দা করতে ভুলেননি। দ্বিমুখী আচরণের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে শপথ নেয়ার পূর্বেই ওবামা তার আসল চেহারা উন্মোচন করে দেন।

শান্তির বার্তাবাহক (!) তকমা লাগিয়ে এই আমেরিকাই আবার পৃথিবীব্যাপী শান্তি ও নিরাপত্তার দরস দিয়ে যাচ্ছে। শিশু ও নারীর অধিকারের পক্ষে অবিরাম বুলি আওড়াচ্ছে। অথচ দীর্ঘ ৬২ বছর যাবৎ ফিলিস্তীনের বুকে যে অন্তহীন কান্নার প্রস্রবণ বয়ে চলেছে তা তাদেরকে বিন্দুমাত্র আঁচড় কাটে না। পশ্চিমা মিডিয়াগুলোতে সবসময় সোচ্চারভাবে প্রচারিত হচ্ছে মুসলিম দেশগুলোতে তথাকথিত নারী নির্যাতনের কাহিনী। কিন্তু ইসরাঈলের প্রকাশ্য লোমহর্ষক নারকীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তারা মুখে কুলুপ এঁটে আছে। হাজারো মানবাধিকারবাদী, নারীবাদী, প্রাণীবাদী সংস্থা যারা দেশে দেশে মানব-প্রাণীকুল নির্যাতনের চিত্র সন্ধানে হয়রান হয়ে বেড়াচ্ছে তাদের কাছেও ফিলিস্তীনী নারী ও শিশুর বুকফাটা আর্তনাদ কোনই প্রভাব ফেলে না। তবে কি মুসলিম নারী ধর্ষণ মানবতাবিরোধী কাজ নয়? মুসলিমদের উপাসনাস্থল ধ্বংস করা কি ধর্মীয় অধিকার ক্ষুণ্ন করা নয়? নিরীহ মুসলিমদের হত্যা করা কি গণহত্যা নয়? কেন শান্তির ললিতবাণী প্রচারকরা এ বিষয়ে মুখে কুলুপ এঁটে থাকে? কেন তাদের সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের হুংকার সেখানে স্তব্ধ হয়ে যায়? এভাবেই কেবল আপন স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরগরম গণতন্ত্র, শান্তি ও নিরাপত্তার ভড়ংধারী এই রাষ্ট্রগুলো মুসলিম বিশ্বের উপর চালিয়ে যাচ্ছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এক নীরব গণহত্যা।

মুসলিম বিশ্বের নীরবতা :

গাজার নিরীহ নির্যাতিত সম্বলহারা ভাইয়ের বুকফাটা আর্তনাদ যখন পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে মুসলমানদের চক্ষুকে অশ্রুসিক্ত করছে, তখন মুসলিম বিশ্বের শাসকদের কাপুরুষোচিত নীরবতা যেন মড়ার উপর খাড়ার ঘা। বিশেষ করে আরব বিশ্ব পাশ্চাত্যের সুবোধ তল্পীবাহকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। আজ মুসলিম বিশ্বের শাসকগণ ইহুদী-খ্রীষ্টানদেরকে পরম শুভাকাংখী মনে করে তাদের মনোরঞ্জনে নিয়োজিত রয়েছে। যে মুহূর্তে পবিত্র বায়তুল আকসায় ইহুদীদের সিনাগগ তৈরী হচ্ছে, মুসলিম ভাইদের উপর অকথ্য যুলুম-নির্যাতন চালানো হচ্ছে, তাদেরকে মরু বিয়াবানে শিয়াল-কুকুরের মত তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। প্রতিবাদ করতে গেলে বুলেট-বোমায় বুক ঝাঁঝরা করে দিচ্ছে, ট্যাংকের চাকায় পিষে মারছে, উদ্বাস্তু শিবির গুড়িয়ে দিচ্ছে, পাইকারীভাবে গণহত্যা চলছে, সেই মুহূর্তে আমাদের কাপুরুষ, হীন নেতাদের উপদেশবাণী (?) হল- ওদের হাতে পারমাণবিক বোমা আর মিসাইল, আকাশে ওদের একচ্ছত্র আধিপত্য, দরিয়ায় তাদের সুবিশাল নৌবহর, জমিনে ওদের ট্যাংক ও সাঁজোয়া যান, দুনিয়াটা ওরা নিমিষে খতম করে দিতে পারে, ওদের মোকাবেলা করতে গিয়ে খামাখা তাজাপ্রাণ, মাল-সম্পদ নষ্ট করে লাভ কী?

হে কাপুরুষ মুসলিম শাসক! ঐ শোন ধর্ষিতা বোনের কান্না। ঐ শোন এতিম শিশুর বুকফাটা আহাজারী। শোন ঐ আশ্রয়হীন ছিন্নমূল লাখো দুস্থ-দুর্গত-নির্যাতিত-নিগৃহীত মুসলিম ভাইয়ের ক্রমাগত আর্তনাদ। শোন ঐ ক্ষুধার্ত বুভুক্ষ মা-বোনদের আর্তচিৎকার। ওরা যাবে কোথায়? খাবে কি? ওদের অশ্রুসিক্ত নয়ন তো তোমাদের পানে চেয়ে আছে। বল কী করবে?

আশ্রয়হীন ক্রন্দনরত নারী-শিশুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে রক্ত-মাংস, অস্থি-মজ্জা একাকার করে দেওয়ার পর শাসকদের এই যখন অবস্থা। এইভাবে এক গালে চড় মারার পর আরেক গাল পেতে দেওয়ার দৃশ্যে মহা গদগদ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবার কেবল চড়-থাপ্পড় নয়, জোড়া পায়ে লাথি মারতে শুরু করেছে। এই সুযোগে কেবল গাজা-পশ্চিম তীর নয়, ইরাক-আফগানকে এক সাথে ধূলায় মিশিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে সাম্রাজ্যবাদী সন্ত্রাসীরা। মানবতার অধিকার ও স্বাধীনতা সংরক্ষণ এবং শান্তি, নিরাপত্তা ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি নিয়ে যে বিশ্বসংস্থার জন্ম, সেই জাতিসংঘে মুসলিম শাসকদের মহামান্য গুরু আমেরিকা ইসরাঈলের নৃশংসতার বিরুদ্ধে একটি নিন্দা প্রস্তাবও যখন পাশ করাতে পারে না, তবুও কেন আমেরিকার কদমবুসি করে চলতে হবে? ১শ' ৫৫ কোটি মুসলমান আর কতকাল এভাবে পশ্চিমা বিশ্বের দিকে অসহায় হয়ে চেয়ে থাকবে? কতকাল আর হাত পা গুটিয়ে শীর নুইয়ে অশ্রুপাত করবে?

সমাধান কোন পথে?

ফিলিস্তীন ইসরাঈল সমস্যার সমাধান হতে পারে দুইভাবে- শান্তিপূর্ণ সমাধান অথবা রক্তক্ষয়ী সমাধান।

শান্তিপূর্ণ সমাধান : শান্তিপূর্ণ সমাধানের নামে ফিলিস্তীনীরাও বাধ্য হয়ে আমেরিকার দেয়া রোডম্যাপ অনুযায়ী যে প্রস্তাব মেনে নিয়েছে তা হল দ্বি-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ। কিন্তু এই সমাধানেও কয়েকটি বাধা রয়েছে। যথা- জেরুজালেমকে রাজধানী বানানো নিয়ে। ইসরাঈল ও ফিলিস্তীন উভয়েই চায় জেরুজালেমকে রাজধানী বানাতে এবং বায়তুল আকছাকে নিজেদের অধীনে রাখতে। এছাড়া আরেকটি বড় বাধা সৃষ্টি করছে ইসরাঈল। তারা প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯৬৭ সালের সীমানায় ফিরে যাওয়া দূরে থাক বরং দখলকৃত স্থানে আরো বসতি স্থাপন করছে। তবে সবচেয়ে বড় কথা আমেরিকা-ইউরোপ যদি ইসরাঈলের প্রতি এতই দরদী হয় তাহলে নিজের ঘরে জায়গা দিচ্ছে না কেন? কেন অপরের জমি অন্যায়ভাবে রক্তগঙ্গা বইয়ে দখল করে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে শান্তির বাণী প্রচারকদের? ফিলিস্তীনে সত্যিই কি শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্বেগ তাদের রয়েছে?

রক্তক্ষয়ী সমাধান : এই পৃথিবীর প্রতিটি সচেতন মানুষ জানে যে, ফিলিস্তীন ফিলিস্তীনীদেরই। ইসরাঈল ও বর্তমান ফিলিস্তীন পুরোটাই দশ সহস্রাধিক বছরের ঐতিহাসিক জাতি ফিলিস্তীনীদের। সুতরাং এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ইসরাঈলের অধিকৃত জমি পুরোটাই ফিলিস্তিনীদের। এটা পুনরায় উদ্ধার করা তাদের কর্তব্য। এই অধিকার আদায়ের স্বার্থে যদি ফিলিস্তিনীরা প্রতিনিয়ত ইসরাঈলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যায় এতে আপত্তির কোন সুযোগ নেই। স্বাধীনতা যদি মানুষের জন্মগত অধিকার হয় তাহলে সদ্য জন্ম নেয়া ফিলিস্তীনী শিশুটিরও এ অধিকার রয়েছে। অতএব এই পথে স্বাধীনতা অর্জন যতই রক্তক্ষয়ী হোক না কেন এ ছাড়া আর কোন বাস্তব সম্মত পথ নেই।

ইসরাঈলের ধ্বংস সুনিশ্চিত :

সূরা আ'রাফের ১৬৮ নং আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইহুদীরা কোনদিন ঐক্যবদ্ধ জীবন যাপন করতে পারবে না। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখছি তারা ইসরাঈল নামে একটি নিজস্ব রাষ্ট্র সৃষ্টি করে প্রায় ৬০ বছর ধরে সমবেত হচ্ছে। মূলত ইসরাঈল কখনোই একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র নয়। বরং মুসলমানদের বিরুদ্ধে বৃহৎ শক্তিবর্গের সৃষ্ট একটি সামরিক কলোনী মাত্র। এই বশংবাদ কলোনীটিকে রাষ্ট্র নাম দেওয়াটাও বৃহৎ শক্তিবর্গের রাজনৈতিক খেলা। তাছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে বর্তমান ইসরাঈলে তাদের জমা হওয়াটা চূড়ান্ত ধ্বংসের আলামত হতে পারে এবং এই আলামত ধীরে ধীরে প্রকাশ পাচ্ছে। ইসরাঈল সত্যিকারের বিপদ, আসল হুমকি তার ঘরের মধ্যেই মাথা চাড়া দিচ্ছে। ইসরাঈলের মোট জনসংখ্যা ৭.১ মিলিয়ন। তন্মধ্যে ইহুদী ৫.৫ মিলিয়ন। আর বাকী ১.৬ মিলিয়ন মুসলমান। আর গাজা ও পশ্চিম তীরে বসবাসকারী সব মুসলমান মিলে মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৫.৫ মিলিয়ন। এখনই মুসলমানরা ইহুদীদের থেকে ১ লাখ বেশী। ২০২০ সালের মধ্যে ২১ লাখ বেশী হবে *(Can Israel Survive? টিম ম্যাকগাক, দি টাইম ম্যাগাজিন, ১৯ জানুয়ারী বঙ্গানুবাদ : ইফতেখার আমিন, নয়া দিগন্ত, ২৯ জানুয়ারী'০৯, পৃঃ ৬)*। তখন এমনিতেই দৃশ্যপট পাল্টে যাবে। তাইতো অনেক বুদ্ধিজীবী মনে করেন ফিলিস্তীনীদের উচিৎ দ্বৈত-রাষ্ট্র সমাধানের আশা বাদ দিয়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা করা। তাতে যদিও কয়েক দশক লেগে যাবে কিন্তু এতে ইসরাঈলীদের বিপদ ঘটবে।

এছাড়া এটাও ঐতিহাসিক সত্য যে, অত্যাচার করে কেউ কোনদিন টিকে থাকেনি। বরং অসত্যের পতন অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং ইসরাঈলও একদিন ধ্বংস হবে। কেননা শত সহস্র শহীদের পথ থেকে ফিলিস্তীনীরা এক চুল সরে দাঁড়ায়নি। পুরনো প্রজন্মের ফিলিস্তীনীরা মুক্তিযুদ্ধের সাথে সামান্যতম আপোষকামী দেখায়নি। শহীদের রক্ত, বোমায় ঝাঁঝরা হওয়া শরীর কথা বলতে শুরু করেছে। শরণার্থী শিবিরে সদ্য জন্ম নেয়া শিশুটাও মুক্তির স্বপ্নে বিভোর। শহীদ হওয়ার মাঝে যে জাতি আনন্দ পায় তাদেরকে হত্যা করা যায়, ধ্বংস করা যায় না। অবরুদ্ধ করা যায় কিন্তু স্বাধীনতার আকাশছোঁয়া স্বপ্নচ্যুত করা যায় না। তাই আজ মুসলিম বিশ্বের উচিৎ তুরস্কের রেসিপ তাইয়েপ এরদোগান ও ইরানের আহমাদিনেজাদের ন্যায় সাহসী ভূমিকা পালন করার মাধ্যমে ফিলিস্তীনের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে অভিভাবকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া। সেক্যুলার রাষ্ট্র তুরস্কের রাজনীতির পালে নতুন হাওয়া লেগেছে। এখন তারা ফিলিস্তীনের স্বাধীনতা অর্জন করার ব্যাপারে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। ২০০৯ সাল দাভোসের অর্থনৈতিক সম্মেলনে তুর্কী প্রেসিডেন্ট ইসরাঈলী প্রধানমন্ত্রীর সাথে মুখোমুখি বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত হন। তিনি আঙ্গুল উচিয়ে গাজার হামলাকে গণহত্যা বলে সম্মেলন কক্ষ ত্যাগ করেন। পরবর্তীতে এ বছর ৩১ মে তুরস্কের সহযোগিতায় গাজা অধিবাসীদের জন্য একটি ত্রাণবাহী জাহাজ 'মাভি মারমারা' গাজার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। উক্ত জাহাজে ইসরাঈলী সেনাবাহিনী নির্বিচার হামলা চালিয়ে ২০ জন মানবাধিকার কর্মীকে হত্যা করে তন্মধ্যে ৮ জনই তুর্কী। এতে করে তুরস্কের সাথে ইসরাঈলের সম্পর্কের টানাপোড়েন শুরু হয়। অন্যদিকে তুরস্ক মুসলিম বিশ্বের আপামর জনতার সমর্থন কুড়াতে সক্ষম হয়। এ ঘটনা ইসরাঈলের বিরুদ্ধে নতুন করে ঘৃণার সাগর বইয়ে দিয়েছে বিশ্বব্যাপী। হয়তো অচিরেই ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটবে এই সন্ত্রাসী রাষ্ট্রটির বিরুদ্ধে। আল্লাহ্‌র নবীও বলে দিয়েছেন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না মুসলমানেরা ইহুদীদের সাথে লড়াই করবে। তারা ইহুদীদের হত্যা করবে। ইহুদীরা পাথর খণ্ড ও গাছের আড়ালে লুকাবে। তখন পাথর ও গাছগুলি বলবে হে মুসলিম! এই যে ইহুদী আমার পিছনে। এস, ওকে হত্যা কর *(মুসলিম হা/৮২, কিতাদুল ফিতান, মিশকাত হা/৫১৪৪)*। তাই হতে পারে ফিলিস্তীনে তাদের জমা হওয়াটা চূড়ান্ত ধ্বংসের পূর্ব আলামত।

পরিশেষে বলব ফিলিস্তীন মুসলমানদেরই। বায়তুল আকছা মুসলমানদেরই। পৃথিবীর কোন শক্তি তাদেরকে এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না। আর সত্যিই মুসলিম শাসকদের যদি কখনো সুমতি হয় তবে প্রতিটি বিবেকবান মুসলিম আত্মা চলমান অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিজেদের ঈমানী দায়িত্বে সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে দ্বিধা করবে না। আল্লাহ মুসলিম বিশ্বের পাঞ্জেরীদের সঠিক চেতনা দান করুন। আমীন!!

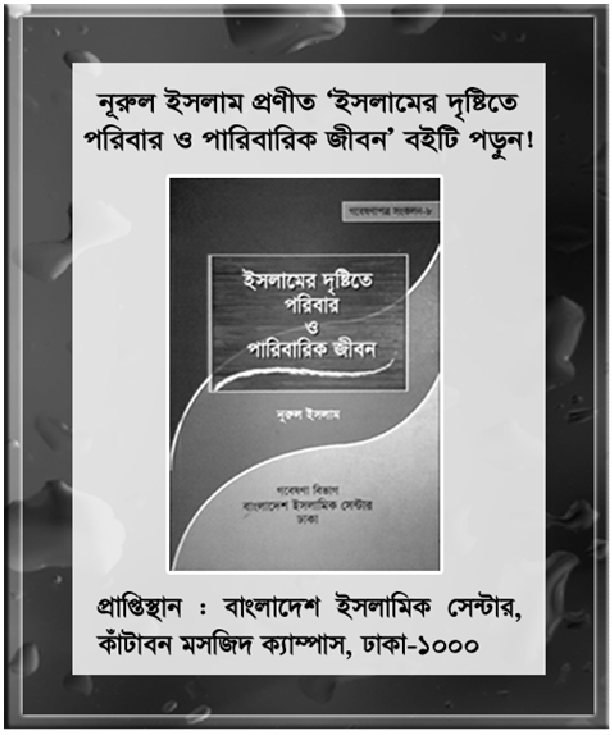

পৃথিবীর প্রচলিত ভাষাসমূহের একটি পরিসংখ্যান

হোসাইন আল-মাহমূদ

ভাষা বলতে সাধারণত বুঝায় মানুষের এমন প্রাকৃতিক ভাবসমূহকে যার মাধ্যমে মানুষ পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষা করে। ভাষা মানুষে-মানুষে যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম। ভাষার কতটুকু মানুষের জন্মগত বৈশিষ্ট্য আর কতটুকু পরিবেশনির্ভর তা আলোচনাসাপেক্ষ। তবে এটা নিশ্চিত যে, মানুষমাত্রেই ভাষা অর্জনের মানসিক ক্ষমতা নিয়ে জন্মায় এবং একবার ভাষার মূলসূত্র আয়ত্ব করার পর সারা জীবন সে নিত্য-নতুন বাক্য ব্যবহার করার ক্ষমতা অর্জন করে। এরকম অসীম প্রকাশক্ষমতাসম্পন্ন ভাষা একান্তই একটি মানবিক বৈশিষ্ট্য।

ভাষার প্রধানত দু'টি রূপ। মৌখিক ও লৈখিক (linguistic sign)। ভাষার লৈখিক রূপের অন্তত ১০ হাজার বছর পূর্বে মৌখিক রূপের উন্মেষ ঘটে। হযরত আদম (আঃ)-কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জান্নাতে বাকশক্তি দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেন এবং পৃথিবীর সমস্ত কিছুর নাম শিক্ষা দান করেন। তাঁর ভাষা ছিল আরবী। পৃথিবীতে আগমনের পর আদম (আঃ)-এর সন্তানরা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ায় ভাষার ব্যবহারের বিভিন্নতা সৃষ্টি হতে থাকে। প্রতিনিয়ত বিবর্তনের পথ ধরে আরবী ভাষার হাজারো নতুন নতুন রূপ তৈরী হয়। সৃষ্টি হয় স্বতন্ত্র ভাষাসমূহ। যেহেতু আরবী থেকে সকল ভাষার উৎপত্তি, সেজন্য আরবীকে সকল ভাষার মা বলে আখ্যায়িত করা হয়।

ভাষার এই বিবর্তন ধারা এতটাই গতিশীল যে, ভাষাবিজ্ঞানীরা বলে থাকেন প্রতি ১০ কি. মি. অন্তর মানুষের ভাষা ও তার উচ্চারণ পদ্ধতির বিভিন্নতা তৈরী হয়। প্রাণীজগতের প্রতিটি সামাজিক প্রজাতি পারস্পরিক যোগাযোগ করে নিজস্ব ভাষা বা সংকেতের মাধ্যমে। মৌমাছি থেকে শুরু করে তিমি পর্যন্ত সকল প্রাণীর মাঝে এই বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কিন্তু একমাত্র মানুষের মাঝেই এমন একটি ভাষার উন্মেষ ঘটেছে যার সাদৃশ্য আর কোন প্রাণীর মাঝে নেই। এর গাঠনিক বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট অঞ্চল থেকে এই ভাষা সৃষ্টি হয় যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রত্যুত্তর করে না; বরং এমন এক অর্থপূর্ণ ধ্বনি ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করে যা সম্পূর্ণ বুদ্ধি-বিবেকপ্রসূত। মানবমস্তিষ্কের এই দিকটি অন্য প্রাণীকুল থেকে একেবারেই ভিন্নধর্মী।

ভাষার প্রাচীন ইতিহাস দুষ্প্রাপ্য। কেননা মাত্র ২০০ বছর পূর্বে ভাষা নিয়ে স্বতন্ত্র গবেষণার সূচনা হয়েছে। বর্তমান পৃথিবীতে প্রচলিত ভাষার সংখ্যা মোটামুটি ৫০০০-এর মতো (অবশ্য আমেরিকান সংস্থা 'এথনোলগ'-এর ২০০৯ সালের হিসাব অনুযায়ী বর্তমানে জীবিত ভাষার[১২] সংখ্যা মোট ৬৯০৯টি; এশিয়া= ২৩২২টি, আফ্রিকা= ২১১০টি, প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল= ১২৫০টি, ইউরোপ= ২৩৪টি, আমেরিকা=৯৯৩টি)। বিশেষজ্ঞরা এসব ভাষাকে কতিপয় ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছেন। যার উল্লেখযোগ্য সংখ্যা প্রায় বিশটির মত। অর্থাৎ এ সকল মৌলিক ভাষাগোষ্ঠীরই শাখা-প্রশাখা হল প্রচলিত সব ভাষা। এর মধ্যে সর্বাধিক বিস্তৃতি লাভকারী ও সমৃদ্ধ ভাষাগোষ্ঠী হল ইন্দো-ইউরোপিয়ান। বর্তমান পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক মানুষের ভাষা এই ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। বিশেষজ্ঞদের ধারণামতে হিন্দী-ফার্সী থেকে শুরু করে নরওয়েজিয়ান ও ইংলিশ পর্যন্ত সকল ভাষা খৃষ্টপূর্ব ৩০০০ বছর পূর্বে উত্তর ইউরোপ ও পশ্চিম এশিয়ার (বর্তমান ইউক্রেন ও পার্শ্ববর্তী এলাকা) সমতলভূমিতে বিচরণকারী যাযাবর জনগোষ্ঠীর ভাষা থেকে উদ্ভূত। বিশেষজ্ঞরা এই ভাষাকে ইন্দো-ইউরোপিয়ান নামকরণ করেছেন। আরেকটি ভাষাগোষ্ঠী- যেটি পশ্চিম এশিয়া জুড়ে অদ্যাবধি প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে- সেটি হল সেমেটিক ভাষাগোষ্ঠী। এটিও খৃষ্টপূর্ব ৩০০০ বছর পূর্বে দক্ষিণ আরবে বসবাসকারী যাযাবর শ্রেণীর ভাষা বলে অনুমান করা হয়। দক্ষিণ আরব থেকে সিরিয়ার উত্তরাঞ্চল পর্যন্ত এলাকা জুড়ে সেমেটিক ভাষাভাষী জাতি সৃষ্টি করেছিল একে একে ব্যবিলনীয়, এ্যাসিরীয়, হিব্রু ও ফিনিশীয় সভ্যতা। যার ফলে মধ্যপ্রাচ্যে কিছুকালের জন্য আরামাইক নামক এক সেমেটিক ভাষা সার্বজনীন প্রভাব বিস্তার করেছিল।

ভাষার ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় যে, ভাষাসমূহ পরস্পরের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে অগ্রসর হয়েছে। রাজ্যজয়, বাণিজ্য, ধর্ম, প্রযুক্তি বা বর্তমান যুগে বিনোদন উপকরণের বিশ্বায়ন প্রভৃতি অনুষঙ্গ ভাষার অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। যেমন রোমান সাম্রাজ্যের প্রভাবে জার্মানিক ভাষাসমূহ (ইংলিশ, ডাচ, জার্মান, ডেনিশ, নরওয়েজিয়ান, সুইডিশ, ফ্লেমিশ, আইসল্যান্ডিক) থেকে পৃথক হয়ে ল্যাটিন/রোমান্স (প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের ভাষা) ভাষাসমূহ (ইটালিয়ান, ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ, পর্তুগিজ, রোমানিয়ান) স্বতন্ত্র রূপ নিয়েছে। আবার ইংল্যান্ডে তিনশত বছর রাজত্ব করলেও রোমানরা সেখানকার জার্মান গোত্রসমূহ, এঙ্গেলস (প্রাচীন জার্মানিক জনগোষ্ঠী যারা ইংল্যান্ডের গোড়াপত্তন করেছিল) ও স্যাক্সনদের (৫ম ও ৬ষ্ঠ খৃষ্টীয় শতাব্দীতে যেসব জার্মানিক দক্ষিণ ইংল্যান্ডের অধিকাংশ এলাকা অধিকার করে সেখানে বসতি স্থাপন করেছিল) উপর শক্ত প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। ফলে এখানকার ভাষা 'এ্যাংলো-স্যাক্সন' নামে পৃথক রূপ লাভ করে। বর্তমান বিশ্বে ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীভুক্ত ভাষাসমূহ উত্তর থেকে দক্ষিণ আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক প্রভাবের কারণে।

এই দখলদারিত্ব সূত্রেই একদা যখন ফ্রেঞ্চরা ক্ষমতাবলে বিভিন্ন জাতির উপর প্রভাব বিস্তার করল, তখন ফ্রেঞ্চ ভাষা পরিণত হয় আন্তর্জাতিক ভাষায় (লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্গা)। পরবর্তীতে বৃটিশ ঔপনিবেশিকরা ফ্রেঞ্চদের হটিয়ে বিশ্বমঞ্চ দখল করে নিলে ইংলিশ ভাষা পরিণত হয় আন্তর্জাতিক ভাষায়, যার প্রতাপ আজ অবধি ক্রমবর্ধমান। অবশ্য ইতিহাসের পরিক্রমা সাক্ষ্য দেয় যে, ইংরেজীই চূড়ান্ত আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে চিরস্থায়ী নয়; বরং আবার অন্য কোন ভাষা এর স্থান দখল করবে এবং তারও একসময় অবসান ঘটবে। বর্তমানে চাইনিজদের অর্থনৈতিক শক্তি যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে তাদের ভাষার পক্ষে নতুন সম্ভাবনা তৈরী হচ্ছে। যদিও ভাষাটির গাঠনিক কাঠিন্য এর আন্তর্জাতিক উপযোগিতার ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা।

বিশ্বের প্রতিটি দেশেই একাধিক ভাষার অস্তিত্ব দেখা যায়। সরকারী ভাষা ও ২য় ভাষা হিসাবে এসব ভাষাকে চিহ্নিত করা হয়। বাংলাদেশে সরকারী ভাষা বাংলাসহ উপজাতীয় ভাষা, বিদেশী ভাষা মিলিয়ে ৪৬টি ভাষার অস্তিত্ব রয়েছে। পার্শ্ববর্তী ইন্ডিয়াতে রয়েছে ৪৪৫টি ভাষা। ইন্দোনেশিয়াতে ৭৭২টি। চীনে ২৯৬টি। পাকিস্তানে ৭৭টি। যুক্তরাষ্ট্রে ৩৬৪টি (বিদেশী ১৮৮টি)। যুক্তরাজ্যে ৫৬টি (বিদেশী ৪৪টি)। অষ্ট্রেলিয়ায় ২০৭ টি (বিদেশী ৪৮টি)।

অন্যদিকে প্রতিটি স্বতন্ত্র ভাষাও নিয়মিত নতুন নতুন শব্দ, বাগধারা সংযোজন-বিয়োজনের মাধ্যমে বিবর্তিত হচ্ছে। ফলে দেখা যায়, ষোল শতকের এলিজাবেথিয়ান ইংরেজীর সাথে আধুনিক ইংরেজীর বিরাট ফারাক। বাংলা ভাষার প্রাচীন নিদর্শনগুলোর সাথে আধুনিক বাংলার আকাশ-পাতাল তফাৎ। এভাবেই মানুষের সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক অগ্রগতির সাথে সাথে ভাষাসমূহের বিবর্তনের রূপ প্রবলতরভাবে সুস্পষ্ট।

১২. অর্থাৎ যে ভাষাকে কমপক্ষে একজন ব্যক্তি ১ম ভাষা হিসাবে ব্যবহার করে।

মোটকথা নানা প্রক্রিয়ায় ভাষাসমূহ নিয়মিতই বিবর্তিত হচ্ছে এবং হবে। সৃষ্টিজগতের একমাত্র বাকসম্পন্ন প্রাণী মানবজাতির ভাষার এই বৈচিত্র আল্লাহ্র তা'আলারই অসীম কুদরতের বহিঃপ্রকাশ।

ভাষাসমূহকে সুনির্দিষ্ট ব্যাকরণ দ্বারা সুসংহত করার প্রক্রিয়া সর্বপ্রথম দেখা যায় ইন্ডিয়ায়। খৃষ্টপূর্ব ৫ম শতকে পাণিনি নামক এক ব্যক্তি সংস্কৃত ভাষার ৩৯৫৯টি নিয়ম লিপিবদ্ধ করেন যা অষ্টাধ্যায়ী নামে পরিচিত। খৃষ্টপূর্ব ২য় শতকে তামিল ভাষার জন্য তোলকাপিয়াম নামক আরেক পণ্ডিত ব্যাকরণ রচনা করেন। মধ্যপ্রাচ্যে ৭৬০ খৃষ্টাব্দে আরব বৈয়াকরণ সিবওয়াইহ সর্বপ্রথম আরবী ব্যাকরণ রচনা করেন। যার নাম ছিল 'আল-কিতাব'। এই ব্যাকরণের মাধ্যমে ভাষাতাত্ত্বিক বহু জটিল দিক তিনি উন্মোচন করেন। তাঁর উদ্ভাবিত ধারাকে অনুসরণ করে পরবর্তীতে আরব ভাষাবিদরা নিয়মিতভাবে ব্যাকরণ চর্চার মাধ্যমে পরবর্তীতে কিছুকালের মধ্যেই আরবী ভাষাকে বিজ্ঞানভিত্তিক, সুশৃংখল, সুসমন্বিত ভাষায় পরিণত করেন। আরবী ভাষার পিছনে মুসলিম পণ্ডিতদের অধ্যবসায় ছিল কিংবদন্তীতুল্য। তাদের অবিরত প্রচেষ্টার মাধ্যমে আরবী ভাষা অন্যান্য ভাষার তুলনায় অনেক বেশী সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী ভাষা। তাছাড়া পবিত্র কুরআন আরবী ভাষায় লিখিত হওয়ায় এ ভাষার গাঠনিক কাঠামো ও বাহ্যিক প্রকাশরীতি বিগত পনেরশ' বছর ধরে প্রায় অবিকৃতই রয়েছে, যা অন্য কোন ভাষার ক্ষেত্রে ঘটেনি।

পাশ্চাত্যে ব্যাকরণ চর্চা শুরু হয় আরো অনেক পরে। ষোড়শ শতকে পাশ্চাত্যে ভাষার ব্যাকরণ সম্পর্কিত আলোচনা ফিলোলজি (ভাষাতত্ত্ব) পরিভাষার অন্তরালে ব্যবহৃত হত। প্রকৃতার্থে ব্যাকরণ চর্চা সেখানে শুরু হয় যখন অষ্টাদশ শতকে বৃটিশ ইন্ডিয়ার মাধ্যমে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য পাশ্চাত্যের দোরগোড়ায় পৌঁছাল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই সুষম মেলবন্ধনে একই সাথে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর উদ্ভব এবং ভাষাসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক ও গাঠনিক সাদৃশ্য আবিস্কৃত হয়। উইলিয়াম জোন্স, ফ্রেডরিখ শ্লেঘেল, ফ্রাঞ্জ বপ্, অগাষ্ট ফ্রেডরিখ পট্ প্রমুখ এক্ষেত্রে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন। এরপর জ্যাকব গ্রিম রচনা করেন ডাচ ভাষার ব্যাকরণ 'ডাচ গ্রামাটিক'। যাকে পাশ্চাত্যে সর্বপ্রথম বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাকরণ বই হিসাবে মর্যাদা দেয়া হয়। শীঘ্রই তাঁর অনুসরণে অন্যান্য ইন্দো-ইউরোপিয়ান ভাষাতেও ব্যাকরণ রচিত হতে শুরু করে। অতঃপর জাভানিজ ভাষার ব্যাকরণ রচনা করে প্রুশিয়ার পণ্ডিত উইলহেলম ভন হামবোল্ট (১৭৬৭-১৮৩৫) অন্যান্য ভাষাতেও ব্যাকরণ রচনার পথ অবারিত করেন। বিংশ শতাব্দীতে সুইস পণ্ডিত ফার্ডিন্যান্ড ডি সশার ভাষার ধারণাকে 'সেমানটিক কোড' (অভ্যন্তরীণ কাঠামো ও বাহ্যিক প্রকাশের মধ্যে পার্থক্য নিরূপক সংকেত) দ্বারা চিহ্নিত করেন। এভাবে আরো কিছু পণ্ডিতের মৌলিক অবদানের মাধ্যমে ব্যাকরণ তথা ভাষাবিজ্ঞান একটি পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্রে পরিণত হয়।

নিম্নে বিশ্বের প্রধান প্রধান ১০টি ভাষাগোষ্ঠী (Language family) সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত একটি ধারণা দেওয়া হল :

১. **ইন্দো-ইউরোপীয়** (৪২৬টি) : এই ভাষাপরিবারটির চারটি প্রধান শাখা রয়েছে : ইন্দো-ইরানীয়, রোমান্স, জার্মানীয় ও বাল্টো-স্লাভীয়। এই ভাষাপরিবারভুক্ত ভাষায় মানুষ সর্বাধিক কথা বলায় (প্রায় ২৭৩ কোটি) এ ভাষাগোষ্ঠীর উপরই সর্বাধিক গবেষণা হয়েছে। এ পরিবারের উল্লেখযোগ্য ভাষাগুলো- ইংরেজী, স্প্যানিশ, পর্তুগিজ, ফরাসি, ইতালীয়, জার্মান, রুশ, গ্রীক, ফার্সি, পশতু, উর্দু, হিন্দী, বাংলা ইত্যাদি। এছাড়া প্রাচীন ধ্রুপদী ভাষা সংস্কৃত, ল্যাটিনও এই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত।

২. **উরালীয়** (৩৫টি) : উরাল পর্বতের পাদদেশীয় ইউরোপ ও সাইবেরিয়ায় অবস্থিত এই ভাষাপরিবারের বিশেষ্যপদের সংগঠন জটিল। এ গোষ্ঠীর অন্তর্গত ভাষাগুলো- হাঙ্গেরীয়, ফিনীয়, মর্দভিন, সুইডিশ, নরওয়েজ ইত্যাদি।

৩. **আলতায়ীয়** (৬৪টি) : তুরস্ক থেকে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ভাষা পরিবার। এর অন্তর্গত ভাষাগুলো- তুর্কি, উজবেক, মঙ্গোলীয় এবং (মতভেদে) কোরীয় ও জাপানীয়।

৪. **চীনা-তিব্বতী** (৪৪৫টি) : বিশ্বের সবচেয়ে বেশী কথিত ভাষা মান্দারিন চীনা এই এশীয় ভাষা পরিবারের অন্তর্গত। এই ভাষাগুলো একাক্ষরিক ও সুরপ্রধান।

৫. **মালয়-পলিনেশীয়** (১২৩১টি) : ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরের বুক জুড়ে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জুড়ে বিস্তৃত ভাষা পরিবার। এ গোষ্ঠীর অন্তর্গত ভাষাগুলোর মাঝে আছে মালয়, ইন্দোনেশীয়, মাওরি ও হাওয়াই ভাষা।

৬. **আফ্রো-এশীয়** (৩৫৩টি) : এই ভাষা পরিবারের ভাষাগুলো মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা জুড়ে বিস্তৃত। আরবী ও হিব্রু এদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

৭. **ককেশীয়** (৩৩টি) : কৃষ্ণ সাগর ও কাস্পিয়ান সাগরের মধ্যবর্তী ককেশাস পর্বতমালা অঞ্চলের ভাষাসমূহ এর অন্তর্ভুক্ত। জর্জীয়, চেচেন ভাষা এখানকার মূল ভাষা।

৮. **দ্রাবিড়** (৮৪টি) : এগুলি দক্ষিণ ভারতের ভাষা। তামিল, তেলেগু, কন্নড, মালয়ালম ভাষা সবচেয়ে বেশী প্রচলিত চারটি দ্রাবিড় ভাষা।

৯. **অষ্ট্রো-এশীয়** (১৬৯টি) : এশিয়ার বিচ্ছিন্ন ভাষাসমূহ। পূর্ব ভারত থেকে ভিয়েতনাম পর্যন্ত এদের বিস্তৃতি। ভিয়েতনামীয় ও খমের ভাষা অন্যতম উদাহরণ।

১০. **নাইজার-কঙ্গো** (১৫১০টি) : সাহারা মরুভূমির দক্ষিণে কথিত আফ্রিকার ভাষাসমূহ নিয়ে এ পরিবার গঠিত। সোয়াহিলি, সহোনা, খোসা ও জুলু এই পরিবারের ভাষার উদাহরণ।

নিম্নে বর্তমান বিশ্বে সর্বাধিক প্রচলিত ৩০টি ভাষা ও সেসব ভাষাভাষীদের সংখ্যা উল্লেখ করা হল। -

ক্রঃ নং	ভাষা	ভাষাগোষ্ঠী	ভাষাভাষীদের সংখ্যা	বিবরণ
১	**মান্দারিন/ চাইনিজ**	চীনো-তিব্বতিয়ান	**মাতৃভাষা** : ৮৭ কোটি ৩০ লক্ষ **২য় ভাষা** : ১৭ কোটি ৮০ লক্ষ মোট : ১০৫ কোটি ১০ লক্ষ	চীন, সিঙ্গাপুর,
২	**হিন্দী**	ইন্দো-ইউরোপিয়ান, ইন্দো-ইরানিয়ান, ইন্দো-আর্য	**মাতৃভাষা** : ৩৭ কোটি, **২য় ভাষা** : ১২ কোটি মোট : ৪৯ কোটি	ইন্ডিয়া ও ফিজি
৩	**স্প্যানিশ**	ইন্দোইউরোপিয়ান, ইটালিক, রোমান্স	**মাতৃভাষা** : ৩৫ কোটি, **২য় ভাষা** : ৭ কোটি মোট : ৪২ কোটি	দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল বাদে বাকী দেশসমূহ এবং ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের কয়েকটি দেশ এবং যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও আমেরিকা
৪	**ইংরেজী**	ইন্দো-ইউরোপিয়ান	**মাতৃভাষা** : ৩৪ কোটি, **২য় ভাষা** : ১৭ কোটি মোট : ৫১ কোটি	সবকটি মহাদেশের ৬৩টিরও বেশী দেশে এ ভাষা ১ম বা ২য় ভাষা হিসাবে প্রচলিত।

৫	**আরবী**	আফ্রো-এশিয়াটিক, সেমেটিক	**মাতৃভাষা** : ২০ কোটি ৬০ লক্ষ, **২য় ভাষা** : ২ কোটি ৪০ লক্ষ, মোট : ২৩ কোটি অন্য পরিসংখ্যানে ২৫ কোটি ৫০ লক্ষ	এশিয়া ও আফ্রিকার ২৯টি দেশে এ ভাষার প্রচলন আছে
৬	**পর্তুগিজ**	ইন্দো ইউরোপিয়ান, ইটালিক, রোমান্স	**মাতৃভাষা** : ২০কোটি ৩০ লক্ষ, **২য় ভাষা** : ১ কোটি, মোট : ২১ কোটি ৩০ লক্ষ	দ: আমেরিকার ব্রাজিল, ইউরোপের পর্তুগাল ও আফ্রিকার কয়েকটি দেশে এই ভাষা প্রচলিত
৭	**বাংলা**	ইন্দো ইউরোপিয়ান, ইন্দো-ইরানীয়, ইন্দো-আর্য	**মাতৃভাষা** : ১৯ কোটি ৬০ লক্ষ মোট : ২১ কোটি ৩০ লক্ষ	বাংলাদেশ, ইন্ডিয়ার পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও আসামের কাছাড়, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি জেলা এবং সিয়েরালিয়ন
৮	**রুশ**	ইন্দো-ইউরোপিয়ান, স্লাভিক, ইস্ট স্লাভিক	**মাতৃভাষা** : ১৪ কোটি ৫০ লক্ষ, **২য় ভাষা:** ১ কোটি ১০ লক্ষ, মোট : ২৫ কোটি ৫০ লক্ষ	রাশিয়া, মালদোভা, কাজাখস্তান, কিরগিজিস্তান, বেলারুশ, জর্জিয়া
৯	**জাপানিজ**	জাপানিক ভাষা	**মাতৃভাষা** : ১২ কোটি ৬০ লক্ষ, **২য় ভাষা** : ১০ লক্ষ, মোট : ১২ কোটি ৭০ লক্ষ	জাপান, পালাউ
১০	**জার্মান**	ইন্দো-ইউরোপিয়ান, জার্মানিক, পশ্চিম জার্মানিক	**মাতৃভাষা:** ১০ কোটি ১০ লক্ষ, **২য় ভাষা:** ১২ কোটি ৮০ লক্ষ, মোট: ২২ কোটি ৯০ লক্ষ	জার্মানী, অষ্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, ইটালী, লিচটেনষ্টেইন, লুক্সেমবার্গ, পোলান্ড,
১১	**পাঞ্জাবী**	ইন্দো-ইউরোপিয়ান, ইন্দো-ইরানিয়ান, ইন্দো- ইন্দো-আর্য	**মাতৃভাষা:** ৬ কোটি, **২য় ভাষা:** ২ কোটি ৮০ লক্ষ, মোট: ৮ কোটি ৮০ লক্ষ	ইন্ডিয়া (পাঞ্জাব), পাকিস্তান
১২	**জাভানিজ**	অষ্ট্রেলেশিয়ান, মালায়ো-পলিনেসিয়ান, সুন্দা-সুলায়েসী	৭ কোটি ৬০ লক্ষ	ইন্দোনেশিয়া (জাভা), মালয়েশিয়া, সুরিনাম
১৩	**কোরিয়ান**	বিচ্ছিন্ন ভাষা	৭ কোটি ১০ লক্ষ	উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া
১৪	**ভিয়েতনামিজ**	অষ্ট্রো-এশিয়াটিক, ভিয়েটিক	**মাতৃভাষা** : ৭ কোটি, **২য় ভাষা** : ১ কোটি ৬০ লক্ষ, মোট : ৮ কোটি ৬০ লক্ষ	ভিয়েতনাম
১৫	**তেলেগু**	দ্রাবিড়	**মাতৃভাষা** : ৭ কোটি, **২য় ভাষা** : ৫০ লক্ষ মোট : ৭ কোটি ৫০ লক্ষ	ইন্ডিয়া (অন্ধ্র প্রদেশ)
১৬	**মারাঠী**	ইন্দো-ইরানিয়ান, ইন্দো-আর্য, ইন্দো-ইরানিয়ান	**মাতৃভাষা** : ৬ কোটি ৮০ লক্ষ, **২য় ভাষা** : ৩০ লক্ষ, মোট : ৭ কোটি ১০ লক্ষ	ইন্ডিয়া (গোয়া, মহারাষ্ট্র)
১৭	**তামিল**	দ্রাবিড়	**মাতৃভাষা** : ৬ কোটি ৮০ লক্ষ, **২য় ভাষা** : ৯০ লক্ষ, মোট : ৭ কোটি ৭০ লক্ষ	ইন্ডিয়া (তামিল নাড়ু), সিঙ্গাপুর, শ্রীলংকা
১৮	**ফ্রেঞ্চ**	ইন্দো ইউরোপিয়ান, ইটালিক, রোমান্স	**মাতৃভাষা** : ৬ কোটি ৭০ লক্ষ, **২য় ভাষা** : ৬ কোটি ৩০ লক্ষ, মোট : ১৩ কোটি	এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ও উত্তর আমেরিকার প্রায় ৪০ টি দেশে ভাষাটি প্রচলিত
১৯	**উর্দূ**	ইন্দো-ইউরোপিয়ান, ইন্দো-ইরানিয়ান, ইন্দো-আর্য	**মাতৃভাষা** : ৬ কোটি ১০ লক্ষ , **২য় ভাষা** : ৪ কোটি ৩০ লক্ষ, মোট : ১০ কোটি ৪০ লক্ষ	ইন্ডিয়া (জম্মু-কাশ্মীর), পাকিস্তান
২০	**ইটালিয়ান**	ইন্দো ইউরোপিয়ান, ইটালিক, রোমান্স	৬ কোটি ১০ লক্ষ	ক্রোয়েশিয়া, ইটালী, সান মেরিনো, স্লোভেনিয়া, সুইজারল্যান্ড
২১	**টার্কিশ**	আলটাইক, টারকিক, অঘুজ	**মাতৃভাষা** : ৬ কোটি, **২য় ভাষা** : ১ কোটি ৫০ লক্ষ, মোট : ৭ কোটি ৫০ লক্ষ	তুরস্ক, বুলগেরিয়া, সাইপ্রাস, দক্ষিণ সাইপ্রাস
২২	**পশতু**	ইন্দো-ইউরোপিয়ান, ইন্দো-আর্য, ইন্দো-ইরানিয়ান	৫ কোটি ৪০ লক্ষ	আফগানিস্তান, ইরান, তাজিকিস্তান
২৩	**তাগালগ**	অষ্ট্রেলেশিয়ান, মালায়ো-পলিনেসিয়ান, ফিলিপ্পিন	৪ কোটি ৮৯ লক্ষ	ফিলিপাইন
২৪	**গুজরাটি**	ইন্দো-ইউরোপিয়নি, ইন্দো-আর্য, ইন্দো-ইরানিয়ান	৪ কোটি ৬০ লক্ষ	ইন্ডিয়া
২৫	**পোলিশ**	ইন্দো-ইউরোপিয়ান, স্লাভিক, ইস্ট স্লাভিক	৪ কোটি ৬০ লক্ষ	পোল্যান্ড
২৬	**ইউক্রেনিয়ান**	ইন্দো-ইউরোপিয়ান, স্লাভিক, ইস্ট স্লাভিক	৩ কোটি ৯০ লক্ষ	ইউক্রেন, মালদোভা
২৭	**মালয়ী**	অষ্ট্রেলেশিয়ান, মালায়ো-পলিনেসিয়ান, সুন্দা-সুলায়েসী, মালাইক	৩ কোটি ৯১ লক্ষ	ব্রুনেই, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড
২৮	**উড়িয়া**	ইন্দো-ইউরোপিয়নি, ইন্দো-আর্য, ইন্দো-ইরানিয়ান	৩ কোটি ২০ লক্ষ	ইন্ডিয়া (উড়িষ্যা)
২৯	**বার্মিজ**	সিনো-তিব্বতিয়ান, তিব্বতী-বার্মান. লোলো বার্মিজ	৪ কোটি ২০ লক্ষ (২য় ভাষা : ১ কোটি)	মায়ানমার
৩০	**থাই**	কারাডি, তাই	৬ কোটি লক্ষ (২য় ভাষা : ৪ কোটি)	থাইল্যান্ড

অপসংস্কৃতির বিষাক্ত ছোবল : তরুণ সমাজের করণীয়

আফতাবুযযামান শরীফ

অপসংস্কৃতির কৃষ্ণ-কালো ধূম্রকুঞ্জ যে হারে বাংলাদেশের আকাশ-বাতাসকে গ্রাস করে চলেছে তা এক কথায় বর্ণনাতীত। অপসংস্কৃতির অপ্রতিহত বিস্তারের সাথে পাল্লা দিয়ে মানুষের দৈনন্দিন জীবন থেকে অপসৃত হচ্ছে ধর্ম ও সমাজে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে লালিত মূল্যবোধভিত্তিক ধ্যান-ধারণা, নৈতিকতা, আদর্শ ইত্যাদি। আর সে শূন্যস্থান পূরণ করছে নিছক জৈবিক পরিতুষ্টির পাশবিক চিন্তাধারা। যার সুস্পষ্ট প্রভাব পড়ছে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি সেক্টরে। ধর্মহীনতা, নৈতিকতাবিচ্ছিন্ন সংশয়বাদিতা, উন্নাসিকতার সুতীব্র প্লাবনে শিকড়বিহীন কচুরীপানার মত অস্থিরচিত্ত মানুষ ধাবিত হচ্ছে এক অনিশ্চিত অজানা গন্তব্যের পানে।

আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির দেউলিয়াত্ব যে কতটা নিম্নস্তরে অবস্থান করছে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ আমাদের নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি। সেখানে প্রাথমিক পর্যায়ে ধর্মশিক্ষার পরিবর্তে নৈতিকতা শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আর নৈতিকতার শিক্ষার উপকরণ হিসাবে সেখানে সংযোজিত হয় ললিতকলা তথা চিত্রাংকন, নৃত্য-গীত ইত্যাদি বিনোদনমাধ্যম। আমাদের জাতীয় পরিমণ্ডলে সংস্কৃতি যে কতটা সংকীর্ণ ও অগৌণ পরিভাষা তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ এটি। জাতির পরবর্তী প্রজন্মের জন্য অন্তরবৃত্তির সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ তথা ধর্মকে উপেক্ষা করে শিক্ষানীতিতে এমনসব বিষয়কে মৌলিক হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা কি-না কেবল একটি ধর্মহীন, আদর্শহীন, সভ্যতার ছোঁয়াবিহীন জাতির পক্ষেই কামনা করা সম্ভব। বড় আফসোস হয় যেখানে সংস্কৃতি কোন জাতির সভ্যতা-বিশ্বাসের স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ তখন একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এতবড় আদর্শহীন, মূল্যবোধহীন শিক্ষানীতি কীভাবে জাতীয় স্বীকৃতি পায়? বলা বাহুল্য, শরীরে ক্যানসারের অনুপ্রবেশ করলে খুব বেশী দিন তা চামড়ার অভ্যন্তরে ঘাপটি মেরে থাকে না। যে কোন সময় অকস্মাৎ আক্রমণে সে আক্রান্ত ব্যক্তিকে ধরাশায়ী করে ফেলে তার চূড়ান্ত অধঃপতন সুনিশ্চিত করে। নৈতিক অবক্ষয়ও তেমনি একটি সুপ্ত অথচ অতি ধ্বংসাত্মক রোগ, যা মানুষের জীবনে মনুষ্যত্ব নামক শক্তিকে কুরে কুরে খেয়ে ফেলে তদস্থলে পাশবিক শক্তির ভয়ংকর উত্থান ঘটায়। অথচ আমাদের শিশু বয়সের সুকোমল শিক্ষাজীবন যার একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত ছিল মনুষ্যত্বের উত্থান সেখানে নৈতিকতার বিষয়টিই সবচেয়ে উপেক্ষিত?

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, নাটক-সিনেমা, নৃত্য-গীত, কবিতা-উপন্যাসের প্রচার-প্রসার বাংলাভাষায় নতুন নয়। গত একশত বছরে এসব যে কতগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। প্রতিটি ক্ষেত্রেই আন্তর্জাতিক পুরস্কারও কম জোটেনি। তারপরও জাতিকে কি প্রত্যাশিত আদর্শবান সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে? সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি সত্যিকার অর্থে নিবেদিতপ্রাণ, দায়িত্বশীল কতজন লোকের উদ্ভব ঘটেছে? যদি বলা হয় যে হয়েছে, তথাপি এটা সুনিশ্চিত যে তা প্রত্যাশিত মাত্রার দূরবর্তী কোন অবস্থানেও নেই। দেশের শিক্ষাঙ্গনগুলো যেন আজ জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড। বিদ্যার্জনের সাথে সাথে সন্ত্রাস, অস্ত্রবাজিও ছাত্রত্বের পরিচয় হতে পারে তা ইতিপূর্বে অকল্পনীয় হলেও আজ তা অতি বাস্তব। এমন তো হওয়ার কথা ছিল না? পৃথিবীর কোটি কোটি বছরের ইতিহাসে সমাজ বিবর্তনের সূত্র ধরে সভ্যতার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণের দাবীদার আজ আধুনিক বিশ্ব। অথচ তারপরও শিক্ষার মহোত্তম সেই দুয়ার আজ ধ্বংসের লীলাখেলায় কেন পরিণত হল? কী কারণে আজ ছাত্র-ছাত্রীর দ্বারা শিক্ষক, শিক্ষকের দ্বারা ছাত্র-ছাত্রী অবাধে অবলীলাক্রমে লাঞ্ছিত হচ্ছে? কেন আজ সর্বোচ্চ শ্রদ্ধার আসনের অধিকারী শিক্ষক স্বীয় (সভ্য?) ছাত্রের হাতের কারুকার্যে বেদনাহত, সম্ভ্রমহীন? কেন অশ্লীলতা, বেলেল্লাপনার দৌরাত্ম্যে সমাজ আজ আপাদমস্তক বিপর্যস্ত? কেন দেশের প্রতিটি সেক্টর আকণ্ঠ দুর্নীতিতে নিমজ্জিত? কেন শত-সহস্র মনীষার গৌরবধন্য বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক মতবাদ, জনগণের ব্যক্তিগত ও সামাজিক নিরাপত্তার চাবিকাঠি গণতন্ত্র (?) আজ ভদ্রমানুষের আলখেল্লা গায়ে চড়ানো নীরব রক্তচোষার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে, যার ছত্রছায়ায় সাধারণ জনমানুষ সর্বত্র নিপীড়িত, জর্জরিত, নিষ্পেষিত? দিনে দিনে পরিস্থিতি অবনতির অন্তহীন চোরাগলির দিকেই ধাবমান। সমাজে দুর্নীতিই এখন নীতি, অশ্লীলতাই এখন শ্লীলতা, অসভ্যতা-বর্বরতাই সভ্যতা হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে। আর ন্যায়বিচারের বাণী তো সমাজের সবচেয়ে নিচু তলার বাসিন্দা। সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে, সংস্কৃতির যে শ্লোগান ক্ষণে ক্ষণে উচ্চারিত হচ্ছে সেমিনার-মিডিয়ায় সর্বত্র তা অর্থহীন ফাঁপা কিছু বুলি মাত্র। যার বাস্তবতা নেশা ধরানো রং-তামাশা, আনন্দ-উন্মাদনা উপভোগের মত অমৌল বিষয়কে ঘিরেই পরিবৃত্ত, রিপুচর্চাই যার মূখ্য উদ্দেশ্য। মৌলিক যে সংস্কৃতি মানবের মন ও মননের বিকাশ ঘটায়, চেতনারাজ্যকে রুচিবোধ, আত্মমর্যাদা, সৃজনশীলতার আলোকমালায় উদ্ভাসিত করে, সর্বোপরি মানুষকে মানুষ হিসাবে গড়ে ওঠার প্রেরণায় উজ্জীবিত করে তা দেওয়ার ক্ষমতা প্রচলিত সাহিত্য ও ললিতকলার নেই। এতদসত্ত্বেও নর্দমার কীট-পতঙ্গ যেমন দুর্গন্ধময় আবর্জনার মিশ্রিত গরলে স্বাচ্ছন্দ্যে সাঁতার কাটে; তার মাঝেই আনন্দে অবগাহন করে তৃপ্তিলাভ করে, তেমনি তথাকথিত আধুনিক সংস্কৃতিসেবী নামধারীরা জাতিকে নেশাগ্রস্তের মত এমন এক সংস্কৃতির মাঝে হারিয়ে দিতে চায় যেখানে ভাল-মন্দের পার্থক্য করার প্রয়োজন হয় না; বরং স্বীয় প্রবৃত্তির স্বেচ্ছাচারিতাই পরিণত হয় কর্মের ভিত্তি। যার পরিণাম স্বাভাবিকভাবেই অজপাড়াগাঁয়ের পর্ণকুটির থেকে শুরু করে মেগাসিটির সুউচ্চ অট্টালিকা পর্যন্ত অন্যায়-অনাচার, অশ্লীলতার অপ্রতিরোধ্য প্লাবন। যার বিবরণ উল্লেখ করে পাঠকের শুচি-শুভ্র মননে বৈকল্য ঘটাতে চাই না। পুঁতিগন্ধময় আবর্জনা যেমন মশককুলের নিরাপদ অভয়ারণ্যে পরিণত হয়, তেমনি দেশের প্রতিটি স্তরে দুষ্ট-নোংরা, আদর্শহীন, চেতনাহীন লোকের অবাধ বিচরণ আর দুর্নীতিবাজ-দুষ্কৃতিকারীদের দৌরাত্ম্য, উল্লম্ফন গভীরভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর এ সবকিছু জেনে-বুঝেও চোখ বুজে মেনে নেয়ার জন্য সমাজ, রাষ্ট্র যেন আমাদের প্রতিনিয়ত তাগাদা দিচ্ছে, এমনকি

ক্ষেত্রবিশেষে বাধ্য করছে। নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি'১০-এর সকরুণ চিত্র আমাদেরকে যেন এই দীক্ষাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

জাতীয় সংস্কৃতির এমন চরম ক্রান্তিকালে যুবসমাজের সিংহভাগ যখন এক অনিশ্চিত গন্তব্যহীন মোহগ্রস্ত জীবনের পথ বেছে নিচ্ছে, এই বস্তাপচা সংস্কৃতির প্রধানতম শিকার হয়ে যখন তারা নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তখন এই যুবসমাজেরই ধর্মীয় বিচারবুদ্ধি দ্বারা তাড়িত অপর একটি অংশ- যারা শত বাধা মুকাবিলা করে সামাজিক দায়বদ্ধতার শিক্ষাকে নিজেদের মাঝে সুচারুরূপে বপন করতে সক্ষম হয়েছে, তাদের এগিয়ে আসতে হবে ত্রাতার ভূমিকায়। আসমান-যমীনের সৃষ্টিরাজির মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মনোনীত একমাত্র ধর্ম ইসলামের সুমহান বৈপ্লবিক চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে জাতিকে দেখাতে হবে চিরন্তন সত্য ও সুন্দরের বাহক এক সংস্কৃতির সত্যালোক শোভিত রাজপথ। যে সংস্কৃতির তীব্র আলোকচ্ছটায় বিশ্বজাহান আলোকিত হয়ে উঠেছিল মাত্র কয়েক বছরে। যে সংস্কৃতি শেখানোর জন্য কোন রূপকথার গল্প-উপন্যাস, নাটক-সিনেমার প্রয়োজন হয়নি, প্রয়োজন হয়নি তথাকথিত কোন মননবিদ্যার, ললিতকলার। মহান প্রভুর বিস্তীর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাজ্যের এক-একজন খলীফা হিসাবে তাদের মাঝে যে সুস্থ চেতনা, রুচিবোধ, আত্মমর্যাদা, ভ্রাতৃত্ববোধের উন্মেষ ঘটেছিল তা ছিল খুবই বাস্তবতাপূর্ণ ও প্রায়োগিক। ভাবের রাজ্যে বিচরণ করে অর্থহীন দিবাস্বপ্ন দেখার কোন জায়গা সেখানে ছিল না। ছিল না কোন বিলাস বাগাড়ম্বর বা নিরর্থক প্রগলভতা। যা ঘটেছিল তা ছিল অতি সরল, স্বাভাবিক ও জটিলতামুক্ত। সত্য, কল্যাণ ও ন্যায়ের চর্চা এবং তার স্বতঃস্ফূর্ত বাস্তবায়নই ছিল সে সংস্কৃতির একমাত্র লক্ষ্য। ফলে সেই মহান সংস্কৃতির ছায়াতলে বেড়ে উঠেছিলেন এমনসব মহৎ পুরুষ যারা আজও পর্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাসে চিরস্মরণীয়-বরণীয় হয়ে রয়েছেন। যে সমাজ, যে রাষ্ট্র এ সংস্কৃতির ছায়াতলে প্রতিপালিত হয়ে তাবৎ বিশ্বকে নেতৃত্ব দিয়েছিল তা আজও পর্যন্ত বিশ্ববাসীর জন্য মডেল হয়ে রয়েছে।

তবে হ্যাঁ, দেশ ও সমাজের পরিস্থিতি দেখে হতাশ হলে চলবে না। সমাজের আলোকোজ্জীবিত উৎকৃষ্ট একটি অংশ এই চরম মুহূর্তে যদি কেবল হতাশা, বেদনা প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হয় তবে সমাজকে পথের দিশা দেখানোর জন্য কে এগিয়ে আসবে? কে তাদেরকে বোঝাবে অনন্ত জীবনের প্রস্তুতি গ্রহণের তাৎপর্য? অতএব এগিয়ে আসতেই হবে আলোকের আবাহনে, মুক্তির বার্তা নিয়ে দৃপ্ত শপথে। বস্তুবাদী সংস্কৃতির অসারতা, অর্থহীনতাকে মানুষের সামনে সুস্পষ্ট করতে হবে। ইসলামী সংস্কৃতির অর্থপূর্ণ, উদার আলোকময় জগৎকে তাদের চিন্তা-মননের গভীরতম প্রদেশে গেঁথে দিতে হবে। এভাবেই ব্যক্তি থেকে শুরু করে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিশুদ্ধি আসবে। যুথবদ্ধ সামষ্টিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমাজে সামগ্রিক পরিবর্তন একদিন আসবেই আসবে। অতএব হে মুসলিম তরুণ প্রজন্ম! নিজেকে অহি-র জ্ঞানালোকে সুশোভিত করো, সে শোভা দিয়ে তোমার পরিপার্শ্বকে সত্য, কল্যাণ ও ন্যায়ের সৌরভ দিয়ে নতুনভাবে ঢেলে সাজাও। নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ! তোমার ফোটানো এই ফুল কখনই বৃথা যাবে না। যদিওবা এ ফুলের সৌরভে মেতে না উঠে দুনিয়ার শত-সহস্র প্রাণ, তবু জেনে রেখ পরকালীন যিন্দেগীর নিরুপায় মুহূর্তে এ সৌরভস্নিগ্ধ ফুলই হবে তোমার চক্ষুশীতলকারী মহাসম্পদ; যার তুলনা, যার বিনিময় ইহজীবনের সমস্ত মূল্যেরও অতীত। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন- আমীন!!

এমন পাপ যা জান্নাতের পথ দেখায়

ইবনুল কাইয়িম আল-জাওযিয়্যাহ বলেন, পাপ কখনও মানুষের জন্য কল্যাণকর বিবেচিত হতে পারে আল্লাহ্র ইবাদতে ব্যস্ত থাকার চেয়ে, যদি সে পাপ তাকে তওবা করার পথ খুলে দেয়। একজন বিদ্বানের কথায় সেটি আরো স্পষ্ট হয়। তিনি বলেন, 'কোন কোন মানুষ আছে যারা পাপকাজ করে অথচ তা তাকে জান্নাতে প্রবেশের উপলক্ষ তৈরী করে দেয়। আবার কোন কোন মানুষ সৎআমল করে অথচ তা তার জন্য জাহান্নামে প্রবেশের উপলক্ষ হয়ে যায়।' এটা এভাবে যে, সে ব্যক্তিটি পাপ করার কারণে সবসময় চিন্তামগ্ন হয়ে থাকে। চলায়-ফেরায়, উঠায়-বসায় সে সবসময় পাপটি স্মরণ করতে থাকে। ফলে সে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়। সে আল্লাহ্র কাছে কায়মনোবাক্যে ক্ষমা চায় এবং অনুশোচনা করে। ফলে সেটি তার জন্য মুক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অপর দিকে কোন ব্যক্তি কোন উত্তম কাজ সম্পন্ন করার পর তা স্মরণ করতে থাকে, চলায়-ফেরায়, শুয়ে-বসে ঐ সুখস্মৃতিই সে চারণ করতে থাকে যা তার মধ্যে আত্মগর্ব ও অহংকারের সৃষ্টি করে এবং শেষপর্যন্ত তাকে ধ্বংসপ্রাপ্তদের দলভুক্ত করে ফেলে।

সুতরাং পাপ কখনও এমন উপলক্ষও হতে পারে যা ব্যক্তিকে আল্লাহ্র ইবাদতে পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করা এবং সৎআমল করার পথ খুলে দেয়; তার আচরণে এমন পরিবর্তন এনে দিতে পারে যার ফলে সে আল্লাহকে ভয় করতে শুরু করে এবং তাঁর সম্মুখে স্বীয় অপকর্মে লজ্জিত ও অবনত হয়। লজ্জায়, অনুশোচনায় মাথা হেট করে সে ক্রন্দনসিক্ত হয়ে পড়ে এবং আল্লাহ্র কাছে বারবার ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। পাপের পর এ সকল প্রতিক্রিয়ার ফলাফল একজন ব্যক্তির মাঝে অনেক উত্তম প্রভাব ফেলে ঐ ইবাদতগুজার ব্যক্তির চেয়ে, যার ইবাদত তাকে অহংকারে স্ফীত করে এবং সেকারণে সে অন্যদেরকে খাটো নজরে দেখতে থাকে। আর সে মনে করে যেন সে আল্লাহকে সহযোগিতা করছে। এমনকি সে এমন কিছু বলে ফেলে যাতে মনে হয় যেন আল্লাহ তার হৃদয়ের খবর রাখেন না। এসব লোক কখনো মানুষের প্রতি রূঢ় আচরণ করে থাকে অথবা সামনাসামনি তাদেরকে অপমানিত করে দেয় যখন সে তাদের কাছ থেকে উপযুক্ত মর্যাদা পায় না। সে যদি যথার্থভাবে নিজের প্রতি নজর দিত তাহলে সে নিজের এই অবস্থান পরিস্কারভাবে উপলব্ধি করত *(মাদরিজুস সালেকীন ১/২৯৯)*।

ভীরুতা-কাপুরুষতা জিজ্ঞাসা করে- এটা কি নিরাপদ?
পরিকল্পিত কাজ জিজ্ঞাসা করে- এটা কি বিচক্ষণতাপূর্ণ?
আত্মগর্ব জিজ্ঞাসা করে- এটা কি জনপ্রিয়?
কিন্তু বিবেক জিজ্ঞাসা করে- এটি কি 'সঠিক'?
হ্যাঁ! একটি সময় আসবে যখন মানুষকে এমন অবস্থান গ্রহণ করতে হবে যা নিরাপদ, বিচক্ষণতাপূর্ণ বা জনপ্রিয় নয় অথচ সে তা গ্রহণ করবে এ কারণে যে, তা 'সঠিক'।
---------- *মার্টিন লুথার কিং*

মাইকেল জ্যাকসনের ইসলাম গ্রহণ (?) : একটি বিশ্লেষণ

মুখতারুল ইসলাম

২৫ জুন'০৯ তারিখে ৫০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন আমেরিকান পপ সিঙ্গার মাইকেল জ্যাকসন। গিনেস বুক অব রেকর্ডস অনুসারে সর্বকালের সবচেয়ে সফল শিল্পী বিচিত্র চরিত্রের এই গায়ক মৃত্যুর পূর্বে যেমন নানা ঘটন-অঘটনের জন্ম দিয়ে সারা দুনিয়ায় আলোচিত ছিলেন, তেমনি মৃত্যুর পর অদ্যাবধি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতেই রয়েছেন। ২০০৮ সালের শেষের দিকে প্রথম মিডিয়ায় খবর আসে যে, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং নতুন নাম গ্রহণ করেছেন 'মিকাইল'। বাহরাইনে আরবদের সাথে তোলা বিভিন্ন ছবিতে তার আরবীয় পোষাক পরিধান বিষয়টিকে আরো জোরদার করে তুলে। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যে জ্যাকসন নিজে কখনো এরূপ ঘোষণা দেননি, এমনকি মিডিয়ায় বারবার আলোচনা উঠে আসার পরও পক্ষে-বিপক্ষে তাঁর কোন মন্তব্যও পাওয়া যায়নি। তাঁর মৃত্যুর পর যখন পুনরায় তাঁকে নিয়ে বিশ্বব্যাপী আলোচনার ঝড় ওঠে, তখনও তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন না করেননি তা নিয়ে বহু বিতর্ক হয়। তাঁর মৃত্যুর দুই সপ্তাহ পর ৭ জুলাই লস্ এঞ্জেলসের স্টাপল সেন্টারে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া চলাকালীন যখন বিশ্বের প্রায় ৩২ মিলিয়ন টিভি দর্শক অবাক বিস্ময়ে সে দৃশ্য অবলোকন করেছিল, তখনও তার লাশ ইসলামী রীতিতে দাফন হবে কি-না তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা অব্যাহত ছিল। পরিশেষে তার লাশ দাফন করা হয় অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে তার বাসস্থান নেভারল্যান্ডে। সর্বশেষ ৩ সেপ্টেম্বর' ০৯ ক্যালিফোর্নিয়ার ফরেস্ট লোন মেমোরিয়াল পার্কে পুনরায় কবরস্থ করা হয় অন্যান্য হলিউড লিজেন্ডারীদের সাথে। পরবর্তীতে তদন্ত রিপোর্টে তাঁর মৃত্যুকে একটি হত্যাকাণ্ড হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসকের বিরুদ্ধে এ মর্মে মামলাও করা হয়েছে। যা এখনও আদালতে বিচারাধীন।

তার ইসলাম গ্রহণ নিয়ে এখানেই আলোচনার সমাপ্তি ঘটার কথা থাকলেও মিডিয়ায় আজও এ বিষয়ে সংশয়-বিতর্কে সরব রয়েছে। এমনকি তাঁর ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে কয়েক ধরনের গুজব পর্যন্ত তৈরী হয়েছে। আমরা এখানে মাইকেল জ্যাকসনের ভাই জারমেইন জ্যাকসন (মুহাম্মাদ আব্দুল কাদের)- যিনি ১৯৮৯ সালে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন- তার সাক্ষাৎকার তুলে ধরে বিষয়টি বিশ্লেষণের প্রয়াস পাব। তার পূর্বে যেটা বলতে হয় যে, এ বিতর্কের পিছনে বেশ অনেকগুলি ঘটনার উপস্থিতি বর্তমান যা অনেকটা ইঙ্গিত দেয় যে, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন নতুবা অচিরেই গ্রহণ করতেন। বাহরাইনের একটি বুলেটিনে যার বিবরণ পাওয়া যায় এভাবে- 'ইতিপূর্বে তিনি মুসলমান হয়েছেন বলে কয়েকবার গুজব উঠলেও ২১ নভেম্বর ২০০৮ বিশ্বমিডিয়ায় সর্বপ্রথম প্রকাশ পায় যে, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং নতুন নাম মিকাইল রেখেছেন। এমনকি আল-কায়েদা নেতা আইমান আল-জাওয়াহেরী পর্যন্ত তাঁকে উষ্ণ শুভেচ্ছা জানান। ১৯৮৯ সালে একটি প্রেস কনফারেন্সে মাইকেলের একটি মন্তব্য বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল যেখানে তিনি বলছিলেন, 'আমি ইসলামকে আমার ভাইয়ের মধ্যে দেখেছি। আমি ইসলাম সম্পর্কে বই-পত্রও পড়েছি এবং কোন একদিন ইসলামের এই প্রশান্তি, স্থিরতার মাঝে নিজের অনুভূতিতে একান্তভাবে পেতে ইচ্ছা করি।' পরবর্তীকালে মাইকেলের জীবনে অনেক ঝড়ঝাপ্টা নেমে আসে। নানা মিথ্যা অভিযোগে তাকে জর্জরিত করা হয়। শিশুর উপর পাশবিক নির্যাতন চালানোর মত হীন অপবাদ একাধিকবার আরোপ করে মিডিয়ায় তাঁর নামে দুর্নাম রটানো হয়। ছোট্ট শিশুর মত চঞ্চলপ্রাণ মাইকেল এতসব চাপ সহ্য করার মত লোক ছিলেন না। ফলে তিনি সঙ্গীত জগৎ থেকে অনেকটা পিছিয়ে এসে সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে আত্মনিয়োগ করেন। সঙ্গীত থেকে আয়কৃত বিপুল সম্পদ এ পথে ব্যয় করতে থাকেন। এসময় কয়েক বছর তিনি ইংল্যান্ডে অবস্থান করেন এবং তাঁর দীর্ঘদিনের বন্ধু ক্যাট স্টিভেন্সের (ইউসুফ ইসলাম) সাহচর্যে কিছুদিন সময় কাটান। দক্ষিণ আফ্রিকার আরেক প্রখ্যাত মুসলিম সঙ্গীতশিল্পী জাইন ভিখার সাথেও এ সময় তার বন্ধুত্ব হয়, যিনি Give Thanks to Allah শিরোনামে একটি গান রচনা করেন। জাইন ভিখা চেয়েছিলেন মাইকেল নিজের কণ্ঠে এই গানটি গাইবেন। কিন্তু সে সময় হয়ে উঠেনি। গানটির ভাষা ছিল এরূপ-

Give thanks to Allah/ For the moon and stars
Prays in All day full/ What is end what is was.
Take hold of your Eman/ Oh You who belive.
Please give thanks to Allah/ Allah Ghafurun Allah
Rahimun/Allah yuhibbul-Muhsineen.

وهو على كل شئ قدير/ هو رازقنا / هو خالقنا

He is the Creator / He is the Sustenancer
And he is the one/ who has power over all.
Give Thanks to Allah/ For the moon and stars
Prays in All day full/ What is end what is was.
Don't given to Shaitan/ Oh you belive Please
Give Thanks to Allah/Allah Ghafurun/ Allah
Rahimun/ Allah yuhibbul-Muhsineen.

وهو على كل شئ قدير/ هو رازقنا / هو خالقنا

He is the Creator / He is the Sustenancer /
And he is the One, who has/ Power Over All.

পুনরায় আমেরিকায় ফিরে যাওয়ার পর আদালতে মাইকেলের বিরুদ্ধে কথিত শিশু নির্যাতনের অভিযোগে বিচারকার্য শুরু হয়। ফলে তার বন্ধু বাহরাইনের বাদশাহর পুত্র শেখ আব্দুল্লাহ বিন হামাদ আল-খলীফা-এর আমন্ত্রণে তিনি বাহরাইনে চলে আসেন। সেখানে তিনি প্রায় তিন বছর অবস্থান করেন এবং ইসলাম সম্পর্কে আরো পড়াশোনা করেন। এমনকি ছালাতের নিয়ম-কানুন ও পবিত্র কুরআন পাঠ পর্যন্ত শিক্ষা করেন বলে জানা যায়। অতঃপর ২১ নভেম্বর'০৮ লস এঞ্জেলসে এক বন্ধুর বাসায় অনাড়ম্বরভাবে ইসলাম গ্রহণ করেন। গত বছর মার্চ মাসে জীবনের শেষ প্রেস কনফারেন্সে যখন তিনি পুনরায় সঙ্গীত জগতে প্রত্যাবর্তনের ঘোষণা দেন তখন তিনি বলেন, 'এটাই হবে আমার জীবনের সর্বশেষ কনসার্ট। আসছে জুলাইয়ে সবার সাথে দেখা

হবে'...। তাঁর পরিকল্পনা ছিল এই কনসার্ট থেকে ঘোষণা করবেন যে, তিনি সঙ্গীতজগত থেকে স্থায়ীভাবে বিদায় গ্রহণ করছেন। আর সম্ভবত এটাই তাঁর অভিপ্রায় ছিল যে, এখানেই তিনি তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করবেন। কেননা তিনি রিহার্সেলের সময় জাইন ভিখার উপরোক্ত গানটিও গেয়েছিলেন যা তাঁর অসম্পূর্ণ স্টুডিও রেকর্ডে পাওয়া গেছে। ২৫ জুন রাতে কাজ শেষ হওয়ার পর তার প্রডাকশন ম্যানেজারের সাথে কোলাকুলি করার সময় তিনি বলেন, 'দুই মাসের রিহার্সেলের পর আমি এখন কনসার্টের জন্য পুরো প্রস্তুত। শুভরাত্রি। কাল তোমাদের সাথে আবার দেখা হবে।' অতঃপর কিছুক্ষণবাদে রাত ১২-টার দিকে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এর ঘণ্টাখানিক পরে হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া হলে রাত ২.২৬ মিনিটে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়। হাসপাতাল থেকে বলা হয় ঘুমের ঔষধের মাত্রা বেশী হওয়ার কারণে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তিনি মারা গেছেন। কিন্তু তাঁর পরিবার সেটা মেনে নেয়নি। তাঁর মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান নিয়েও চলে দীর্ঘ নাটকীয়তা। তাঁর পরিবার ও ভক্তদের পক্ষ থেকে দাবী করা হয় যে, এ মৃত্যুর পিছনে কোন মহলের অশুভ হাত রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক গুঞ্জন চাউর হয়। ফলে তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ হওয়ার পূর্বেই তাঁর মৃত্যুর এক সপ্তাহ পর সিএনএনের সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা জনগণকে শান্ত করার জন্য বলতে বাধ্য হন, 'তাঁর মৃত্যুতে কোন ষড়যন্ত্রের সংযোগ নেই।' একজন প্রেসিডেন্টের এই আগ বাড়ানো মন্তব্য তখন অনেকের কাছেই সন্দেহজনক ঠেকেছিল। যাইহোক রহস্যে ভরপুর এ সঙ্গীতজ্ঞের জীবিতাবস্থার মত মৃত্যু এমনকি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াও ছিল রহস্যাবৃত। বলা হচ্ছে, সে অনুষ্ঠানে যে কফিনটি আনা হয় তা ছিল স্রেফ 'শো'। তাতে কোন মৃতদেহ ছিল না। মূলত তাঁর দাফন সম্পন্ন হয়েছিল দিনকয়েক পূর্বেই। আর যেহেতু তা ইসলামী কায়দায় ছিল এজন্য সিআইএ-এর নির্দেশে অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে তাঁর বসতস্থল নেভারল্যান্ডে কবর দেওয়া হয়। মোটকথা বাহরাইনের উক্ত বুলেটিনে দীর্ঘ আলোচনায় এটাই প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে যে, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন বলেই তাঁর উপর সরকারী মহল থেকে নানা নির্যাতন নেমে আসে এবং শেষ পর্যন্ত তাদের ষড়যন্ত্রেই তাঁকে অকাল মৃত্যুবরণ করতে হয়।'

মাইকেল জ্যাকসনকে নিয়ে এসব বিতর্কের হয়ত কোনদিনই অবসান হবে না। কেননা কার্যকারণ বিবেচনায় অনেক কিছুই মেলানো সম্ভব হয় না বলে এসব বিষয় সাধারণত চিরদিনই অমীমাংসিত রয়ে যায়।

আমরা এখানে তাঁর ভাই জারমেইন জ্যাকসন যিনি মাইকেলের ৩য় ভাই এবং জ্যাকসন ফাইভ ব্যান্ডের সদস্য ছিলেন (১৯৮৯ সালে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন) তার ইসলাম গ্রহণের প্রেক্ষিতে গৃহীত একটি সাক্ষাৎকার এবং অতি সম্প্রতি বিবিসিতে প্রচারিত আরেকটি সাক্ষাৎকার তুলে ধরে এ বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করব।

আল-মাজাল্লাহ (আরবী), লন্ডন কর্তৃক গৃহীত সাক্ষাৎকার :

প্রশ্ন : *সর্বপ্রথম কখন ও কিভাবে আপনি ইসলামের সংস্পর্শে আসেন?*

জাঃ জ্যা : এটা ছিল ১৯৮৯ সালের কথা যখন আমি আমার বোনের সাথে মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছিলাম। এসময় বাহরাইনে অবস্থানকালে আমরা উষ্ণ অভ্যর্থনা পাই। আমরা সেখানকার শিশুদের সাথে কৌতুকচ্ছলে কথা বলছিলাম। তারাও সরল-সহজভাবে প্রশ্ন করছিল। তারা জিজ্ঞেস করে বসল আমার ধর্ম সম্পর্কে। আমি বললাম, আমি একজন খৃষ্টান। আমি পাল্টা জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের ধর্ম কি? তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমস্বরে বলল, ইসলাম। তাদের এ উদ্দীপক উত্তর আমার হৃদয় কন্দরে যেন ধাক্কা দিল। অতঃপর তারা আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলতে লাগল। যাতে তাদের বয়সের তুলনায় অধিকতর পরিপক্কতার ছাপ রাখছিল। তাদের স্বরগ্রাম স্পষ্ট করে দিচ্ছিল যে, ইসলাম ধর্ম নিয়ে তারা কত গর্বিত। এটাই ছিল ইসলামের দিকে আমার প্রথম পদক্ষেপ।

এই ছোট্ট শিশুদের সাথে আমার সামান্য বাক্যালাপ আমাকে মুসলিম পণ্ডিতদের সাথে ইসলামের ব্যাপারে আলোচনার দুয়ার খুলে দিল। চিন্তাজগতে যেন এক অপার্থিব ঢেউ উথাল-পাথাল করতে লাগল। নিজেকে প্রশান্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম যে কিছুই ঘটেনি। কিন্তু তবুও ব্যাপারটা আমি গোপন করতে পারছিলাম না যে, অন্তর থেকে ইসলামকে গ্রহণ করে ফেলেছি। প্রথমে ব্যাপারটা আমি প্রকাশ করে ফেললাম আমাদের পারিবারিক বন্ধু কুরবান আলীর কাছে। এই কুরবান আলীই আমাকে সঊদী আরবের রাজধানী রিয়াদে নিয়ে এলেন। তখনও পর্যন্ত ইসলাম সম্পর্কে আমি বেশী কিছু জানতাম না। তারপর আমি এক সঊদী পরিবারের সাথে ওমরা পালনের জন্য মক্কায় গেলাম। এখানেই আমি জনসম্মুখে প্রথম আত্মপ্রকাশ করলাম যে, আমি এখন থেকে একজন মুসলিম।

প্রশ্ন : *ইসলাম গ্রহণের পর আপনার প্রাথমিক অনুভূতি কি ছিল?*

জাঃ জ্যা : ইসলাম গ্রহণের পর আমার অনুভূতি ছিল এমন যেন আমি পুনর্জন্ম লাভ করেছি। ইসলামের মাঝে আমি খুঁজে পেয়েছি এমন সব প্রশ্নের উত্তর যা আমি খৃষ্টধর্মে পাইনি। বিশেষত যিশুর জন্ম সংক্রান্ত প্রশ্নে। এই প্রথমবারের মত ধর্মকেই আমি বুঝতে শিখলাম। আমি প্রার্থনা করেছিলাম যে, আমার পরিবার যেন বিষয়গুলিকে স্বীকৃতি দেন। আমার পরিবার খৃষ্টান ধর্মের একটি শাখার (জেহোভার সাক্ষ্য) অনুসারী ছিল। সঊদীতে অবস্থানকালে আমি প্রাক্তন বৃটিশ পপ-সিঙ্গার ক্যাট স্টিভেন্সের (ইউসুফ ইসলাম) একটি ক্যাসেট সংগ্রহ করি যেখান থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি।

প্রশ্ন : *ইসলাম গ্রহণের পর আপনি আমেরিকায় ফিরলে কি ঘটেছিল?*

জাঃ জ্যা : যখন আমি আমেরিকায় ফিরলাম তখন মিডিয়াতে ইসলাম ও মুসলমানদের ব্যাপারে ব্যাপকভাবে অপপ্রচারণা চালানো হচ্ছিল। আমার ব্যাপারেও অনেক গল্প-গুজব ছড়ানো হল যা আমাকে মানসিক অশান্তিতে নিক্ষেপ করেছিল। আর হলিউড তো ছিল ইসলামের দুর্নাম করতে সিদ্ধহস্ত। অথচ খৃষ্টধর্ম ও ইসলামের মাঝে সামঞ্জস্যপূর্ণ অনেক

স্থান রয়েছে। যেমন কুরআনে যিশুকে একজন মহান নবী হিসাবে দেখানো হয়েছে। সেজন্য আমি আশ্চর্য হয়েছিলাম যে, আমেরিকান খৃষ্টানরা ইসলামের বিরুদ্ধে এত সব অপবাদ কেন ছড়ায়?

ইসলাম আমাকে অনেক জটিলতা থেকে উদ্ধার করেছে। এর ফলে আমি নিজেকে আক্ষরিক অর্থে একজন পূর্ণ মানুষ হিসাবে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছি। নিজের মধ্যে এক বিরাট পরিবর্তনের ছোঁয়ায় আমি অভিভূত। ইসলামের নিষিদ্ধ যাবতীয় বিষয় আমি পরিত্যাগ করেছি। এসব কারণে আমার পারিবারিক জীবনে কিছুটা সমস্যারও শিকার হয়েছি। এককথায় পুরো জ্যাকসন পরিবার অকস্মাৎ এক ধাক্কার শিকার হয়েছে। এমনকি হুমকিমূলক চিঠি-পত্রও আমাদের নিকট পাঠানো হয়েছে, যা আমার পরিবারকে বেশ বিড়ম্বনায় ফেলেছিল।

প্রশ্ন : *আপনার ভাই মাইকেল জ্যাকসনের প্রতিক্রিয়া কি ছিল?*

জাঃ জ্যা : আমেরিকায় ফেরার পথে সঊদী থেকে আমি বেশ কিছু বই নিয়ে এসেছিলাম। মাইকেল সেসব বই থেকে কয়েকটি পড়ার জন্য নিয়েছিল। ইতিপূর্বে ইসলাম সম্পর্কে তার মন্তব্য ছিল পশ্চিমা মিডিয়ার প্রপাগাণ্ডা প্রভাবিত। যদিও সে মুসলমানদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করত না, তবে তাদের প্রতি সমর্থনসূচক কিছুও বলত না। কিন্তু এই বইগুলো পড়ার পর থেকে সে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কিছু বলা থেকে একেবারে নিশ্চুপ হয়ে গেল। আমার ধারণা ইসলাম সম্পর্কে পড়াশোনা করার ফলেই সে তার ব্যবসায়িক পার্টনার হিসাবে মুসলিমদের প্রতি আগ্রহ বোধ করে। আর এখন তো সঊদী ধনকুবের প্রিন্স ওয়ালিদ বিন তালালের সাথে তার ব্যবসায়িক পার্টনারশীপ হয়েছে।

প্রশ্ন : *ইতিপূর্বে বলা হয়েছিল যে, মাইকেল জ্যাকসন মুসলমানদের বিরুদ্ধে। অতঃপর আবার গুজব উঠেছিল যে, তিনি মুসলমান হয়েছেন। ব্যাপারটা আসলে কি?*

জাঃ জ্যা : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি অন্তত আমার যতদূর জানা রয়েছে মাইকেল কখনো ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে অশ্রদ্ধাপূর্ণ বা নিন্দাসূচক কথা বলেনি। তার গানগুলোও মানুষের প্রতি ভালবাসারই বার্তা পাঠায়। পিতা-মাতাদের কাছ থেকেও আমরা অন্যকে ভালবাসার দীক্ষাই পেয়েছি। কেবলমাত্র হঠকারী লোকই তার উপর এই অপবাদ চাপাতে পারে যে, সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে। যদি মুসলমান হওয়ার কারণে আমার উপর পর্যন্ত বাজে অপবাদ চাপানো হয়ে থাকে তবে কেন একই ঘটনা মাইকেলের উপর ঘটতে পারে না? তবে যতদূর দেখেছি ধর্মের বিরুদ্ধে সমালোচনার কারণে মিডিয়ায় তাকে কোনদিন শিরোনাম হতে হয়নি। যদিও ইসলামের প্রতি আগ্রহী হওয়ার কারণে তাকে হুমকির সম্মুখীন হতে হয়েছে। আর কেইবা জানে এটা কেমন দেখাবে যখন এমন হবে যে মাইকেল ইসলাম গ্রহণ করেছে!

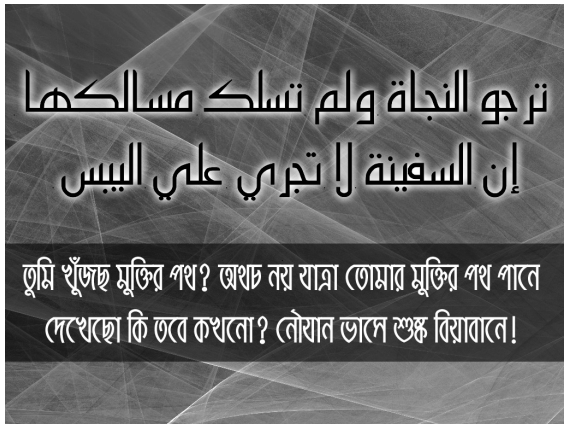

প্রশ্ন : *আপনার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে আপনার পরিবারের অন্যদের প্রতিক্রিয়া কি?*

জাঃ জ্যা : আমি যখন আমেরিকায় ফিরলাম তার পূর্বেই আমার মা আমার ইসলাম গ্রহণের খবর পেয়ে গেছেন। আমার মা একজন ধার্মিক ও সুশীল মহিলা ছিলেন। যখন আমি বাড়ি পৌঁছলাম তিনি কেবল একটি প্রশ্নই করলেন, তুমি কি হঠাৎ করেই এমন একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছ, না এটা তোমার দীর্ঘদিন যাবৎ গভীর চিন্তা-ভাবনার ফসল? জবাবে বললাম, বহু চিন্তা-ভাবনা করেই আমি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। বলা বাহুল্য, পূর্ব থেকেই আমরা ধার্মিক পরিবার ছিলাম। এজন্য আমরা বিভিন্ন দাতব্য সংস্থায় সক্রিয় ছিলাম। আমরা আফ্রিকায় ত্রাণবাহী বিমান পাঠিয়েছিলাম। বসনিয়ান যুদ্ধের সময় যুদ্ধাহতদের জন্য ত্রাণ পাঠিয়েছিলাম। এসব বিষয়ে সবসময়ই আমরা খুব সংবেদনশীল। কেননা আমাদেরকেও একসময় দারিদ্র্যের ভয়াবহ রূপ দেখতে হয়েছে। সে সময় আমরা বড়জোর মাত্র কয়েক বর্গমিটার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট একটি বাড়িতে থাকতাম।

প্রশ্ন : *আপনি কি ইসলামের ব্যাপারে আপনার বোন জ্যানেট জ্যাকসনের সাথে কখনো কথা বলেছেন?*

জাঃ জ্যা : আমার হঠাৎ ইসলাম গ্রহণে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মত সেও খুব অবাক হয়েছিল। প্রথমে সে খুব চিন্তিতও ছিল। তার মাথায় একটা বিষয়ই ঘুরপাক খাচ্ছিল যে, মুসলমানরা পলিগেমাস (একসাথে একাধিক বিবাহের সমর্থক)। তারা একসাথে চারটি বিবাহ করে। যখন আমি আমেরিকার বর্তমান অবস্থা উল্লেখ করে বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বললাম, তখন সে সন্তুষ্ট হল। ব্যাপারটি এই যে, পশ্চিমা সমাজে 'ফ্রি সেক্স' অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। ফলে যদিও তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তবুও বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক স্থাপনে কোন বাধা নেই। ফলে সমাজে চরম নৈতিক অবক্ষয় দেখা দেয়। ইসলাম সমাজকে এই ধ্বংসাত্মক পরিণতি থেকে রক্ষা করেছে।

প্রশ্ন : *মুসলিম সমাজের দিকে যখন তাকান তখন আপনার স্বতঃস্ফূর্ত কী অনুভূতি হয়?*

জাঃ জ্যা : মানবতার সর্বোচ্চ স্বার্থের দিকে তাকালে ইসলামী সমাজ এই পৃথিবীর সবচেয়ে নিরাপদ একটি স্থান। উদাহরণত নারীদের কথাই ধরুন। আমেরিকান নারীদের পোশাক-পরিচ্ছদ এমনই যা পুরুষকে অন্যায়ে প্রলুব্ধ করে। অথচ ইসলামী সমাজে এটা অচিন্তনীয়। তাছাড়া সর্বব্যাপী পাপ, অশালীন আচরণ পশ্চিমা সমাজের নৈতিক দিকটা ফোকলা করে ফেলেছে। তাই আমি সততই বিশ্বাস করি, যদি এমন কোন স্থান থেকে থাকে যেখানে মানবতার অবস্থান আজ সমুন্নত রয়েছে, তবে সেটা ইসলামী সমাজ ছাড়া আর কোথাও নয়। একটা সময় দ্রুতই আসবে যখন বিশ্ব এই বাস্তবতা স্বীকার করতে বাধ্য হবে।

প্রশ্ন : *আমেরিকান মিডিয়া সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কী?*

জাঃ জ্যা : আমেরিকান মিডিয়া স্ববিরোধিতায় ভুগছে। হলিউডের উদাহরণ দেখুন একজন শিল্পীর স্ট্যাটাস সেখানে বিবেচনা করা হয় তার কারের মডেল অথবা কোন মাপের রেস্টুরেন্টে সে যায় ইত্যাদি দেখে। একবার তাকান সিএনএন-এর দিকে। তারা এমন অতিরঞ্জিত

রিপোর্ট করে যেন মনে হয় তাদের রিপোর্টকৃত ঘটনাটি ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছু ঘটেনি। ফ্লোরিডার বনাঞ্চলে আগুন লাগার খবরকে এতটাই কভারেজ দেয়া হয় যে, মনে হয় যেন সারাবিশ্বেই আগুন ধরে গেছে। অথচ ছোট্ট একটি এলাকায় সেটি ঘটেছিল।

আমি তখন আফ্রিকায় ছিলাম। ওকলাহোমায় একটি নাশকতামূলক বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছিল। মিডিয়ায় কোন প্রমাণ ছাড়াই মুসলমানদের জড়িয়ে খবর আসতে শুরু করল। পরে দেখা গেল বিস্ফোরণকারী একজন খৃষ্টান। আমেরিকান মিডিয়ার এরূপ আচরণকে আমরা অভিহিত করতে পারি 'ইচ্ছাকৃত অজ্ঞতা' হিসাবে।

প্রশ্ন : *আপনার স্ত্রী ও সন্তানরাও কি মুসলমান হয়েছেন?*

জাঃ জ্যা : আমার ছয়টি ছেলে এবং একটি মেয়ে রয়েছে। যারা আমার মতই মুসলমান। তবে আমার স্ত্রী এখনো ইসলাম সম্পর্কে পড়াশোনা করছে। সে সঊদী আরব যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করছে। আমার বিশ্বাস খুব শিগগিরই সে ইসলাম গ্রহণ করতে যাচ্ছে। আল্লাহ আমাদেরকে এই সত্য দ্বীনের উপর টিকে থাকার জন্য সাহস ও ধৈর্য দান করুন। আমীন!

এই সাক্ষাৎকারটি মাইকেলের মৃত্যুর বেশ আগে প্রকাশিত হয়েছিল। এ বছর ২৫ জুন অর্থাৎ মাইকেলের মৃত্যুর ঠিক এক বছর পর বিবিসিতে প্রচারিত সাক্ষাৎকারে জারমেইন জ্যাকসন বলেন, 'আমি অনুভব করি যে যদি মাইকেল ইসলাম গ্রহণ করত, তবে আজ সে আমাদের মাঝেই থাকত। কেননা যখন আপনি অন্তর থেকে একশ ভাগ নিশ্চিত থাকবেন যে, আপনি এবং আপনার পার্শ্বের লোকেরা কে এবং কীভাবে ও কেন তাদের এই জীবন, তখন আপনার সবকিছুই পরিবর্তিত হয়ে যাবে এমনভাবে যা আপনার জন্য কল্যাণকর হবে। এটা কেবল এক শক্তির আঁধার। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশক্তিমান। মাইকেল ইসলাম সম্পর্কে অনেক পড়াশোনা করেছিল। আমি তাকে সঊদী ও বাহরাইন থেকে বই-পত্র এনে দিয়েছিলাম। আর আমিই মূলত তাকে বাহরাইনে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। কেননা আমি চাচ্ছিলাম তাকে আমেরিকার বাইরে রাখতে, যাতে আমার ভাই একটু নিশ্চিন্ত পরিবেশে বসবাসের সুযোগ পায়।'

বিবিসি জিজ্ঞাসা করে যে, 'তিনি তো ইসলাম গ্রহণে ইচ্ছুক ছিলেন না তাই না?' জবাবে তিনি বলেন, 'না, মাইকেল ইসলাম গ্রহণ করতে চাইছিল না- তা নয়। বরং তার সকল সিকিউরিটি স্টাফ ছিল মুসলমান। কেননা ইসলামের প্রতি তার আস্থা ছিল। কারণ এরা হল এমন ব্যক্তি যারা প্রয়োজনে নিজের জীবন বিলিয়ে দিতে পারে এবং সর্বোত্তম মানুষ হওয়ার চেষ্টায় নিরত থাকে, সেটা মাইকেলের জন্য নয় বরং আল্লাহ্‌র জন্য। সুতরাং এমন ব্যক্তিদের পাশে পাওয়ার অর্থ যে আপনি নিরাপদ, কেননা এটা যেন আল্লাহ্‌রই নিরাপত্তা'।

জারমেইন জ্যাকসনের এই সাক্ষাৎকারদ্বয় থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মাইকেল জ্যাকসন ইসলাম সম্পর্কে পড়াশোনা অর্থাৎ ইসলামের সাথে তার যথেষ্ট সংযোগ ঘটলেও চূড়ান্ত পর্যায়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি কিংবা ইচ্ছা থাকলেও সুযোগ পাননি। তৎপূর্বেই তার মৃত্যু ঘটে যায়। সুতরাং এ নিয়ে অহেতুক বিতর্কের অবকাশ নেই এবং তার প্রয়োজনও নেই।

পরিশেষে বলব, ইসলাম মানবতার জন্য রহমত স্বরূপ। সেটি যে কতবড় রহমত তা একজন জন্মসূত্রের মুসলমানের চেয়ে একজন নতুন মুসলমানের নিকট অধিকতর উপলব্ধিযোগ্য। আমেরিকা, ইউরোপে সভ্যতার নামে মানবতার মৌলিক বৈশিষ্ট্য হরণের যে নির্মম অনুশীলন চলছে, তা থেকে মুক্তির আশায় সেখানকার হাজারো মানুষ আজ ইসলামের প্রাকৃতিক আবেদনের কাছে প্রশান্তির আশ্রয় গ্রহণ করছে। বিশ্বের প্রতিটি স্থানেই ইসলাম গ্রহণের হার পূর্বের তুলনায় অধিকমাত্রায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। এভাবেই ক্বিয়ামতের পূর্বে পৃথিবীতে এমন একটি সময় চলে আসবে যখন পৃথিবীর সর্বপ্রান্তে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে যাবে। মানুষ ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় ইসলাম গ্রহণে বাধ্য হবে। *(আহমাদ; মিশকাত হা/৪২ 'ঈমান' অধ্যায়)* । কল্যাণ ও ন্যায়ের সুশাসনে পৃথিবী হয়ে উঠবে ভরপুর *(আবূ দাঊদ; মিশকাত হা/৫৪৫৪, সনদ হাসান)*। অত:পর মহাপ্রলয় তথা ক্বিয়ামতের মাধ্যমে ভবজগতের লীলাখেলা সাঙ্গ হবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে ঈমানের উপর অটল রেখে ইহজীবনে কল্যাণ অর্জন ও পারলৌকিক জীবনে মুক্তি লাভ করে জান্নাতুল ফেরদাউস হাছিলের তাওফীক্ব দান করুন। আমীন!!

ইবনুল কাইয়িম বলেন, ক্রোধ হল হিংস্র পশুর মত, যখন মানুষ ক্রোধের অবস্থা থেকে বিরতি নেয় তখন ক্রোধ তাকেই ভক্ষণ করতে শুরু করে। আর কুপ্রবৃত্তি হল আগুনের মত, যখন কেউ তা প্রজ্জ্বলিত করে তখন সে তাকেই পুড়ানো শুরু করে। অহংকার হল রাজার কাছে তার রাজত্ব নিয়ে বচসায় লিপ্ত হওয়ার মত, যদি রাজা তোমাকে ধ্বংস নাও করে তবে নিশ্চিতভাবে বিতাড়িত করবে। আর হিংসা হল নিজের চাইতে শক্তিশালী কারো সাথে মুকাবিলা করার মত। যে ব্যক্তি তার প্রবৃত্তি ও ক্রোধের উপর বিজয়ী থাকে, শয়তান তার ছায়াও মাড়ায় না। আর যে ব্যক্তির উপর প্রবৃত্তি ও ক্রোধ বিজয়ী হয়েছে শয়তান তার থেকে দূরে সরে যায় (অর্থাৎ এই ভয়ে যে কখন তার উপর গজব নাযিল হয়)' *(আল-ফাওয়ায়েদ, পৃঃ ১/১৭২)*।

আমরা চাই এমন একটি ইসলামী সমাজ, যেখানে থাকবে না প্রগতির নামে কোন বিজাতীয় মতবাদ; থাকবে না ইসলামের নামে কোনরূপ মাযহাবী সংকীর্ণতাবাদ।

বিজ্ঞানময় আল-কুরআন : কতিপয় দিক

-আ.স.ম. ওয়ালীউল্লাহ

কুরআন মাজীদের অপর নাম 'The complete code of life'. এর মধ্যে সবকিছুই বিদ্যমান। তার মধ্যে কতগুলো আমরা বুঝতে পারি আর কতগুলো বুঝতে পারিনা। এই কুরআন মাজীদে অনেক কিছুই বিশদ ব্যাখ্যা না করে শুধুমাত্র ইশারা দেয়া হয়েছে। যা মানুষের নিত্য-নতুন আবিষ্কার ও গবেষণার পথ খুলে দেয়। তাই কুরআন শুধু তেলাওয়াতের জন্য নয়, এটি গবেষণার জন্যও একটি উত্তম নির্দেশক। ফ্রান্সের বিখ্যাত সার্জন, বৈজ্ঞানিক ও গবেষক ডা. মরিস বুকাইলী কুরআন নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। তিনি কুরআনের অনেক বৈজ্ঞানিক দিক বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন। এরপর তিনি ১৯৭৬ সালে 'বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান' নামে একখানা সাড়াজাগানো গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানের সাথে বর্তমান বাইবেলের অসঙ্গতি ও কুরআনের সঙ্গতি তুলে ধরেন। সর্বকালের সেরা পদার্থ বিজ্ঞানী ও নোবেল বিজয়ী আলবার্ট আইনস্টাইনের মতে, 'ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান পঙ্গু, বিজ্ঞান ছাড়া ধর্ম অন্ধ'। সুতরাং আমাদেরকে কুরআন অধ্যয়ন করতে হবে ও বুঝতে হবে।

চোখের ড্রপ

সূরা ইউসুফ এর ৮৪ এবং ৯৩-৯৬ আয়াতগুলি গবেষণা করে মিশরের সরকারী 'National centre of researches in Egypt' এর মুসলিম বিজ্ঞানী ডা. আব্দুল বাসিত মুহাম্মাদ মানুষের দেহের ঘাম পরিশোধন করে একটি 'আইড্রপ' আবিষ্কার করেন, যা দিয়ে ২৫০ জন রোগীর উপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে, কোনরূপ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই ৯০% এর বেশী চোখের ছানি রোগ সেরে যায় ও তারা দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়। ইতিমধ্যে এই ঔষধটি 'ইউরোপিয়ান ইন্টারন্যাশনাল প্যাটেন্ট ১৯৯১ এবং 'আমেরিকান প্যাটেন্ট ১৯৯৩' লাভ করেছে। এছাড়া একটি সুইস ঔষধ কোম্পানীর সাথে তাঁর চুক্তি হয়েছে এই মর্মে যে, তারা তাদের ঔষধের প্যাকেটের উপর 'Medicine of Quran' লিখে তা বাজারে ছাড়বে। -সূত্র : ইন্টারনেট।

উক্ত গবেষণার মূল সূত্র ছিল ইউসুফ (আঃ)-এর ব্যবহৃত জামা মুখের উপরে রাখার মাধ্যমে তাঁর পিতা ইয়াকুব (আঃ)-এর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়ার কুরআনী ঘটনা। এটি কুরআনের বিজ্ঞানময়তা প্রমাণ করে।

সূরা বাক্বারার ১৭৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে 'তিনি তোমাদের উপর হারাম করেছেন মৃত জীব, রক্ত, শূকরের মাংস এবং সেসব জীব-জন্তু যা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে উৎসর্গ করা হয়। অবশ্য যে লোক নিরূপায় হয়ে পড়ে এবং নাফরমানী ও সীমালঙ্ঘনকারী না হয়, তার জন্য কোন পাপ নেই। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহান ক্ষমাশীল ও অত্যন্ত দয়ালু'। নিম্নে উক্ত আয়াতের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণগুলো তুলে ধরা হলো।

শূকরের মাংস

শূকরের গোশত ভক্ষণ সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, 'Trichiniasis' নামক জীবাণুর সংক্রমণ শূকরের মাংসের সাহায্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং 'Trichinela spiralis' নামক গোলকৃমির মাধ্যমে মানুষ আক্রান্ত হয়। যার ফলে সোয়াইন ফ্লুর (H_1 N_1) মত মহামারী দেখা দিতে পারে ও মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হতে পারে। কাঁচা কিংবা ভালোভাবে সিদ্ধ না হওয়া শূকরের মাংস খেলে মানুষের দেহ 'Encysted' জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ জীবাণু হৃদপেশী আক্রমণ করে ও সেখানে 'Myocarditis' রোগ সৃষ্টি করে। যার ফলে হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া হঠাৎ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এছাড়া শূকরের মাংসে 'Taenia Solium' বা ফিতাকৃমির জীবাণু থাকে। এর প্রভাবে মাংসপেশী, মস্তিষ্ক, চোখ, স্নায়ু ইত্যাদি আক্রান্ত হয়। বর্তমান বিশ্বে ফিতাকৃমি আক্রান্তের সংখ্যা ৬০ মিলিয়নেরও বেশী, যাদের অধিকাংশই শূকরের মাংস ভক্ষণকারী।

সম্প্রতি 'সাটক্সিন' নামক এক প্রকার প্রোটিন শূকরের মাংস থেকে সনাক্ত হয়েছে। যা বিভিন্ন প্রকার এলার্জি, এ্যাকজিমা ও হাঁপানীর জন্য দায়ী। কৃত্রিমভাবে সামান্য পরিমাণেও 'সাটক্সিন' গ্রহণ করলে দৈহিক অসারতা ও বিভিন্ন গ্রন্থিতে ব্যথার সৃষ্টি করে। এছাড়াও শূকরের গোশত উচ্চমাত্রায় চর্বি থাকে, যা নিয়মিত খেলে শরীরে Vitamin-E এর অভাব দেখা দেয়। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, শূকরের মাংস ভক্ষণ সম্পর্কিত আল্লাহ্‌র বিধান সত্যই তাৎপর্যপূর্ণ ও বিজ্ঞানময়।

মৃত প্রাণী

আল্লাহ তা'আলা মৃত প্রাণীর গোশত খাওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। এই বিধানটিও সম্পূর্ণ বিজ্ঞান সম্মত। যা নিম্নের তথ্যগুলো দ্বারা প্রমাণিত হবে। চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বলছেন, মৃত প্রাণী সাধারণ বিষপানে কিংবা ভাইরাস বা এ্যানথ্রাস 'Anthrax' এর প্রভাবে মারা যেতে পারে। প্রাণীর 'Anthrax' একটি মারাত্মক ছোঁয়াচে জীবাণু। এটি এতই সংক্রামক যে, এ রোগে মৃত প্রাণীর মাংস হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করাও বিপদজনক।

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা মনে করে জীব হত্যা মহাপাপ। পশু-পাখি আপনা থেকে মারা গেলেই কেবল তাদের মাংস ভক্ষণ করে। যা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ও ঝুকিপূর্ণ পদ্ধতি।

রক্ত

প্রাণী জবাই করার পর যে রক্ত বের হয়ে আসে তাতে থাকে বিষাক্ত রাসায়নিক উপাদান, জমাট বাধার উপাদান (Heparin), Toxin ও বিভিন্ন 'Pathogenic micro-organism' রক্তের এসব পদার্থ খুবই ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত। অবশ্য এগুলো প্রাণীদেহের ভিতরে থাকা অবস্থায় প্রাণীদেহের কোন ক্ষতি করেনা। এ কারণেই আল্লাহ পাক রক্ত খাওয়া নিষিদ্ধ করেছেন। আল্লাহ পশু-পাখি তাঁর নামে জবাই করে রক্ত বের করে দেয়ার আদেশ দিয়েছেন। মূলত ওইসব বিষাক্ত পদার্থ বের করে দেয়ার জন্যই। এজন্য জবাই হচ্ছে সর্বোত্তম বৈজ্ঞানিক পন্থা, যা ইসলামী নিয়মে করা হয়ে থাকে।

এ সম্পর্কে Dr. Lord Horder বলেছেন, 'আমি জবাই পদ্ধতি ভালোভাবে লক্ষ্য করে দেখেছি। এ পদ্ধতিতে প্রাণীর ঘাড়ের সব রক্তনালী, শ্বাসনালী ও অন্ননালীসহ শিরদাঁড়ার হাড়ের আগ পর্যন্ত সকল নরম গঠন কেটে ফেলা হয়। এর ফলে প্রাণী সহজেই চেতনা হারায়। এ পদ্ধতির চেয়ে সহজ, ব্যথাহীন ও তাৎক্ষণিক কোন পদ্ধতি নেই। জবাইয়ের কয়েক মুহূর্ত পরে প্রাণী আর নড়াচড়া করতে পারেনা, কেবল শরীর দাপাদাপি করতে থাকে। শরীরের এ দাপাদাপি এক মিনিটের মধ্যে স্তিমিত হয়ে যায়।

উপরোক্ত কয়েকটি বিষয় থেকে প্রমাণিত হয় যে, কুরআনে বর্ণিত আদেশ-নিষেধ সমূহ যুক্তিসংগত ও বিজ্ঞানময়। বিজ্ঞানের এই আবিষ্কারগুলো সম্প্রতি হচ্ছে অথচ কুরআন এগুলোর সূত্র (Clue) ১৪০০ বছর আগেই ঘোষণা করেছে। এটা যে কোন মানব রচিত গ্রন্থ নয়, সরাসরি সৃষ্টিকর্তার বাণী তা এর দ্বারাই দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত হয়।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী দ্বীনের পথ বুঝা ও আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!!

ইংরেজী অভিধানের কথা

আব্দুল হাসিব

ইংরেজী ভাষায় সর্বপ্রথম 'ডিকশনারী' নামক যে লিখিত পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া যায় তা রচিত হয় ১২২৫ খৃষ্টাব্দে। সেটা ছিল কতিপয় ছাত্রের তৈরী ইংরেজী থেকে ল্যাটিন ভাষার কিছু শব্দসমষ্টি, যা শব্দক্রম অনুযায়ী সাজানো ছিল না। কেবল বিষয়ভিত্তিক কিছু শব্দের ব্যাখ্যাযুক্ত বিবরণ ছিল। ডিকশনারীতে নিয়মতান্ত্রিকভাবে ইংরেজী শব্দের উপস্থিতি শুরু হয় ১৫ শতকে। তবে তাও ছিল ল্যাটিন ভাষা বোঝার সুবিধার্থে। এ সময়ের প্রসিদ্ধ ডিকশনারীটির নাম ছিল (*Promptorium Parvulorum*) অর্থাৎ 'ছোটদের স্টোর হাউজ' যা ১৪৪০ সালে গালফ্রিডাস জিওফ্রে নামক এক ডোমিনিকান ব্যাকরণবিদ রচনা করেন। এই ডিকশনারীতে ১২,০০০ ইংরেজী শব্দ ও ল্যাটিন শব্দার্থ ছিল। ১৪৯৯ সালে এটি মুদ্রিত হয়। ১৫৫২ সালে ইংরেজী ভাষার প্রথম স্বার্থক ডিকশনারী (*Abecedarium Anglo-Latinum*) রচনা করেন রিচার্ড হিউলয়েট। তাঁর এই ইংরেজী টু ল্যাটিন ডিকশনারীটিতে শব্দসংখ্যা ছিল ২৬ হাজারের মত। পূর্বকালের এসকল ডিকশনারীতে যাবতীয় ইংরেজী বা ল্যাটিন শব্দ একত্রিত করার কোন প্রচেষ্টা ছিল না। সেখানে কেবল সেসব শব্দ অন্তর্ভুক্ত করা হত যেগুলো ছাত্রদের জন্য আয়ত্ব করা কঠিন ছিল। অতঃপর ১৬০৪ সালে রবার্ট কাউড্রে শব্দক্রম অনুযায়ী সাজিয়ে প্রথমবারের মত সার্বজনীন একটি ডিকশনারী রচনা করেন। তাঁর অনুসরণে ১৬২৩ সালে হেনরী কোকেরাম *The English Dictionarie* নামক আরেকটি ডিকশনারী রচনা করেন যা এই ইংরেজী শব্দকোষ শাস্ত্রের আধুনিকরূপ দানে বিশেষ ভূমিকা রাখে। ১৭০২ সালে জন কারসে ও জে. কে. ফিলোবিব্‌ল যৌথভাবে *New English Dictionary* নামক একটি দৈনন্দিন ব্যবহৃত ইংরেজী শব্দের ডিকশনারী রচনা করেন। ১৭২১ সালে নাথানিয়েল বেইলী নামক একজন স্কুল টিচার ইংরেজী শব্দতত্ত্ব বিশ্লেষণমূলক ডিকশনারী রচনা করেন। এতে পূর্ববর্তী আর সব ইংরেজী ডিকশনারীর তুলনায় অনেক বেশী শব্দ ছিল। তিনিই সর্বপ্রথম ডিকশনারীতে শব্দার্থের সাথে শব্দের উচ্চারণ অন্তর্ভুক্ত করেন। শব্দকোষ রচনায় অষ্টাদশ শতকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন আমেরিকার কানেকটিকাটের এক স্কুল শিক্ষক স্যামুয়েল জনসন। ১৭৫৫ সালে তিনি একক হাতে *A Dictionary of the English Language* নামক এই শব্দকোষটি রচনা করেন। তাঁর জীবনীকার জেমস বসওয়েল বলেন, 'পৃথিবীর এক বিস্ময় যে, এমন একটি বিরাটাকার কাজ কিভাবে একজন মানুষের পক্ষে সম্ভব হল, যখন অন্যান্য দেশসমূহ এ ধরনের কাজে হাত দিতে পুরো একটি একাডেমীর প্রয়োজন বোধ করত।' পূর্বতন শব্দকোষবিদগণ মূলত শব্দের ব্যবহার ও বানানের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। কিন্তু জনসন আধুনিকযুগের মত অধিক লক্ষ্য রেখেছেন শব্দের সমসাময়িক ব্যবহারের দিকে। শব্দের অর্থ বর্ণনার চেয়ে ব্যবহাররীতি দেখানোকেই তিনি বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'কোন জীবিত ভাষার ডিকশনারী পুরোপুরি যথার্থ হতে পারে না। কেননা যখন সেটি মুদ্রণের তাড়া আসে তখন কোন শব্দ হয় বাদ পড়ে যায় অথবা অন্তর্ভুক্ত হলেও তা হয়ত আর ব্যবহার হয় না'। জনসনই প্রথম ব্যক্তি যিনি শব্দের বিভিন্ন ব্যবহার দেখাতে চিত্র ও উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। ১৮০৬ সালে এই কানেকটিকাটেরই অধিবাসী নোয়াহ ওয়েবস্টার ৪০০০০ শব্দ সমৃদ্ধ একটি ডিকশনারী রচনা করেন। তবে তিনি আমেরিকার শব্দকোষবিদ্যার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক স্থাপন করেন ১৮২৮ সালে, যখন তিনি *An American Dictionary of the English Language* নামক ৭০০০০ শব্দসম্বলিত ডিকশনারীটি রচনা করেন। ওয়েবস্টারের এই মাস্টারপিসটি সর্বপ্রথম ডিকশনারী হিসাবে আমেরিকা-ইউরোপে সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা পায়। জনসন ও ওয়েবস্টারের পর অনেক ডিকশনারী এসেছে এবং গত হয়েছে কিন্তু আটলান্টিকের এপার-ওপারে *Oxford English Dictionary*-এর মত আর কোন ডিকশনারী বিখ্যাত হতে পারেনি। লন্ডন থেকে প্রকাশিত এই ডিকশনারীর জন্ম অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে হলেও ১৯২৮ সালের পূর্বে তা পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেনি। ডিকশনারীটি ইংল্যান্ড ও আমেরিকার সহস্রাধিক বিশেষজ্ঞের সহায়তায় এবং জন সিম্পসন ও এডমান্ড ওয়েইনারের সম্পাদনায় রচিত হয়। এতে সতের শতক থেকে শুরু করে আধুনিককাল পর্যন্ত সংরক্ষিত সকল ইংরেজী শব্দ ও তার ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ফলে কেবল একটি শব্দ Place-এর নানাবিধ ব্যবহার উল্লেখ করতে মুদ্রিত পৃষ্ঠায় ২০/২৫ পৃষ্ঠা লেগে গেছে। বিশ্বের সর্ববৃহৎ এই ডিকশনারী ১২ খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে যাতে ২২ হাজার পৃষ্ঠা রয়েছে এবং প্রায় সাড়ে চার লক্ষ শব্দ ও আড়াই মিলিয়ন ব্যাখ্যামূলক উদ্ধৃতি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ১৯৮৯ সালে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের পর ২০১০ সালের এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। ইলেক্ট্রনিক ভার্সন সর্বপ্রথম বের হয় ১৯৮৮ সালে। ২০০৯ সালে এর ৪র্থ সংস্করণ বের হয়েছে। ২০০০ সাল থেকে অনলাইনেও এটি উন্মুক্ত করা হয়। এছাড়া বর্তমানে নন-ন্যাটিভদের জন্য সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ডিকশনারী হল অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত *'Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English'* যা আলবার্ট সিডনী হর্নবাই নামক এক বৃটিশ স্কুল শিক্ষক রচনা করেন। ১৯৪২ সালে জাপানে সর্বপ্রথম এটি প্রকাশিত হয়েছিল। বিশ্বের সর্বাধিক বিক্রিত বইয়ের অন্যতম এই জনপ্রিয় ডিকশনারীটির অষ্টাদশ সংস্করণ ২০১০ সালে প্রকাশিত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, ইংরেজী ডিকশনারীতে সর্বাধিক এন্ট্রি রয়েছে T শব্দটির। কেননা ইংরেজী ভাষায় প্রারম্ভিক শব্দ হিসাবে এ শব্দটির ব্যবহার সর্বাধিক। আর সবচেয়ে ব্যবহৃত অক্ষর হল E। সর্বাধিক প্রচলিত শব্দ the, of, and এবং to। বর্তমানে বিশ্বের প্রায় সকল ভাষারই ইংরেজী শব্দার্থ ডিকশনারী রয়েছে।

আলোকপাত

???? *কোন কোন ব্যক্তি আক্বীদায়ে সালাফ ও মানহাজে সালাফের মধ্যে পার্থক্য করে থাকেন। ফলে দেখা যায় তারা সালাফী আক্বীদাসম্পন্ন হলেও প্রচলিত বিভিন্ন মতবাদের অনুসারী দলের সাথে সম্পৃক্ত, অথচ কার্যক্ষেত্রে মতবাদগুলোর সাথে সালাফে ছালেহীনের মানহাজের বৈপরিত্য রয়েছে। প্রশ্ন হল, সালাফী মানহাজ বাস্তবায়ন করার জন্য আক্বীদায়ে সালাফের সাথে মানহাজে সালাফ অনুসরণ করাও কি সমভাবে অপরিহার্য?*

-আব্দুর রশীদ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

আক্বীদায়ে সালাফ ও মানহাজে সালাফ পৃথক কিছু নয়। দু'টিরই অনুসরণ করা অপরিহার্য। ব্যবহারিক অর্থে মানহাজ আক্বীদার চেয়ে ব্যাপকতর (আম) শব্দ। আক্বীদা হল অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাসকেন্দ্রিক, আর মানহাজ হল দৃশ্যমান জগতকেন্দ্রিক। মানহাজ শব্দটি আক্বীদা (মৌলিক বিশ্বাস), সুলূক (আচরণবিধি), আখলাক (চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য), মু'আমালাত (পারস্পরিক সম্পর্ক ও ব্যবসায়িক লেনদেন) অর্থাৎ একজন মুসলমানের বাস্তব জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপকে পরিবেষ্টন করে। আর আক্বীদা হল ঈমান ও কালেমায়ে শাহাদতের ভিত্তিমূল এবং এ দু'টির মধ্যেই আক্বীদার সীমানা পরিব্যাপ্ত। সুতরাং বলা যায়, আক্বীদা ও মানহাজ শব্দদ্বয় একই জীবনব্যবস্থার দু'টি পৃথক শাখার নাম, একটি বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত, অপরটি আমলের সাথে সম্পৃক্ত। ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রেখে একটি অপরটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এর মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই বা করা সম্ভব নয়।

আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী এ সংক্রান্ত একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেন, আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং তাঁর ইবাদতের ক্ষেত্রে মানহাজ ও আক্বীদার সমঅবস্থান ও পৃথক অবস্থান উভয়ই বিদ্যমান। সাধারণভাবে আক্বীদা মানহাজের চেয়ে সুনির্দিষ্ট ও স্বল্প পরিসরের শব্দ। ওলামায়ে কেরাম আক্বীদা শব্দটিকে 'তাওহীদের ইলম'-এর সাথে সংযুক্ত করেছেন, যা ইসলামের মৌলিক বিষয়বস্তু। আর মানহাজ শব্দটি আক্বীদা বা তাওহীদের চেয়ে ব্যাপকার্থক শব্দ। কিন্তু যারা এখানে পার্থক্য করতে চাইছেন তাদের উদ্দেশ্য ভিন্ন। তারা মূলত দাওয়াতের ময়দানে এমন পদ্ধতি অবলম্বন করতে চান যা সালাফে ছালেহীনের নীতিবিরোধী, যেমন তারা হয়ত তথাকথিত গণতন্ত্র বা সামাজিক ন্যায়বিচার বা অনুরূপ কিছু প্রতিষ্ঠার কথা বলবেন। যার অর্থ তারা অবিশ্বাসী, কাফেরদের নীতি-পদ্ধতিকে অনুসরণ করার অনুমতি চান। এক্ষেত্রে আমার বক্তব্য হল, সর্বশক্তিমান আল্লাহ আমাদের জন্য যে শরী'আত দান করেছেন তার মাধ্যমে আক্বীদা ও মানহাজের মধ্যে পার্থক্য করা এবং কাফিরদের নীতি-বিধানের শরণাপন্ন হওয়ার প্রয়োজনীয়তা নিঃশেষ হয়ে গেছে। সেসব বিধান হয়ত কাফিরদের জন্য উত্তম। কেননা তাদের এমন কোন শরী'আত নেই যার দ্বারা তারা পরিচালিত হবে। কিন্তু কোন মুসলিমের জন্য তা অনুসরণ করার বৈধতা নেই। সুতরাং একজন মুসলিমের জন্য সালাফে ছালেহীনের আক্বীদা পোষণ করা যেমন অপরিহার্য কর্তব্য, তেমনি তাদের অনুসৃত মানহাজ অনুসরণ করাও সমভাবে অপরিহার্য *(মাজাল্লাতুছ ছলাহ, ২২তম সংখ্যা)*।

অনুরূপই অনেকে বলে থাকেন যে, যেহেতু আমাদের আক্বীদা এক সেহেতু আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, হোক না আমাদের মানহাজ ভিন্ন। এর জবাব কি হবে? শায়খ তারাহীব আদ-দোসরী এর উত্তরে বলেন, বিষয়টি সাধারণ। মূলত আক্বীদা ও মানহাজ একই জিনিস; বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। যার মানহাজ সঠিক তার আক্বীদাও অবশ্যই সঠিক। যার মানহাজে গলদ রয়েছে তার আক্বীদাতেও গলদ রয়েছে। উদাহরণত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা হল, আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীকে অবিকলভাবে সত্যায়ন করা এবং একজন পাপীকে শুধুমাত্র তার পাপের জন্য কাফির সাব্যস্ত না করা। এ বিষয়টি আক্বীদা ও মানহাজ উভয়ের সাথেই সম্পৃক্ত। সুতরাং এক্ষেত্রে কারো মানহাজ যদি ভিন্ন হয় তাহলে এটা বলার উপায় নেই যে, তার আক্বীদা বিশুদ্ধ এবং কুরআন-সুন্নাহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অনুরূপভাবে সেই ব্যক্তি যে একজন ছূফী এবং সে ইবাদতে আল্লাহ্র সাথে এমন কাউকে শরীক করে, যা আল্লাহ তার জন্য সিদ্ধ করেননি। সুতরাং কেউ যদি সুন্নী হয় তবে সে ছূফী হতে পারে না, আবার ছূফী হলে সুন্নী হতে পারে না। অর্থাৎ একজন ছূফীর মানহাজ সুন্নী থেকে পৃথক হওয়ার সাথে সাথে আক্বীদাও পৃথক। সুতরাং আক্বীদার মিল থাকলেই যথেষ্ট, মানহাজের ভিন্নতা কোন সমস্যা নয়-এ চিন্তা ভুল এবং বাস্তবতার বিপরীত (*মানহাজ ডটকম*)।

সুতরাং ইসলামের সত্য ও সঠিক রূপকে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠা করতে সালাফে ছালেহীনের আক্বীদা ও মানহাজ উভয়টিই সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করতে হবে। এটাই সঠিক ও চিরন্তন নীতি। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর প্রেরিত পথ অনুসরণ ও তার উপর অটল থাকার তাওফীক দান করুন-আমীন!!

???? *আরবীতে العام ও السنة শব্দ দু'টি বছর বা সাল অর্থে ব্যবহৃত হয়। বাক্যের মধ্যে এদের ব্যবহারবিধি কিরূপ হবে?*

-আসাদুয্যামান
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

শব্দ দু'টি একই অর্থে ব্যবহৃত হলেও উভয়ের মাঝে সম্পর্কটি হল عام وخاص مطلق। অর্থাৎ السنة শব্দটি عام (সাধারণ অর্থজ্ঞাপক) এবং العام শব্দটি خاص (সীমিত ও নির্দিষ্ট অর্থজ্ঞাপক)। যেমন- الكل (সমগ্র) ও الجمع (সমগ্র) শব্দদু'টি। প্রথমটি দ্বারা কিছু অংশ শামিল করা বুঝায় আর দ্বিতীয়টি দ্বারা যাবতীয় অংশকে শামিল করা বুঝায়। অর্থগতভাবে العام শব্দটি أيام (দিনসমূহ)-এর বহুবচন এবং السنة শব্দটি شهور (মাসসমূহ)-এর বহুবচনসূচক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয় عام الصيف وعام الشتاء وعام الفيل (গ্রীষ্মকাল, শীতকাল বা হাতির বছর) এবং سنة مائة وسنة خمسين (১০০ সাল বা ৫০ সাল)। পবিত্র কুরআনে শব্দদ্বয়ের ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য রেখে ভাষাবিদগণ অনুরূপ পার্থক্য করেছেন। এছাড়া কুরআনে السنة দ্বারা কষ্ট ও পরিশ্রমপূর্ণ সময়কাল *(ইউসুফ ৪৭)* এবং العام দ্বারা স্বস্তি ও প্রশান্তিপূর্ণ সময়কাল বুঝানো হয়েছে *(ইউসুফ ৪৯)*। সুতরাং শব্দদু'টি interchangeably ব্যবহার না করে স্থানবিশেষে পৃথকভাবে ব্যবহার করাই সমীচীন।

জীবনের বাঁকে বাঁকে

আমেরিকায় পড়ি

-শাহরিয়ার নির্ঝর, ভার্জিনিয়া থেকে

সেই তিন বছর বয়সে কাঁধে স্কুলব্যাগ নিয়েছি, এরপর প্রায় দুই যুগ পেরিয়ে গেছে, অথচ এখনও সেটা নামাতে পারিনি। ক্লাস রুমের সেমি রিভলবিং চেয়ারে বসে এক দৃষ্টিতে বোর্ডের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একে একে পেরিয়ে যেতে দেখলাম পল্লীমা সংসদ, গভঃল্যাব, ঢাকা কলেজ, বুয়েটকে। হঠাৎ খেয়াল হল কেমন যেন একটু শীত শীত করছে, নিস্তব্ধ পরিবেশ, সামনে হাসিমুখে এক শ্বেতাংগ ভদ্রলোক প্রবল আগ্রহে বক বক করছে আর জাত-বিজাতের নানান মানুষ তার কথা খুব মন দিয়ে শুনছে- 'নট অল ইনফিনিটি ইস দ্য সেইম'! দেয়ার আর মোর রিয়াল নাম্বারস দ্যান র‍্যাশনালস, বাট দেয়ার আর এজ মেনি ইন্টেজারস এজ র‍্যাশনাল নাম্বারস। নাম্বারস দ্যাট আর ইভেন, হ্যাভ দ্য সেইম কার্ডিনালিটি এজ অড ওয়ানস- ইন্টরেস্টিংলি, ইচ অফ হুইচ ইকুয়ালস দ্য টোটাল নাম্বার অফ ইন্টেজারস!- এনি কোয়েসশেন এবাউট দ্যাট?' ভদ্রলোক এই বলে একটু থামলেন। তাকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করল, 'আমি এখন কোথায়'? ইউনিভার্সিটি অফ ভার্জিনিয়া' দু'চোখ শীতল করে দেবার মত সুন্দর এক ইউনিভার্সিটি। শারলোটসভিল শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত, আমেরিকান প্রেসিডেন্ট জেফারসনের নিজ হাতে গড়া স্বপ্নের ইউনিভার্সিটি হচ্ছে আমাদের ইউভিএ। আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটনের কাছাকাছি হওয়াতে এতে যেমন এক দিকে রয়েছে আধুনিকতার স্পর্শ, অন্যদিকে রয়েছে পাহাড়ি প্রকৃতি ও বর্ণিল গাছগাছালির মোহনীয় স্নিগ্ধতা। এর সৌন্দর্য নিখুঁতভাবে ব্যাখ্যা করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য, তবে একটা সহজ উদাহরণ দিয়ে বলা যেতে পারে- কেউ যদি শারলোটসভিল শহরের যে কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে দু'থেকে তিন মেগাপিক্সেলের মাঝারি মানের একটি ক্যামেরা দিয়ে র‍্যান্ডম এক ডজন ছবি তোলে, তবে সেই ছবিগুলো দিয়েই নতুন সালের জন্য অসাধারণ একটি ক্যালেন্ডার তৈরি করা যাবে। একটু আগে যার কথা বলছিলাম তিনি প্রফেসর গ্যাব্রিয়াল রবিনস। আমরা তাকে ডাকি 'গেইব'। এখানে আমেরিকায় এ ব্যাপারটি খুবই অদ্ভুত যে, প্রফেসরদেরকে ছাত্ররা সবাই নাম ধরে ডাকে। যারা উপমহাদেশ থেকে এখানে আসে, প্রথম প্রথম তাদের সবারই এটাতে অভ্যস্ত হতে বেশ সময় লাগে। অবশ্য কিছুদিন পর এটাকেই স্বাভাবিক বলে মনে হয়। গেইব আমাদের অ্যাডভানড থিওরী অফ কম্প্যুটেশন ক্লাস নেয়। তার বৈশিষ্ট্য- সে সব সময় একটা কালো হাফহাতা টী-শার্ট, কালো প্যান্ট আর কালো স্পঞ্জের স্যান্ডেল পরে ক্লাসে আসে। আমি তার এই ড্রেসের কোন ব্যতিক্রম দেখিনি। শুধুমাত্র একদিন বোধহয় তার গায়ে একটা কালো চাদর ছিল। তার স্বভাব হল ক্লাসে এসেই সে সবাইকে কার্টুন আঁকা একটা করে পেইজ দেবে। এরপর ট্রানপারেন্ট শিটে প্রিন্ট করা স্লাইডগুলো প্রজেক্টরে ঢুকিয়ে অতি উচ্চমার্গের থিওরেটিকাল কথাবার্তা শুরু করবে। লোকটা থিওরীতে এত বেশি স্ট্রং যে, আমরা যারা বাংলাদেশের ছাত্র তাদেরও মাঝে মাঝে ভ্রু কুচকে তাকাতে হয় সে কি বলল সেটা বোঝার জন্য। এখানে প্রসংগত উল্লেখ্য যে, এখানকার চায়নীজ, ইন্ডিয়ান এমনকি আমেরিকান ছাত্রদের দেখে আমার মনে হয়েছে- থিওরেটিক্যাল কম্পিউটার সায়েন্সে আমরা বাংলাদেশের ছাত্ররা অন্যান্য দেশের ছাত্রদের তুলনায় বেশ স্ট্রং। আমাদের দেশের আন্ডারগ্রাজুয়েট লেভেলের পড়াশোনার মান যে আসলেই অন্যান্য দেশের চেয়ে ভালো এটা এখানে এসে আমরা প্রতিনিয়ত বুঝতে পারছি এবং মনে মনে নিজেদেরকে ধন্য মনে করছি। গেইব অবশ্য কিছু কিছু জিনিস আলোচনা করতে করতে মাঝে মাঝে এত গভীরে চলে যায় যে, কি নিয়ে যে কথা হচ্ছিল সেটা সেও ভুলে গেছে, আমরাও ভুলে গেছি। সবাই বলে গেইব একটা পাগল, এর মাথা পুরো খারাপ হয়ে গেছে। আমার কাছে কিন্তু তাকে বেশ ভালো লাগে। প্রফেসরদের নাম ধরে ডাকার মতই আরেকটি অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে যে, এখানে ক্লাসে ছাত্ররা অনেকটা যা খুশি তাই করতে পারে। যেমন, কেউ ট্রে ভর্তি করে বার্গার, স্যান্ডুইচ, কফি নিয়ে এসে খাচ্ছে, কেউ বেঞ্চের ওপর পা তুলে বসে আছে, কেউ মনোযোগ সহকারে তার ল্যাপটপ নিয়ে ব্যস্ত- অথচ প্রফেসররা তাদের কাউকে একটা কিছুও বলবে না। এখানে লজিক হচ্ছে, কেউ ক্লাস ফলো না করলে সেটা তার নিজের ব্যাপার, প্রফেসরের সেটাতে কোন কিছু যায় আসে না। আমি কল্পনা করার চেষ্টা করছি, বুয়েটের একটা ক্লাসরুমে কোন এক ছাত্র ঠোঙ্গাভর্তি সিঙ্গারা খেতে খেতে সাইদুর রহমান স্যারের ক্লাস করছে, স্যারকে দেখে নাম ধরে ডেকে বলছে- 'হেই, হোয়াটস আপ'?- তাহলে কি ঘটনা ঘটতে পারে? এটা কল্পনাতে আনতে কষ্ট হলেও আমেরিকায় এটা খুবই স্বাভাবিক। এমনকি এটা যে অস্বাভাবিক কিছু হতে পারে সেটাই এখানকার কাউকে রাতদিন চেষ্টা করেও বোঝানো যাবে না। এখানকার পড়াশোনায় যে বিষয়টি আমার কাছে চোখে পড়েছে তা হচ্ছে- 'ফ্লেক্সিবিলিটি'। যেমন, আন্ডারগ্রাজুয়েট লেভেলে এখানে ছাত্রদের কোন নির্দিষ্ট ডিপার্টমেন্ট নেই। যার যে কোর্স নিতে ইচ্ছে করে সে সেটাই নিতে পারে। কোন একজন ছাত্রের কোর্স লিস্টে একই সাথে সাহিত্য, ইলেকট্রনিক্স, জাভা প্রোগ্রামিং, বাণিজ্য সবকিছুই থাকতে পারে। অবশ্য পড়াশোনার একটা পর্যায়ে গিয়ে তাকে কোন একটা 'মেজর' বেছে নিতে হয়। মূল ব্যাপারটা হচ্ছে, এখানে একজন ছাত্র দেখে-শুনে-বুঝে নিজের বুদ্ধিতে নিজের ভবিষ্যতকে গড়তে পারে। আমাদের দেশের মত ভাবগম্ভীর পরিবেশে এ্যাডমিশন টেস্ট নিয়ে, ছাত্রের ইচ্ছা-অনিচ্ছার তোয়াক্কা না করে, জোর করে তাকে কোন এক ডিপার্টমেন্টে বসিয়ে দেয়া হয় না। শিক্ষকতা করতে গিয়ে আমি বুয়েটে এমনটা অনেক শুনেছি- 'স্যার, ইলেক্ট্রিক্যাল পড়ছি, কিন্তু আমার তো প্রোগ্রামিং করতেই বেশী ভালো লাগে'। আবার আমার ডিপার্টমেন্টের খুব মেধাবী স্টুডেন্টকেও অভিযোগ করতে শুনেছি- 'আমি কম্পিউটার পড়তেই চাইনি, আর্কিটেকচারের মেরিট লিস্টে অষ্টম ছিলাম, আমাকে জোর করে বাসা থেকে কম্পিউটার পড়তে দিয়েছে'। এই ছোট্ট একটা জিনিস যদি আমাদের দেশের ইউনিভার্সিটিগুলো অনুকরণ করে, তাহলেই কিন্তু আমাদের ছাত্রদের মাঝের হতাশা একদম কেটে যাবে। চার-পাঁচ বছর আগে না বুঝে নেয়া একটা দুর্বল সিদ্ধান্তের জন্য আজীবন আর কাউকে আফসোস করতে হবে না। এই পরিবর্তন যারা করতে সক্ষম, তাদের কেউ কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছে? আমেরিকানদের কাছে সবকিছুর মত পড়াশোনাটাও একটা আনন্দের বিষয়, ওদের ভাষায়- 'ফান'। এই ফানি ছাত্রদের 'ফান' আমাকে প্রতিদিনই খুব কাছে থেকে দেখতে হচ্ছে। আমার পিএইচ.ডির পুরো খরচ ইউনিভার্সিটি বহন করলেও বিনিময়ে আমাকে কোন একজন প্রফেসরকে আন্ডারগ্রাজুয়েট কোর্সে কিছুটা সাহায্য করতে হয়। এই সেমিস্টারে আমার দায়িত্বের মাঝে পড়েছে আন্ডারগ্রাজুয়েট ছাত্রদের জাভা এবং কম্পিউটার আর্কিটেকচার ল্যাবগুলো নেয়া। 'বুয়েটের শত শত ছাত্রের কত কোর্স নিয়েছি, এসব ল্যাব তো ডাল-ভাত'- প্রথমে এটা মনে করলেও পরে বুঝতে পেরেছি এখানকার ডাল এবং ভাত দু'টোই ভিন্ন। প্রথমদিন ক্লাসে ঢুকে ছাত্র-ছাত্রীদের দেখেই আমার বিচিত্র এক অনুভূতি হল। পোশাক-আশাক দেখে দু'একজনকে মনে হল বাথরুম থেকে বের হয়ে প্যান্ট-শার্ট না পরেই ক্লাসে চলে এসেছে। দু'একটা ছেলে জিন্সের প্যান্ট এত নিচু করে পরা, মনে হলো একটু অসাবধান হলেই বোধহয় সেটা খুলে পড়ে যাবে। কানে দুল দেয়া ছাত্র আমি বাংলাদেশেও দেখেছি, কিন্তু ঠোঁট ফুটা করে সেখানে দুল পরতে আমি সেদিন প্রথম কাউকে দেখলাম।

পরবর্তী ধাক্কাটা খেলাম যখন একজন ছাত্র আমাকে দেখে বলল- 'হেই, হাউ ইউ ডুইং'। আমি বিস্ময় চেপে, অমায়িকভাবে একটু হেসে স্পষ্ট বাংলায় তাকে বললাম- 'কেমন ডুইং এটা তোরে আমি গ্রেড দেয়ার সময় বুঝিয়ে দিব'। ছেলেটা কিছু না বুঝেই খুব শব্দ করে হাসতে লাগল। ক্লাসের মাঝে এদের হাসি, আনন্দ, একে অন্যের সাথে লাফিয়ে উঠে হাই-ফাইভ করা- এসব দেখে মাঝে মাঝে কি করা উচিত বুঝে উঠতে পারি না। বুয়েটের মত ভাবগম্ভীর পরিবেশ থেকে এমন খুব বেশী খোলামেলা পরিবেশে এসে নিজেকে মাঝে মাঝে বোকা মনে হয়। কম্পিউটার আর্কিটেকচার ল্যাবে আমার সাথে আরেকজন টিএ হচ্ছে- এনামুল। ব্যাপারটা কাকতালীয় যে, এরা আমাদের মত আনকোরা দু'জন বাংলাদেশী গ্রাজুয়েটকে আশি জন আমেরিকান ছাত্র-ছাত্রীকে পড়ানোর দায়িত্ব দিয়েছে এবং ঘটনাক্রমে আমরা দু'জনই বুয়েটে শিক্ষকতা করেছি একসাথে। একবার আমি আর এনামুল এই ল্যাব ক্লাসে বসে বসে আলাপ করছি। সেদিন একটা ছাত্র মাথার চুল সম্পূর্ণ কমলা রঙ করে ক্লাসে এসেছে। অনেকদিন হয়ে যাওয়াতে এসব এখন আমরা দেখেও না দেখার ভান করি। হঠাৎ দেখলাম ছেলেটা আমাদের বেশ কাছাকাছি (আনুমানিক তিন ফিট দূরে) এসে দাঁড়াল। এরপর আমাদের সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে নাচতে শুরু করল। ছেলেটা কোন একটা নাচের স্টেপ প্রাক্টিস করছে যেটাতে কিছুক্ষণ বাতাসে দুই পা ছোঁড়াছুঁড়ি করে, জায়গায় দাঁড়িয়ে ভার্টিকাল এক্সিস বরাবর কয়েক চক্কর ঘুরতে হয়। পুরো ব্যাপারটা প্রায় মিনিট দুয়েকের বেশি সময় ধরে নিখুঁত না হওয়া পর্যন্ত সে করতে লাগল এবং আমরা দু'জন হতবাক হয়ে পুরো সময়টা তাকে দেখলাম। ছেলেটা আবার তার সিটে চলে গেলে আমি আর এনামুল একে অন্যের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলাম। এনামুল শেষ পর্যন্ত নীরবতা ভেঙ্গে বলল, 'কি করবেন ভাইয়া'? পড়াশোনার মত এদেশে গ্রেডিং পদ্ধতিও বেশ ফ্লেক্সিবল। আমাদের মতো ছকবাঁধা নিয়মে গ্রেডিং করা হয় না। পরীক্ষার খাতা দেখার পর, সবার পরীক্ষার নম্বরকে সর্ট করে, সেই নম্বরগুলোর কার্ভ এঁকে দেখা হয় কত পারসেন্টকে এ+, কত পারসেন্টকে বি+ ইত্যাদি ধরা হবে। পুরো সেমিস্টারে পরীক্ষাও মাত্র দু'টো- একটা মিডটার্ম ও একটা ফাইনাল এবং দু'টোর সিলেবাসও আলাদা। এছাড়া মিডটার্মে কেউ খারাপ করলে সে ইচ্ছে করলে সেই কোর্স ড্রপ করতে পারে এবং এতে তাকে কোন পেনাল্টিও দিতে হবে না। এখানে ক্লাসটেস্টেরও কোন বালাই নেই, তবে এর বদলে বেশ কঠিন কঠিন কিছু হোমওয়ার্ক করতে হয়। এছাড়া প্রায় প্রতিটি কোর্সের সাথেই একটি করে ল্যাবক্লাস থাকে এবং এই ল্যাবগুলোতে সচরাচর আলাদা করে গ্রেডিং করা হয় না। ল্যাবে ছাত্ররা আসে থিওরীতে যা শেখে সেটাকেই একবার হাতে কলমে করে দেখার জন্য। কিছু কিছু কোর্সে ছাত্রদের প্রজেক্টও করতে হয়। কিন্তু সেটার জন্যও তারা ল্যাবে আসে এবং টিচারের উপস্থিতিতেই পুরো কাজটা করে। মোটকথা, স্কুলের পড়াশোনা স্কুলে শিখে, স্কুলেই হাতে কলমে প্রাকটিস করে বাড়িতে গিয়ে হৈচৈ করো- এটাই হচ্ছে এখানকার পড়াশোনার মূলনীতি। এখানকার পড়াশোনার পদ্ধতি, সুযোগ-সুবিধা, অবকাঠামো- সবকিছু কাছে থেকে দেখে আমার মনে হয়েছে, আমাদের দেশের যেসকল মেধাবী শিক্ষার্থীরা চরম বৈরী পরিবেশেও শুধু মনের জোরে টিকে আছে (এবং এমনকি ভালোও করছে), তাদেরকে যদি এর সিকি অংশ সুযোগ-সুবিধাও দেয়া হত তবে আমাদের ছেলে-মেয়েরা আরও অনেক বেশি ভালো করত।

অনার্সের অরিয়েন্টেশনের দিন

-আমাতুল্লাহ, সিডনী থেকে

দূর থেকে নিকোলের সাথে মেয়েটাকে দেখে আমি একটু চমকে গিয়েছিলাম। আমার চেয়ে বেশ লম্বা। ৫ ফুট ৯ ইঞ্চির মত হবে উচ্চতা। আরও লম্বা লাগছে পা থেকে মাথা পর্যন্ত কালো কুচকুচে বোরকা পরে আছে তাই। দুই চোখ ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। চোখের যতটুকু শুধু দেখার জন্য দরকার, ঠিক ততটুকুই খোলা। একটু চমকে গিয়েছিলাম, কারণ আমাদের পুরা ফ্যাকাল্টিতে অনার্সের মুসলিম স্টুডেন্ট এতদিন দুই জন ছিল, কিন্তু আমি একাই হিজাবী/ব্যক্তিগত পর্যায়ে সিরিয়াস প্রাকটিসিং ছিলাম। প্রেজেন্টেশন করার সময় পুরা হলের সামনে একা হিজাবী দাঁড়াতে একটু সাহস সঞ্চয় করতে হত! ফর্মাল পোশাক কি পরব, সেই চিন্তায় তটস্থ থাকতাম। এখন আরেকজন দলে জুটলো, তাও একেবারে কালো বোরকা আর চোখ ছাড়া সব ঢাকা! ধারণা করলাম, আরব-টারব হবে হয়তো। মুখ খুলতেই আরব উচ্চারণে কিছু শোনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম, তখনই দ্বিতীয় চমক পেলাম। 'হাই, আই অ্যাম ফেইথ, ফেইথ মরিস, হাউ ডু য়ু ডু', হাত বাড়িয়ে দিলো মেয়েটা। ফেইথ মরিস নামটা আরব দূরে থাক, মুসলিমই শোনাচ্ছে না, আর উচ্চারণ আরবদের ধারে কাছে নেই, পুরাপুরি সফিস্টিকেটেড, প্রফেশনাল ইংরেজী! আমাদের ফ্যাকাল্টি এক হলেও ডিপার্টমেন্ট আলাদা, সেই সুবাদে খুব নিয়মিত দেখা হয় না, কিন্তু আস্তে আস্তে অনেক কথাই হল। ও কনভার্টেড মুসলিম। সতের বছর বয়সে মুসলিম হয়েছে নিজে পড়াশোনা করে। ও অন্য ইউনিভার্সিটিতে পড়েছে আন্ডারগ্রাজুয়েটের গত তিন বছর। আমাদের ইউনিভার্সিটির ডিগ্রী থাকার প্রেস্টিজ বেশি, তাই এখানে অনার্স করতে চেয়েছে। অনার্সের প্রথম প্রেজেন্টেশনের দিন ফেইথ যখন বিশাল বড় লেকচার থিয়েটারের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো তখন হঠাৎ করেই সব কথা বন্ধ হয়ে গেল। হল ভর্তি বিজ্ঞানীরা নড়ে চড়ে বসলেন। উচ্চারণ বুঝা যাবে তো? ফেইথ কথা শুরু করতেই সবাই হতভম্ব। দারুণ প্রেজেন্ট করলো, প্রশ্নোত্তর পর্বের উত্তরগুলোও দারুণ আত্মবিশ্বাসী ছিল। আমার কেমন অদ্ভুত একটা ভালো লাগা হচ্ছিল। অনার্সের ফাইনাল প্রেজেন্টেশনটাও যথারীতি ফাটাফাটি। এক অডিটরিয়াম ভর্তি ডাক্তার, ইউনিভার্সিটি প্রফেসর, অস্ট্রেলিয়ার বেশ কয়েকজন প্রথম সারির বিজ্ঞানীর সামনে শুধু চোখ ছাড়া আর সব ঢাকা এই মেয়েটার আত্মবিশ্বাস আর সাবলীলতা রীতিমত ঈর্ষণীয়। প্রেজেন্টেশনের পরে কথা হচ্ছিল ভবিষ্যত পরিকল্পনা নিয়ে। জানলাম ও সিডনী ইউনিভার্সিটিতে পোস্ট গ্রাজুয়েড মেডিসিনে চান্স পেয়েছে!!!! এতগুলো আশ্চর্যবোধক চিহ্নের কারণ হচ্ছে, সিডনী ইউনিভার্সিটি অস্ট্রেলিয়ার প্রাচীনতম এবং মহা ঐতিহ্যবাহী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটা। সিডনী ইউনিভার্সিটির মেডিসিন ভীষণ রকমের প্রেস্টিজাস, চান্স পাওয়াটাও তাই খুবই কঠিন। সাবকন্টিনেন্টের মানুষজন গাল ফুলিয়ে বলে মুসলিম, হিন্দু আর বাদামী চামড়ার কেউই নাকি চান্স পায় না, হিজাবী মুসলিম তো দূরের কথা (নিকাবী তো অকল্পনীয়)! শুনেছি, বিবাহিতদেরও নাকি নিতে চায় না, ক্যারিয়ার ফোকাস কমে যাবে তাই। আর এই মেয়ে সবগুলো প্রচলিত ধারণার বিপরীতে গিয়ে তিন ধাপের সিলেকশন স্টেইজ পার হয়ে, সামনা-সামনি মৌখিক পরীক্ষাতেও উতরে গেল! আমার অদ্ভুত ভালো লাগা হল। মেইকআপ আর আমি তেল আর জল, এক সাথে মিশ খাই না। এ যুগের মেয়ে হয়েও কাজল ছাড়া আর কিছু দিতে জানি না, সেটাও খুব মাঝে মাঝে। কিন্তু পোশাক-আশাক ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তোলার জন্য খুব দরকার, সেটা সব সময় বিশ্বাস করতাম। বোরকা পরব, কিন্তু ফুল তোলা নাকি মেটে আর ফর্মাল রঙের, এসব সিদ্ধান্ত নেই পরিস্থিতি বুঝে। এই মেয়েটাকে দেখে মনে হয়, হয়তো ব্যক্তিত্বে ঘাটতি আছে বলেই পোশাক-আশাক দিয়ে সেই ঘাটতি পূরণ করাটা এত দরকারি মনে হয়! বুঝি, নিকাব পরতে অনেকটুকু সাহসের দরকার হয়। অতটুকু সাহস আমার নেই। আমার ফাইনাল প্রেজেন্টেশনের পরে একজন বুড়ো প্রফেসর মন্তব্য করেছিলেন, 'তোমার প্রেজেন্টেশন দারুণ হয়েছে। স্লাইড, স্টাইল সুন্দর। আর তোমার হাসিটা চমৎকার, সবাইকে মাতিয়ে ফেলার জন্য যথেষ্ট'। সেদিনই ফেইথের প্রেজেন্টেশন দেখে মনে হল, মেয়েটাকে কেউ কখনও শেষের লাইনটা বলবে না। ওর সুন্দর প্রেজেন্টেশনের সেকেন্ডারী কৃতিত্ব কখনও সুন্দর হাসির হবে না। সব সময় ওর আসল মেধা, ব্যক্তিত্ব আর একেবারে ভিতরের সত্তাটাই মানুষের শ্রদ্ধা কুড়াবে।

ভিনদেশের চিঠি

জীবন থেকে নেয়া

-আবু বকর সালাফী
বৈরুত, লেবানন

- কারো আত্মবিশ্বাস এটা প্রমাণ করে না যে সে অহংকারী।
- কারো কান্নার অর্থ এই নয় যে সে দুর্বলচিত্ত।
- কারো প্রফুল্ল আচরণ, আনন্দচিত্ততার অর্থ এই নয় যে, সে দুঃখ-বেদনাশুন্য।
- কোন ব্যক্তি একবার ভুলে নিপতিত হলেই এটা প্রমাণিত হয় না যে, সে অকার্যকর লোক।
- জীবনের অন্যতম বেদনাদায়ক পর্যায় হল নিজ সম্পর্কে অন্যদের ভুল বোঝা।
- আরো একটি বেদনাদায়ক পর্যায় হল এমন এক বন্ধুকে হারানো যে তাকে একনিষ্ঠভাবে ভালোবাসত আর বিনিময়ে এমন বন্ধু পাওয়া যে তার ব্যাপারে যত্নশীল নয়।
- জীবনের সবচেয়ে সুন্দর মুহূর্ত হল যখন কেউ শয়তানকে পরাজিত করে স্বীয় প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তন করে- এমন একটি সময়ে যখন সে দীর্ঘদিন যাবৎ তার প্রভুর সাথে সম্পর্কহীন ছিল। অতঃপর আল্লাহ তার হেদায়াতের পথ খুলে দিয়েছেন এবং তার তওবা কবুল করে নিয়েছেন।
- জীবন কতই না কঠিন হয়ে যায় যখন তা মুখের হাসি কেড়ে নেয়, প্রফুল্লতার উচ্ছল সৌন্দর্য অপহরণ করে নেয়, প্রাণবন্ত আত্মাকে স্থবির করে দেয়; ফলে সে জীবন থেকে নিস্পৃহ হয়ে পড়ে এবং দৃষ্টির সীমানায় বিস্তৃত দুনিয়া পরিণত হয় অন্য এক দুনিয়ায়।
- এটা গুরুত্বপূর্ণ নয় যে নিজের অব্যর্থ মন্তব্য দিয়ে অন্যকে চমৎকৃত করা; বরং গুরুত্বপূর্ণ যে, নিজে যা বিশ্বাস করা তা-ই মানুষকে বলা।
- কোন ক্ষেত্রে অবনমন ঘটা ব্যর্থতার পরিচায়ক নয়; বরং অবনমনস্থলে নিজেকে আটকে রাখাই ব্যর্থতা।
- যা অতীত হয়ে গেছে তার জন্য নিজেকে তিরস্কার করার অর্থ নিজেকে ক্ষতি করা। কেননা তিরস্কার নিজেই একটি বড় বিপদ। বরং ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ এবং নিজের জন্য পুনরায় নতুন লক্ষ্য নির্ধারণ করাই জরুরী।
- মানুষের ব্যক্তিগত বিষয় অনুসন্ধান করতে যাওয়া অত্যন্ত হীনকর কাজ। কেননা এরূপ অর্থহীন বিষয়ে যে আত্মনিয়োগ করে সে তাতে অপছন্দনীয় বিষয় ছাড়া কিছুই পায় না।
- মুচকি হাসি বিদ্যুত ঝলকের চেয়ে কম আয়াসসাধ্য, কিন্তু মর্যাদায় বহুগুণ বেশী।
- হতাশার সময় যে হাসতে পারে সে হতাশা জয় করার পথ দ্রুতই পেয়ে যায়।
- যেখানে কোন দুঃখ-বেদনা ও কষ্টভোগ নেই, সেখানে কোন মহৎ অর্জনও নেই, যেখানে এসবের উপস্থিতি রয়েছে সেখানে বৃহৎ অর্জনের হাতছানি রয়েছে।
- সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যে আস্থাবান বন্ধু খুঁজে পেয়েছে আর তার চেয়েও সৌভাগ্যবান সে ব্যক্তি যে এমন বন্ধুর খোঁজ পেয়েছে যে তার উপরই আস্থা পোষণ করে।
- স্বীয় আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ কর, সে তোমাকে নিয়ন্ত্রণ করার পূর্বেই।

ছোট্ট একটি প্রাণী থেকে একটি বড় শিক্ষা

-মুনীরা আযীয
কাবুল, আফগানিস্তান

বাড়ির পিছনের টেরেসে একদিন সকালে আমি প্রায় একটি ঘন্টা নষ্ট করলাম, এক ছোট্ট পিপড়াকে পর্যবেক্ষণ করে, যে তার আকারের তুলনায় অনেক বড় একটি পাখা বহন করছিল। যাত্রাপথে পিপড়াটি প্রায়ই বাধার সম্মুখীন হচ্ছিল এবং সামান্য বিরতি দিয়ে আবার পথ খুঁজে নিচ্ছিল। এক জায়গায় এসে এটি কংক্রিটের ছোট একটি ফাঁটলের মুখোমুখি হল। একটু থামার পর সে তার বহন করা পাখাটিকে ফাটলের উপর রাখল এবং ফাটল পার হয়ে গিয়ে অপর পার্শ্ব থেকে আবার পাখাটি তুলে নিল। সে যাত্রা অব্যাহত রাখল। আমি আল্লাহ্‌র সবচেয়ে ছোট্ট সৃষ্টির একটি এই পিপড়ার উদ্ভাবনী ক্ষমতা দেখে হতবাক হলাম। আল্লাহ্‌র সৃষ্টির অলৌকিকত্বের স্বাক্ষর সে কত চমৎকারভাবেই না বহন করে চলেছে। আকারে সে অতিশয় ক্ষুদ্র হতে পারে কিন্তু তারও চিন্তা করা, আবিষ্কার করা এবং বাধার মোকাবিলা করার মত মেধাশক্তি রয়েছে। আবার দু'পেয়ে মানুষের মত সংবেদনশীলতা, চারিত্রিক দুর্বলতাও তার মাঝে বর্তমান। কিছুক্ষণ পর পিপড়াটি টেরেসের শেষ মাথায় একটি ফুলবাগানে তার গন্তব্যে পৌঁছে গেল। ক্ষুদ্র একটি ছিদ্র মাটির অভ্যন্তরে তার বাসস্থানের প্রবেশপথ। সহজেই সে ছিদ্রপথে ঢুকে গেল। কিন্তু ছিদ্রের তুলনায় এতবড় পাখাটি সে কিভাবে ঢুকাবে? চেষ্টা করেও সে পাখাটি ঢুকাতে সক্ষম হল না। অবশেষে সারাপথ কষ্ট স্বীকার করে, বুদ্ধি খাটিয়ে, সমস্যার মুকাবিলা করে এ পর্যন্ত পৌঁছার পর পিপড়াটি ক্ষান্তি দিল। পাখাটির মায়া পরিত্যাগ করে সে নিজ বাড়ি ফিরে গেল। পিপড়াটি নিশ্চয়ই এই সমস্যার কথা তার বিরাট অভিযাত্রা শুরুর সময় ভাবেনি। ফলে পাখাটি তার জন্য শেষ পর্যন্ত নিছক বোঝায় পরিণত হল। আমি ভাবলাম, আমাদের জীবনটাও কি এমনই নয়? আমরা আমাদের পরিবার নিয়ে চিন্তিত হই। অর্থের চিন্তা করি। কর্ম, বাসস্থান ইত্যাদি সবকিছু নিয়ে উদ্বিগ্ন হই। মূলত এগুলো তো সব আমাদের জীবনের একেকটি বোঝা। এসব জিনিস দীর্ঘ জীবনপরিক্রমায় আমরা সংগ্রহ করি এবং বড় বড় বাধা থেকে রক্ষা করে সযত্নে বহন করি শুধুমাত্র যেন এটা দেখার অপেক্ষায় যে গন্তব্যস্থলে পৌঁছার পর কিভাবে এটা অর্থহীন হয়ে পড়ছে। কেননা আমরা কোনমতেই সেগুলো সাথে নিতে পারব না। সুতরাং এই পার্থিব জীবনে আমাদের সেসবই উপার্জন করা উচিৎ যা আমাদের পরবর্তী জীবনের জন্য প্রয়োজনীয়; যেসব জিনিস প্রয়োজনীয় নয় তা বহন করা ঐ পিপড়াটির পাখা বহনের চেয়েও অর্থহীন। মৃত্যুর পর কেবল আমাদের কর্ম ছাড়া আর কিছুই আমাদের সাথে থাকবে না। আল্লাহ আমাদের সকলকে পরবর্তী জীবনের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণে সাহায্য করুন- আমীন!!

কবিতা

হে নি শা ন বা হী!

-ফররুখ আহমদ

নিশান কি ঝড়ে প'ড়ে গেছে আজ মাটির পরে?
আধো চাঁদ-আঁকা সেই শাশ্বত জয়-নিশান?
বহু মৃত্যুর প্রলয়-আঘাতে, প্রবল ঝড়ে
নুয়ে গেছে সেই প্রথম দিনের জয়-নিশান?
হামাগুড়ি দিয়ে কারা চলে ঐ পতাকীদল?
কার ক্রন্দনে ভরিছে শূন্য জলস্থল?
নিশান 'কি আজ প'ড়ে গেছে ভূঁয়ে,
নিশান-বাহী কি চলে মাটী ছুঁয়ে,
শিয়রে কি তার কঠিন বাধার জগদ্দল?

হে নিশান-বাহী! আজো সম্মুখে রাতের সীমা,
দৃষ্টি রোধে কি তিমিরাচলের ঘন ম্লানিমা?
আজো সম্মুখে বন্ধুর পথ বালিয়াড়ির
সঙ্গী-বিহীন জনতা-মুখর সাগরতীর?

ঐ দেখো স্রোতে অরূপ আলোতে সূর্যতরী
তীক্ষ্ণ আলোর তুফানে ছিঁড়িছে এ শর্বরী,
এই কালো রাত জমাট-তুহিন হিম-অতল,
ছিঁড়ে চ'লে যায় আলোর ছোঁয়ায় গলানো জল।

পাওনি এখনো আলোর পরশ নবজীবন?
মৃত শব হ'তে হয়নি কি আজো উজ্জীবন,
এখনো সূর্য ভাঙেনি কি এই রাতের সীমা,
এখনো তোমার পথ ছেয়ে আছে ঘন ম্লানিমা?
হে নিশান-বাহী! তাই আছো নূয়ে?
তাই কি পতাকা আছে মাটি ছুঁয়ে?
তবু এই চলা জানি উদয়ের পূর্বাভাষ,
কালো কুয়াশার পর্দায় ঢাকা
তোমার সূর্য, আলো, আকাশ।

পায়ের তলায় প্রবল অশ্বখুরে
মরুবালুকার স্ফুলিঙ্গ উঠে নিমেষে মিলায় দূরে,
ওড়ে বাতাসের শিখার শিখরে মুক্তি লাল,
শ্বেত পতাকায় শান্তিচিহ্ন আল্-হেলাল।
সেই উদ্দাম রণতুরঙ্গ মানে না বাধা,
পলকে পলকে জ্বলে তার খুরে অগ্নিশিখা!
আলোর প্লাবনে কে নিশান-বাহী অগ্রগামী,
ঝড়ের দাপটে ভাঙে শতকের কুজ্ঝটিকা?
আমাকে জাগাও তোমার পথের ধারে,
আমাকে জাগাও এ বিজন কান্তারে,
আমাকে জাগাও যেখানে সেনানী! মানে না বাঁধন রবি,
আমাকে জাগাও যেখানে দীপ্ত সে মদিনাতুন্নবী,
বিশ্বকরুণা, মুক্তি পদ্ম–বেদনা লাল
বহিছে চিত্ত-সুরভিত শ্বেত আল হেলাল।।

নি শা ন

আজ কি অন্ধ নফসের সব
জিন্দানখানা ভাঙতে হবে?
পিছু ঠেলা দিয়ে জড় রোগীদের
দেবে কি আবার বিপুল গতি;
আল-বোর্জের অচল শিখরে
বহাবে কি প্রাণ স্রোতস্বতী!

নিশান আমার! একদিন তুমি হে দূত ঊষার
খালেদের হাতে, তারেকের হাতে, হ'য়েছ সওয়ার,
উমর আলির হাতের নিশান নবীজীর দান;
আমাদের কাছে নিশান তোমার শিখা হ'ল ম্লান।
তুমি আনো ফের হেজাজ মাঠের মরু সাইমুম
ভাঙো আঁধারের শিখর, ওড়াও জড়তার ঘুম,
তুমি আনো সাথে মানবতার সে নির্ভীক ঝড়
প্রলয়াকাশের বুকে জীবনের দাও স্বাক্ষর,
আউষ ধানের দেশে মদিনার সৌরভ ভার
ঝড় বৈশাখে জাগো নির্ভীক, জাগো নিশঙ্ক হেলাল আবার!
হও প্রতিষ্ঠ আকাশে আকাশে নিশান আমার
নিশান আমার।।

(কবি ফররুখ আহমদের 'সাতসাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংগৃহীত দু'টি কবিতার অংশবিশেষ)

সংগঠন সংবাদ

যুব সমাবেশ

সাঘাটা, গাইবান্ধা ২৩ আগস্ট সোমবার : অদ্য বাদ যোহর সাঘাটা কলেজপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক যুব সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। গাইবান্ধা পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর আহ্বায়ক মুহাম্মাদ খলীলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক শেখ আব্দুছ ছামাদ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। সমাবেশে বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও মাদরাসার ছাত্র ও যুবক অংশগ্রহণ করেন।

ছাত্র সমাবেশ

কদমতলা, সাতক্ষীরা ৭ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার : অদ্য বেলা ২-টায় কদমতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদের দ্বিতীয় তলায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক ছাত্র সমাবেশ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মাদ শাহীদুয্যামান ফারূক-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ছাত্র সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা ও যশোর এম এম কলেজের সাবেক উপাধ্যক্ষ প্রফেসর এম নযরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম, সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড.এ. এস. এম. আযীযুল্লাহ ও কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক শেখ আব্দুছ ছামাদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, সহ-সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা গোলাম সারোয়ার, মাহমূদপুর সীমান্ত আদর্শ ডিগ্রী কলেজের উপাধ্যক্ষ মাওলানা মহিদুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর রহমান। সমাবেশে প্রায় দুই শতাধিক ছাত্র অংশগ্রহণ করে।

ছাত্র সংবর্ধনা

বংশাল, ঢাকা ৪ আগস্ট বুধবার : অদ্য রাত ৮-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা যেলার উদ্যোগে যেলা কার্যালয়ে নাজিরা বাজারস্থ মাদরাসাতুল হাদীছের ২০১০ ইং শিক্ষাবর্ষের দাওরায়ে হাদীছের ছাত্রদের বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহ খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক কাযী মুহাম্মাদ হারূনুর রশীদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রাকীব, যেলা 'আন্দোলন'-এর মুবাল্লিগ মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে যেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বশীলবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে যেলার পক্ষ থেকে বিদায়ী ছাত্রদের পুরস্কার প্রদান করা হয়।

আলোচনা সভা

শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ৩০ জুলাই শুক্রবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার শিবগঞ্জ থানাধীন বিশ্বনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলার উদ্যোগে এক দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত দায়িত্বশীল বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর দায়িত্বশীলবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কমিটি গঠন

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ৯ আগস্ট সোমবার **:** অদ্য বাদ আছর 'দারুল হাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ইমামুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক নূরুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক শেখ আব্দুছ ছামাদ, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, দফতর সম্পাদক হারূনুর রশীদ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে হাফেয মুকাররমকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আতীকুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ২০০৯-১০ সেশনের জন্য ৯ সদস্য বিশিষ্ট রাবি 'যুবসংঘ' পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়। কেন্দ্রীয় সভাপতি নতুন দায়িত্বশীলদের শপথ পাঠ করান।

রাজশাহী মহানগরী, ২৪ আগস্ট মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী মহানগরী কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে নওদাপাড়া মাদরাসায় এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী নহানগরী 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হাফেয মুকাররমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক নূরুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক শেখ আব্দুছ ছামাদ, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, দফতর সম্পাদক হারূনুর রশীদ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে মুখতারুল ইসলামকে সভাপতি ও হাফেয আশিকুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট মহানগর 'যুবসংঘ' কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। কেন্দ্রীয় সভাপতি নতুন দায়িত্বশীলদের শপথ পাঠ করান।

'যুবসংঘ' নেতৃবৃন্দের কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল

২০০৯-এ অনুষ্ঠিত (০৭-০৮ সেশন) ও ২০১০ সালে ফল প্রকাশিত মাস্টার্স পরীক্ষায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগ থেকে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল মুযাফ্ফর বিন মুহসিন (প্রথম শ্রেণীতে প্রথম, আধুনিক গ্রুপ) ও অর্থ সম্পাদক শেখ আব্দুছ ছামাদ (সাধারণ গ্রুপ) ১ম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছেন। একই বিভাগ থেকে বর্তমানে সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক ও সাবেক রাবি 'যুবসংঘ' সভাপতি ইমামুদ্দীন (আধুনিক গ্রুপ) ও রাজশাহী যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সেক্রেটারী হাশেম আলী (সাধারণ গ্রুপ) ১ম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। এছাড়া একই সনে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক আরীফুল ইসলাম (বি গ্রুপ) ও কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব (প্রথম শ্রেণীতে প্রথম, বি গ্রুপ) কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। উল্লেখ্য, ০৬-০৭ সেশনেও (অনুষ্ঠিত ২০০৯) মাস্টার্স পরীক্ষায় আরবী বিভাগ থেকে বর্তমান কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক নূরুল ইসলাম (অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম ও ফ্যাকাল্টি ফার্স্ট এবং মাস্টার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম, আধুনিক গ্রুপ) এবং সাবেক সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক ও রাবি 'যুবসংঘ' সভাপতি আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস (অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে ৪র্থ এবং মাস্টার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম, সাধারণ গ্রুপ) কৃতিত্বপূর্ণ রেজাল্টের অধিকারী হন। ফালিল্লাহিল হাম্দ। তারা সকলের দো'আপ্রার্থী।

সাম্প্রতিক মুসলিম বিশ্ব

তিন ফিলিস্তীনী কিশোরীর কৃতিত্ব

আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায় অনুষ্ঠিত ২০১০ সালের আন্তর্জাতিক যুব বিজ্ঞান-প্রযুক্তি মেলায় পুরস্কার লাভ করেছে তিন ফিলিস্তীনী কিশোরী। তাদের প্রজেক্ট ছিল 'অন্ধদের পথপ্রদর্শনের জন্য ইলেক্ট্রনিক লাঠি'। ১৪ বছর বয়সী আসীল আবুল লাইল, নূর আল-আরাদা ও আসীল আল-শার নামক এই তিন কিশোরী পশ্চিম তীরের নাবলুসের আসকার উদ্বাস্তু কেন্দ্রে অবস্থিত জাতিসংঘ (UNRWA) স্কুলে লেখাপড়া করে। ক্যালিফোর্নিয়ার সানজোসে ইন্টেল আয়োজিত বিজ্ঞান-প্রযুক্তি মেলায় ৫৬টি দেশের ১৬১১ জন প্রতিযোগীর মধ্যে চূড়ান্ত পর্বে তারা বিজয়ী হয়। তাদের আবিস্কৃত ইলেক্ট্রনিক লাঠির বৈশিষ্ট্য হল- এটি ইনফ্রারেড সিগন্যালের মাধ্যমে দৃষ্টিহীন ব্যক্তিকে পথ চলার সময় গর্ত, উঁচু-নিচু স্থান, গাছপালা ইত্যাদি সহজেই চিহ্নিত করতে সাহায্য করবে। গাজার সমস্যাসংকুল নাজুক পরিস্থিতির মধ্যেও দীর্ঘ ছয় মাস যাবৎ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর পর তারা প্রজেক্টটি প্রথম নিজেদের স্কুল প্রতিযোগিতায় উপস্থাপন করে। অতঃপর সেখানে বিজয়ী হয়ে সানজোসের আন্তর্জাতিক মেলায় তা উপস্থাপনের জন্য আমন্ত্রণ পায়। আমেরিকার দৃষ্টিহীন ফেডারেশনের প্রধান মার্ক উসলান জানান, এ আবিষ্কার যুগান্তকারী। কেননা ইতিপূর্বে ১৯৭০ সালে যে ইলেক্ট্রনিক লাঠিটি বাজারে এসেছিল তা উচু-নিচু বা গর্তের অবস্থান নির্ণয় করতে পারত না। বর্তমান মডেলটি সে সমস্যা দূর করেছে। বিষয়টি আরব মিডিয়ায় বেশ আলোড়িত হয়েছে।

আমেরিকান ফ্রিল্যান্স সাংবাদিকের ইসলাম গ্রহণ

আমেরিকার উইসকনসিনের অধিবাসী এক ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক সম্প্রতি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আয়েশা রবার্টসন নাম ধারণকারী উক্ত সাংবাদিক আম্মানে একটি কেস রিপোর্ট তৈরীর জন্য ফিল্ড ওয়ার্ক করার সময় মুসলিমদের সংস্পর্শে আসেন এবং কাজের বিভিন্ন পর্যায়ে তাদের আদর্শ দেখে মুগ্ধ হন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি বলেন, তারা আমাকে কখনো ইসলাম গ্রহণে চাপ দেয়নি; বরং আমার উপরই সিদ্ধান্ত ছেড়ে দিয়েছে। আমি ইতিপূর্বে কেমন যেন এক অনুভূতির মধ্যে ছিলাম, যা আমাকে পিছুটান দিয়ে রাখত এবং আমাকে ইসলাম গ্রহণে বাধাদান করত। কিন্তু আমি নিশ্চিত ছিলাম আমার মানসিক অশান্তি দূর করার জন্য এই কুরআনেই আমি সমাধান খুঁজে পাব। আল্লাহ্র অনুগ্রহেই সে সমাধান আমি পেয়েছি যখন আমি সূরা মায়েদার ৮২-৮৫ আয়াত পাঠ করলাম। অতঃপর আমি পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করলাম। এখন আমার মনে হচ্ছে আমি জন্ম থেকেই মুসলিম ছিলাম। ইসলাম যে ফিতরাতের ধর্ম তারই হয়ত স্বাভাবিক অনুভূতি এটি। ইসলামের রূহ এমনই যা আমাকে এরূপ অনুভূতি দিচ্ছে যে আমি যেন বাতাসে উড়ে বেড়াচ্ছি। এটি এমনই এক নে'আমত যা আমাকে স্বীকার করতে বাধ্য করেছে যে, 'ইসলাম গ্রহণের পর আমার জীবনের সবচেয়ে খারাপ মুহূর্তও ইসলাম গ্রহণের পূর্বকালের সর্বাধিক সুন্দর মুহূর্তগুলির চেয়ে অনেক অনেক গুণ উত্তম'।

পাকিস্তানে ভয়াবহ বন্যা

চলতি বছরের জুলাই মাস থেকে পাকিস্তানে শুরু হয় এক ভয়াবহ বন্যা। গত আশি বছরের ইতিহাসে পাকিস্তানে এত বড় বন্যা আর হয়নি। খায়বার পাখতুনওয়ালা, সিন্ধু, পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান জুড়ে মৌসুমী বৃষ্টি শুরু হওয়ার পর এ বন্যার সৃষ্টি হয়। গোটা পাকিস্তানের এক পঞ্চমাংশ অঞ্চল পানিতে তলিয়ে যায়। বন্যার শিকার হয়ে ২০০০-এর বেশী লোক মারা গিয়েছে এবং ১ মিলিয়নেরও বেশী বাড়ী-ঘর বিধ্বস্ত হয়েছে। জাতিসংঘের হিসাবে এ পর্যন্ত ২১ মিলিয়নেরও বেশী লোক সেখানে আহত কিংবা বাস্তুহারা হয়েছে। অর্থনৈতিক ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ কমপক্ষে ৪৩ বিলিয়ন ডলার। সার্বিক ক্ষয়-ক্ষতি ২০০৪ সালের সুনামী, ২০০৫ সালে কাশ্মীরের ভূমিকম্প কিংবা ২০১০ সালে হাইতির ভূমিকম্পকেও অতিক্রম করেছে। বর্তমানে খাদ্য ও বাসস্থানের নিদারুণ অভাবে সেখানে বিরাজ করছে এক চরম মানবেতর পরিস্থিতি।

গ্রাউন্ড জিরোর পার্শ্বে মসজিদ কমপ্লেক্স নির্মাণ নিয়ে বিতর্ক

আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে নাইন ইলেভেন হামলাস্থলের পাশ্ববর্তী এলাকায় একটি বহুতল মসজিদ কমপ্লেক্স নির্মাণকে কেন্দ্র করে আমেরিকায় সম্প্রতি বিরাট তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে। কর্ডোভা হাউস নামে পরিচিত ঐ বিল্ডিংটি ইতিপূর্বেই মসজিদ হিসাবে ব্যবহৃত হত। এ বছর মে মাসে লোকাল কমিউনিটি বোর্ডে বিল্ডিংটি সংস্কার করে নতুন ১৩ তলা বিশিষ্ট এক বহুতল কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়। তারপরই বিষয়টি মিডিয়ার নজরে আসে। ভবনটি গ্রাউন্ড জিরো থেকে না দেখা গেলেও পার্শ্ববর্তী এলাকায় অবস্থিত বলে নিউইয়র্ক টাইমসসহ বিভিন্ন মিডিয়ায় এ নিয়ে নানা আঙ্গিকের রং চড়ানো সংবাদ ফলাও করে প্রচার করা হয়। ফলে দ্রুতই বিষয়টি সারা আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ে। রক্ষণশীল ডানপন্থীরা গ্রাউন্ড জিরোতে ব্যাপকাকারে প্রতিবাদ সমাবেশ ও মানববন্ধন করে। বিরোধীদের মতে, এখানে মসজিদ নির্মাণ করলে তা ইসলামের জন্য 'ভিক্টোরী মেমোরিয়াল' হিসাবে পরিগণিত হবে। এটা হবে মুসলমানদের জন্য বিজীত অঞ্চলে স্থাপিত বিজয় চিহ্নস্বরূপ। এতে নাইন ইলেভেন ভিকটিমদের আত্মার প্রতি অবমাননা করা হবে। কেননা তাদের ধারণামতে ইসলামই গ্রাউন্ড জিরোতে সন্ত্রাসী হামলার জন্য দায়ী। বিল্ডিংটির নাম এলাকার নামানুসারে 'পার্ক ফিফটি ওয়ান' হলেও মুসলমানরা একে কর্ডোভা বিল্ডিং বলার কারণে বিরোধী পক্ষ জোর দিয়ে বলেছে যে, আমেরিকানদের বোঝা উচিৎ মসজিদসমূহ কেবলমাত্র চার্চের বিপরীতে একটি উপাসনালয়-এমন ধারণা করা ভুল। মূলত তা মুসলমানদের জন্য 'আধিপত্যের প্রতীক এবং মৌলবাদের কেন্দ্রস্থল'। বর্তমানে ব্যাপক পরিচিতির কারণে 'গ্রাউন্ড জিরো মসজিদ' নামেও এটিকে আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। এদিকে স্থানীয় মেয়রসহ মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাও এ মসজিদ নির্মাণে সমর্থন দিয়েছেন। এরই মধ্যে গত ১১ সেপ্টেম্বর ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ধ্বংসের নবম বার্ষিকীতে টেরি জোনস্ নামক এক পাদ্রী 'কুরআন পোড়ানো' দিবস ঘোষণা করে গ্রাউন্ড জিরোতে একত্রিত হওয়ার জন্য জনগণকে আহ্বান করেন। অবশ্য মুসলিম বিশ্বে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া শুরু হলে নির্দিষ্ট দিনের পূর্বেই উক্ত প্রোগ্রাম প্রত্যাহার করা হয়।

সাধারণ জ্ঞান

ভারত উপমহাদেশের

মুসলিম শাসকবর্গের তালিকা (১২০৬-১৮৫৭ খৃঃ = ৬৫৪ বছর)

মামলূক শাসনামল *(১২০৬-১২৯০ খৃঃ= ৮৪ বছর)*

ক্রমিক	শাসকের নাম	হিজরী সন	ঈসায়ী সন
১	কুতুবুদ্দীন আইবেক	৬০৩-৬০৭	১২০৬-১০
২	আরাম শাহ	৬০৭-৬০৮	১২১০-১১
৩	শামসুদ্দীন আলতামাশ্ (ইলতুৎমিশ নামে পরিচিত)	৬০৮-৬৩৪	১২১১-৩৬
৪	রুকুনুদ্দীন ফিরোজ শাহ	৬৩৪	১২৩৬
৫	সুলতানা রাজিয়া	৬৩৪-৬৩৭	১২৩৬-৪০
৬	মুঈযুদ্দীন বাহরাম শাহ	৬৩৭-৬৩৯	১২৪০-৪১
৭	আলাউদ্দীন মাসঊদ শাহ	৬৩৯-৬৪৪	১২৪১-৪৬
৮	নাসীরুদ্দীন মাহমূদ	৬৪৪-৬৬৪	১২৪৬-৬৬
৯	গিয়াসুদ্দীন বলবন	৬৬৪-৬৮৬	১২৬৬-৮৭
১০	মুঈজ্জুদ্দীন কায়কোবাদ	৬৮৬-৬৮৯	১২৮৭-৯০

খিলজী শাসনামল *(১২৯০-১৩২০ খৃঃ= ৩০ বছর)*

ক্রমিক	শাসকের নাম	হিজরী সন	ঈসায়ী সন
১	জালালুদ্দীন খিলজী	৬৮৯-৬৯৪	১২৯০-৯৫
২	আলাউদ্দীন খিলজী	৬৯৪-৭১৬	১২৯৫-১৩১৬
৩	শিহাবুদ্দীন খিলজী	৭১৬	১৩১৬
৪	কুতুবুদ্দীন মোবারক খিলজী	৭১৬-৭২১	১৩১৬-২০
৫	নাসিরুদ্দীন খসরু শাহ	৭২১	১৩২০

তুঘলক শাসনামল (১৩২০-১৪১২ খৃঃ= ৯২ বছর)

ক্রমিক	শাসকের নাম	হিজরী সন	ঈসায়ী সন
১	গিয়াসুদ্দীন তুঘলক	৭২১-৭২৫	১৩২০-২৫
২	মুহাম্মাদ বিন তুঘলক	৭২৫-৭৫২	১৩২৫-৫১
৩	ফিরোজ শাহ তুঘলক	৭৫২-৭৯০	১৩৫১-৮৮
৪	গিয়াসুদ্দীন তুঘলক (২য়)	৭৯০-৭৯১	১৩৮৮-৮৯
৫	আবুবকর	৭৯১	১৩৮৯
৬	নাসিরুদ্দীন মাহমূদ শাহ	৭৯১-৭৯৪	১৩৮৯-৯২
৭	হুমায়ন	৭৯৪	১৩৯২
৮	নাসিরুদ্দীন মাহমূদ তুঘলক	৭৯৪-৮১৫	১৩৯২-১৪১২

সৈয়দ শাসনামল *(১৪১৪-১৪৫১ খৃঃ= ৩৭ বছর)*

ক্রমিক	শাসকের নাম	হিজরী সন	ঈসায়ী সন
১	সৈয়দ খিজির খান	৮১৭-৮২৪	১৪১৪-২১
২	সৈয়দ মুবারক শাহ	৮২৪-৮৩৭	১৪২১-৩৪
৩	সৈয়দ মোহাম্মাদ ফরিদ শাহ	৮৩৭-৮৪৭	১৪৩৪-৪৩
৪	সৈয়দ আলাউদ্দীন আলম শাহ	৮৪৭-৮৫৫	১৪৪৩-৫১

লোদী শাসনামল (১৪৫১-১৫২৬ খৃঃ= ৭৫ বছর)

ক্রমিক	শাসকের নাম	হিজরী সন	ঈসায়ী সন
১	বাহলুল লোদী	৮৫৫-৮৯৩	১৪৫১-৮৮
২	সিকান্দার লোদী	৮৯৩-৯২৩	১৪৮৮-১৫১৭
৩	ইবরাহীম লোদী	৯২৩-৯৩২	১৫১৭-২৬

মুঘল শাসনামল *(১৫২৬-১৭০৭ খৃঃ=১৮৩ বছর)*

ক্রমিক	শাসকের নাম	হিজরী সন	ঈসায়ী সন
১	জহিরুদ্দীন মুহাম্মাদ বাবর	৯৩২-৯৩৬	১৫২৬-৩০
২	নাসিরুদ্দীন হুমায়ুন	৯৩৬-৯৬৩	১৫৩০-৫৬
৩	আকবর	৯৬৩-১০১৪	১৫৫৬-১৬০৫
৪	সেলিম নূরুদ্দীন মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর	১০১৪-৩৬	১৬০৫-২৭
৫	শাহজাহান	১০৩৮-১০৬৯	১৬২৮-৫৮
৬	আওরঙ্গজেব	১০৬৯-১১১৮	১৬৫৭-১৭০৭

মুঘলদের অখণ্ড ভারত শাসনের মূল অধ্যায় মূলত এখানেই শেষ হয়। পরবর্তীগণ যুদ্ধ-বিগ্রহের ডামাডোলে বিচ্ছিন্নভাবে সাম্রাজ্যে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে সর্বশেষ সম্রাট বাহাদুর শাহ (২য়)-এর মৃত্যুর সাথে সাথেই এ বংশের শাসনের চূড়ান্ত পরিসমাপ্তি ঘটে।

বাংলার স্বাধীন মুসলিম সুলতানগণ

ইলিয়াস শাহী বংশ *(১৩৪২-১৪১৪ খৃঃ; ১৪৩৬-৮৭ খৃঃ=১২২ বছর)*

ক্রমিক	শাসকের নাম	হিজরী সন	ঈসায়ী সন
১	শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ	৭৪৩-৭৫৯	১৩৪২-৫৮
২	সিকান্দার শাহ	৭৫৯-৭৯৫	১৩৫৮-৯৩
৩	গিয়াছুদ্দীন আযম শাহ	৭৯৫-৮১৩	১৩৯৩-১৪১০
৪	শামসুদ্দীন হামযাহ শাহ	৮১৩-৮১৪	১৪১০-১১
৫	শিহাবুদ্দীন বায়েজীদ	৮১৪-৮১৭	১৪১১-১৪
১	নাসিরুদ্দীন মাহমূদ শাহ	৮৩৮-৮৬৩	১৪৩৬-৫৯
২	রুকুনুদ্দীন (বররাক) ইউসুফ	৮৬৩-৮৭৯	১৪৫৯-৭৪
৩	শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহ	৮৭৯-৮৮৭	১৪৭৪-৮২
৪	সিকান্দার শাহ	৮৮৭	১৪৮২
৫	জালালুদ্দীন ফতেহ শাহ	৮৮৭-৮৯২	১৪৮২-৮৭

হাবশী বংশ *(১৪৯০-১৫৯৭ খৃঃ= ০৭ বছর)*

ক্রমিক	শাসকের নাম	হিজরী সন	ঈসায়ী সন
১	বারবক শাহ	৮৯৫	১৪৯০
২	ফিরোয শাহ	৮৯৫-৯০০	১৪৯০-৯৪
৩	নাসিরুদ্দীন মাহমূদ	৯০০	১৪৯৪
৪	মুযাফ্ফর শাহ	৯০০-৯০৩	১৪৯৪-৯৭

সাম্প্রতিক বাংলাদেশ

১. দেশের ৪৮৩তম উপযেলা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার 'বিজয়নগর'-এর প্রশাসনিক কার্যক্রম শুরু হয় কবে?
উঃ ৩ আগস্ট ২০১০।
২. দেশের ১৯তম সরকারী মেডিকেল কলেজ কোনটি?
উঃ যশোর মেডিকেল কলেজ।
৩. দেশের প্রথম প্রস্তাবিত হাতি অভায়াশ্রম স্থাপিত হচ্ছে কোথায়?
উঃ শেরপুর।
২০১০ সালের আগস্টে বাংলাদেশের কোথায় অ্যানথ্রাক্স বা তড়কা রোগের বিস্তার ঘটে? উঃ সিরাজগঞ্জ ও পাবনা যেলায়।
৪. দেশের প্রস্তাবিত তৃতীয় সমুদ্রবন্দর নির্মিত হবে কোথায়?
উঃ কলাপাড়া, পটুয়াখালী।
৫. বাংলাদেশে মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (MRP) চালু করা হয় কবে? উঃ ২ জুন ২০১০।
৬. রংপুর বিভাগের যাত্রা শুরু হয় কবে?
উঃ ১ জুন ২০১০।
৭. বাংলাদেশের প্রাচীনতম পত্রিকা দৈনিক অবজারভার বন্ধ হয় কবে?
উঃ ৮ জুন ২০১০ (প্রকাশকাল ১৯৪৯)।
৮. বাংলাদেশে প্রথম ইলেক্ট্রনিক ভোটিং (ই-ভোটিং) কার্যক্রম শুরু হয় কবে এবং কোথায়?
উঃ ১৭ জুন ২০১০, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে জামাল খান কেন্দ্রে।
৯. ২৩ মে ২০১০ প্রথম বাংলাদেশী হিসাবে এভারেষ্ট জয় করেন কে?
উঃ মুসা ইব্রাহিম।
১০. বর্তমানে বাংলাদেশে সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আছে কতটি?
উঃ ৩১টি।
১১. ২০১০ সালের অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুসারে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় কত মার্কিন ডলার? উঃ ৭৫০।
১২. "বাংলা ২৪ ঘণ্টা" স্লোগান নিয়ে পূর্ণ সম্প্রচার শুরু করা দেশের একমাত্র ২৪ ঘণ্টার সংবাদভিত্তিক স্যাটেলাইট চ্যানেলের নাম কি?
উঃ এটিএন নিউজ।
১৩. ১ জুন ২০১০ দেশে কোন পত্রিকার প্রকাশনা বাতিল ঘোষণা করা হয়? উঃ দৈনিক আমার দেশ।
১৪. বর্তমান মহাজোট সরকারের সময়ে দেশে প্রথমবারের মত হরতাল পালিত হয় কবে?
উঃ ২৭ জুন ২০১০।
১৫. ১৬ জুন প্রথম নারী হিসেবে জাতীয় সংসদে স্পিকারের আসনে বসেন কে?
উঃ সানজিদা খানম।
১৬. ২০১০ সালের অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুসারে, বাংলাদেশে স্বাক্ষরতার হার কত? উঃ ৫৪.৮%
১৭. ১ জুলাই ২০১০, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কততম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করে? উঃ ৯০তম।
১৮. পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে বাংলাদেশ কোন দেশের সাথে, কবে সহযোগিতা কাঠামো চুক্তি করেছে?
উঃ রাশিয়া, ২১ মে ২০১০।
১৯. বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কোন দু'টি যুদ্ধজাহাজ প্রথম জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে যোগ দেয়?
উঃ বি এন এস ওসমান ও বি এন এস মধুমতি।
২০. বর্তমান দেশে থানার সংখ্যা কত?
উঃ ৬০৯টি।

সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক

১. ভারতের প্রথম মুসলমান প্রধান নির্বাচন কমিশনার (C. E. C) কে?
উঃ শাহাবুদ্দীন ইয়াকুব কোরাইশী।
২. অ্যানথ্রাক্স রোগের আবিষ্কারক কে?
উঃ রবার্ট কচ (জার্মানি)।
৩. ইরানের প্রথম পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র 'বুশেহর' কবে চালু হয়?
উঃ ২১ আগস্ট ২০১০।
৪. বর্তমান বিশ্বের বৃহত্তম ঘড়ির নাম কি?
উঃ মক্কা ঘড়ি।
৫. বিশ্বের সর্বাপেক্ষা হেলানো টাওয়ারের নাম কি?
উঃ ক্যাপিটাল গেট টাওয়ার (আবুধাবি)।
৬. জাপানের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নাম কি?
উঃ নাওতো কান।
৭. বেলুনে চড়ে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেয়া ব্যক্তি কে?
উঃ জনাথন ট্র্যাপ (যুক্তরাষ্ট্র)।
৮. ২০১০ সালের গ্লোবাল পিস ইনডেক্সে শীর্ষ দেশ (অর্থাৎ ভাল দেশ) কোনটি?
উঃ নিউজিল্যান্ড (খারাপ ইরাক)।
৯. বিশ্বের সবচেয়ে বড় গ্যাস ক্ষেত্রের নাম কি?
উঃ দক্ষিণ পারস্য গ্যাসক্ষেত্র।
১০. মহানবী (ছাঃ) ও খলীফাদের পবিত্র স্মৃতি রক্ষণকারী "সরকারী জাদুঘর" কোথায় অবস্থিত?
উঃ ইস্তাম্বুল, তুরস্ক।
১১. বিশ্বের সবচেয়ে বড় ভাসমান বিমানবন্দরের নাম কি?
উঃ ক্যানসাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, জাপান।
১২. বিশ্বের কোন দেশের জনগণ প্রথম জাতীয় নির্বাচনে ই-ভোটিং বা ইন্টারনেট ভোটিং ব্যবহার করে?
উঃ এস্তোনিয়া।
১৩. ২০১১ সালে ১৭তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে কোথায়?
উঃ মালে, মালদ্বীপ
১৪. সবচেয়ে কম বয়সী (১৩ বছর) এভারেস্ট জয়ী কে?
উঃ জর্ডান রোমারিও (যুক্তরাষ্ট্র)।
১৫. বিশ্বের প্রথম নারী হিসাবে কে ১৪টি সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ জয় করেন?
উঃ ওহ ইয়ুন সূন (দঃ কোরিয়া)।
১৬. BBC বাংলা ভাষায় অনুষ্ঠান সম্প্রচার শুরু করে কবে?
উঃ ১১ অক্টোবর ১৯৪১।
১৭. সম্প্রতি কোন গ্রামকে বিশ্বের সর্বোচ্চ বৃষ্টিবহুল অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে?
উঃ বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের মেঘালয় রাজ্যের মৌসিনরাম গ্রাম।
১৮. সার্কের বর্তমান চেয়ারপার্সন কে?
উঃ ভুটানের প্রধানমন্ত্রী জিগমে ওয়াই থিনলে।
১৯. সম্প্রতি বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভবনের উদ্বোধন করা হয় কোথায়?
উঃ সঊদী আরবের মক্কা নগরীতে (৮১৭মি.)।
২০. বিশ্বের একমাত্র কুরআন জাদুঘর কোথায় অবস্থিত?
উঃ বাহরাইনে।

আইকিউ

[কুইজ-১ ও কুইজ-২ এর সঠিক উত্তর লিখে নাম-ঠিকানাসহ ৩০ অক্টোবরের মধ্যে পাঠিয়ে দিন। সঠিক উত্তরদাতাদের তিনজনকে পুরস্কৃত করা হবে। -বিভাগীয় সম্পাদক]

কুইজ-১ :

১. সর্বপ্রথম কুরআন একত্রিত করেন এবং কুরআনকে মুছহাফ নামকরণ করেন কে?

২. ইসলামের প্রথম মসজিদের নাম কি?

৩. ইসলামের জন্য সর্বপ্রথম তরবারী উত্তোলন করেন কে?

৪. নবী বাদে কোন ন্যায়পরায়ণ শাসকের নাম কুরআনে এসেছে?

৫. পবিত্র কুরআনের সবচেয়ে ছোট আয়াত কোনটি?

৬. কোন জিনিসটি পানি থেকে তৈরী হয় অথচ পানির স্পর্শ পেলেই নষ্ট হয়ে যায়?

৭. কোন জিনিসটি প্রতিটি মানুষের দেহে থাকে এবং মৃত্যুর পর বের হয়ে যায়?

৮. ইউরোপের সবচেয়ে বড় শহর কোনটি?

৯. আফ্রিকার সবচেয়ে বড় শহর কোনটি?

১০. ইণ্ডিয়ার সবচেয়ে বড় শহরের (জনসংখ্যা হিসাবে) নাম কি?

কুইজ-২ :

১. ঈমানের দুর্বলতম স্তর কি?

ক. অন্যায়কে ঘৃণা করা। খ. রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা গ. ছাদাকা প্রদান করা। ঘ. অন্যায়কে স্বহস্তে প্রতিরোধ করা।

২. আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে যারা পরস্পর ভালোবাসা স্থাপন করেছে তাদের অবস্থান ক্বিয়ামতের দিন কোথায় হবে?

ক. আরশের বিশেষ ছায়াতলে। খ. হাউযে কাউছারের নিকটে। গ. সিদরাতুল মুনতাহার নিকটে। ঘ. জান্নাতী নহরের নিকটে।

৩. ডা. জাকির নায়েক কত সালে দাওয়াতী কার্যক্রম আরম্ভ করেন?

ক. ১৯৯১ খৃঃ। খ. ১৯৯৫ খৃঃ । গ. ১৯৯০ খৃঃ । ঘ. ২০০০ খৃঃ ।

৪. আহলুল বিদ'আতের দলগত উত্থান হয় মূলত কত হিজরীতে?

ক. ৭ম হিজরী। খ. ৩৭ হিজরী। গ. ৫৫ হিজরী। ঘ. ৬০ হিজরী।

৫. ইসরাঈল ফিলিস্তীন দখল করে কোন সালে?

ক. ১৯৪৮ খৃঃ। খ. ১৯৬৭ খৃঃ । গ. ১৯৭৩ খৃঃ। ঘ. ১৯৭৯ খৃঃ ।

৬. পৃথিবীতে মোট জীবিত ভাষার সংখ্যা কতটি?

ক. ৫০০০টি। খ. ৬৯০৯টি। গ. ৩০০০টি। ঘ. ৮০০০টি।

৭. মোগলদের মূল শাসনামল কত বছর স্থায়ী ছিল?

ক. ২০০ বছর। খ. ৩৩২ বছর। গ. ১৮৩ বছর। ১৫০ বছর।

৮. বাংলার প্রথম স্বাধীন মুসলিম শাসক শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ কত সালে ক্ষমতায় আরোহণ করেন?

ক. ১৩৪২ খৃঃ । খ. ১৩৫৮ খৃঃ । গ. ১৩৫০ খৃঃ । ঘ. ১৩৬১ খৃঃ ।

৯. বাংলাদেশে কতটি থানা ও উপযেলা রয়েছে?

ক. ৬০৯ ও ৪৮৩টি। খ. ৫০৯ ও ৪৮০টি । গ.৫৭০ ও ৪৬১টি । ঘ. ৫৯৯ ও ৪৭৮টি ।

১০. বর্তমান বিশ্বের বৃহত্তম ঘড়ির নাম কি?

ক. বিগবেন। খ. মক্কা ঘড়ি। গ. আরাউ ক্লক। ঘ. কোলগেট ক্লক।

(উত্তরের জন্য বর্তমান সংখ্যাটি দেখুন)

গত সংখ্যার কুইজ (১)-এর সঠিক উত্তর

১. সূরা ত্বীন, ২. হাজ্জাজ বিন ইউসুফ, ৩. সুলায়মান (আঃ), ৪. আন'আম, কাহাফ, সাবা, ফাতির। ৫. কলম, ৬. আমানুল্লাহ, ৭. আন্দালুসিয়া, ৮. জাবালুত তারিক, ৯. ৫টি, ১০. আল-বিরুনী।

গত সংখ্যার কুইজ (২)-এর সঠিক উত্তর

১. ঘ, ২. খ, ৩. ক, ৪. গ, ৫. খ, ৬. খ, ৭. ক, ৮. ঘ, ৯. খ, ১০, ঘ।

গত সংখ্যার কুইজের ফলাফল :

[গত সংখ্যায় কুইজে অংশগ্রহণকারীদের কেউই সবগুলোর উত্তর দিতে পারেননি। ফলে কাউকে বিজয়ী ঘোষণা করা গেল না। আগামীতে আপনাদের আরো অংশগ্রহণ আশা করছি।- বিভাগীয় সম্পাদক]

শব্দজট :

{শব্দজটটি পূরণ করে নাম-ঠিকানাসহ ৩০ অক্টোবরের মধ্যে পাঠিয়ে দিন। সঠিক উত্তরদাতাদের তিনজনকে পুরস্কৃত করা হবে। শব্দজটটি তৈরী করেছেন ছাদিক মাহমূদ, ইস.স্টাডিজ বিভাগ,রাবি}

১		২	■	■	৩		৪
	■		■	■		■	
	■		■	■		■	
■	৫	■	৬	৭	■	৮	■
■		■	৯		■		■
১০	■	১১	■	■	১২	■	১৩
	■		■	■		■	
১৪			■	■	১৫		

পাশাপাশি

১. ইসলামের উত্তম কাজসমূহের একটি ৩. যিনি ইসলামী জ্ঞানে পারদর্শী ৬. একটি ফলের নাম ৯. একটি জাতিবাচক নাম ১৪. কবর ১৫. একজন মোগল সম্রাট।

উপর-নীচ

১. জলধি ২. আরবী শিক্ষার প্রাথমিক শিক্ষালয় ৩. কাজ/কর্ম ৪. যে স্থান হতে ইসলাম চতুর্দিকে বিস্তৃতি লাভ করে ৫. ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান ৬. শ্লেষ্মা ৭. একটি রংয়ের নাম ৮. যার উপর নির্ভর করে আরবী মাসের হিসাব হয় ১০. চঞ্চল/ধৈর্যহীন/ব্যাকুল ১১. যে ছালাতে রুকূ-সিজদা নেই ১২. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গী ১৩. ফুলের নির্যাস/সুগন্ধি।

গত সংখ্যার শব্দজট বিজয়ী ৩ জন

প্রথম : সালমা বিনতে শহীদ
প্রসাদপুর বাজার, মান্দা, নওগাঁ।

দ্বিতীয় : মুহাম্মাদ মুযযাম্মিল হক্ব
২৬৩/২ শেরে বাংলা রোড, খুলনা।

তৃতীয় : মুহাম্মাদ তারিকুল ইসলাম
বর্ষাপাড়া, হিরণ, গোপালগঞ্জ।

গত সংখ্যার শব্দজট-এর সঠিক উত্তর

পাশাপাশি : ১. ছালাত, ৩. হালাল, ৫. মর্তবা ৬. মকুট, ৭. নবী, ৯. বর ১০. জান্নাত, ১২. শিরক, ১৪. যামিকা, ১৫. কপাট ।

উপর-নীচ :

১. ছাওম ২. তওবা ৩. হারাম ৪. ললাট ৭. নব ৮. বীর ১০. জানাযা ১১. তরীকা ১২. শিক্ষক ১৩. কপট।